প্রথম সংস্করণ—১৯৬০ ।

প্রকাশক : শ্রীরাখাল চন্দ্র চৌধুরী, ২০৬ বিধান সরণী কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রণ : ঘোষ এণ্ড কোম্পানী, ১৯।এ।এইচ।২ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিঃ-৭০০০০৬

ব্লক : এনগ্রেভকো, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : প্রভাত কর্মকার, শিবপুর, হাওড়া

বাঁধাই : নারায়ণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্, ১ রাজেন্দ্র দেব রোড, কলিকাতা-৭০০০০৭

সূচীপত্র

শতরঞ্জ কে খিলাড়ী

(দাবাড়ু)

ওয়াজেদ আলি শাহের রাজত্বকালে সারা লক্ষ্ণৌ শহরটা বিলাসিতার পানপাত্রে ডুবে ছিল। ছোট-বড়, ধনী-গরীব সবাই বিলাস ব্যসনে মগ্ন। নাচগানের মজলিস সাজাতে কেউ ব্যস্ত, কেউ আবার আফিমের নেশায় বুঁদ। তবু সামগ্রী—জীবনের প্রত্যেকটি স্তরেই আমোদ-প্রমোদের অগ্রগামিতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শাসন বিভাগে, সাহিত্য ও সামাজিক ক্ষেত্রে সর্বত্রই বিলাসিতায় কল্লোলিত। রাজকর্মচারীরা বিষয়-বাসনায়, কবিগণ প্রেম ও বিরহ ব্যর্থতার গুঞ্জন গাথায়, শিল্পীরা নক্শা এবং চিকনের পেলবতায়, বণিক সম্প্রদায় ছিল মিস্সি, সুর্মা-আতর আর প্রসাধনী-সামগ্রীর সওদায় লিপ্ত।

বিলাসিতার মদিরা সকলের চোখে রঙীন নেশা ছড়ায়। পৃথিবীর কোথায় কি ঘটল, সেই খবরে কেউই আগ্রহী নয়।

কবুতর বাজি হচ্ছে। তিতিরের লড়াইয়ের মহড়া চলছে। কোথাও পাশার ছক সজ্জিত, 'কচে বারো'র ধ্বনিতে মুখরিত। কোথাও বা দাবায় জোর লড়াই চলছে। আমীর, গরীব সকলে একই নেশায় মত্ত। কি আর বলার আছে, ফকিরকে একটা পয়সা দিলে রুটির বদলে আফিমে মৌতাত করে, শরাবে আশক্ত হয়। তাশ-পাশা-দাবা খেললে মগজ খোলে, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, জটিল সমস্যা সমাধানের অভ্যাস পাকা-পোক্ত হয়। এই সমস্ত অকাট্য যুক্তি বাজারে ধ্রুব সত্যের ন্যায় চালু ছিল। পৃথিবীতে এই সম্প্রদায়ের লোক এখনও বিরল নয়। কাজেই মীর্জা সাজ্জাদ আলি এবং মীর রওশন আলি যদি নিজেদের অধিকাংশ সময় বুদ্ধির প্রখরতা বৃদ্ধি করবার জন্য ব্যয় করেন তবে নিশ্চয়ই কোন

চিন্তাশীল ব্যক্তিই আপত্তি করবেন না। উভয়েই পৈতৃক জায়গীরের অধিকারী, জীবিকা নির্বাহের কোন চিন্তা ছিল না।

দুই বন্ধুই প্রাতঃরাশ শেষে দাবার ছক বিছিয়ে বসেন, ঘুঁটি সাজানো হলে চলে দাবার মারপ্যাঁচ। তারপর যে কখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল আসে, কখন যে বেলাবসানে সন্ধ্যার আগমন, এখবরে কেউই আগ্রহী নন। অন্তঃপুর থেকে বার বার তলব আসে—খাবার তৈরী। এখান থেকে জবাব যায়—এখুনি আসছি, যাও দস্তরখান বেছাও। বাবুর্চি নিরুপায় হয়ে মজলিসখানায়ই খানা রেখে যায়। একসঙ্গে দুই কর্মই উভয়ে সারেন।

মীর্জা সাজ্জাদ আলির গৃহে গুরুজন বিশেষ কেউই নেই। তার দাবার আড্ডা তাঁর বৈঠকখানাতেই জমে উঠে কিন্তু তাই বলে এটা মনে করা ভুল যে তাঁর এইরূপ আচরণে বাড়ির সকলেই খুব খুশী। গৃহিণীর তো কথাই নেই, বাড়ির চাকর-বাকর এমন কি পাড়া-পড়শি শুদ্ধু সকলেই বিরূপ। টিপ্পুনি কাটে—বড় বদ নেশা বাবা। ঘর সংসার ছারখার হয়ে যায়। শত্তুরকেও যেন খোদা এ নেশা না দেন। এ নেশা একবার ঘাড়ে চাপলে সে দুনিয়ায় অর্কমা হয়েই কাটিয়ে দেয়। দুনিয়াছাড়া হয়ে যায়। বড্ডো বদ নেশা। মীর্জা সাহেবের বেগম তো এই খেলার উপর হাড়ে হাড়ে চটা, সুযোগ পেলেই স্বামীকে কড়া কথা শোনাতে ছাড়েন না। তবে তার দেখা পাওয়া ভার। কারণ বেগমের শয্যাত্যাগের অনেক পূর্বেই ওদিকে খেলা শুরু হয়ে যায়, আবার রাত্তিরে শোবার আগে মীর্জা সাহেবের দেখা পাওয়া দুর্লভ। রাগটা গিয়ে পড়ে চাকর-বাকরদের উপর। —"কি ব্যাপার, পান চাইছে। ভেতরে এসে নিয়ে যেতে বল খাবার ফুরসত নেই। নিয়ে যা, খাবার শুদ্ধু থালখানা মাথার উপর ছুড়ে মেরে আয়। ইচ্ছে হয় খাক্ নয়তো কুকুরকে গেলাক।" আর, আড়ালে বলা গেলেও সব কিছু তো আর সর্বদা মুখের উপর বলা যায় না। বেগমের যত না রাগ নিজের পতিদেবতার উপর, তার চাইতে দ্বিগুণ

রোষ গিয়ে পড়ে মীরসাহেবের উপর। তিনি মীরসাহেবের নূতন নামকরণ করেছেন—ছিনে জোঁক। যতদূর সম্ভব মীর্জা সাহেব নিজের সাফাই গাইতে মীরসাহেবের উপর সব দোষ চাপিয়ে নিজে সাধু সাজতেন।

একদিন মীর্জা সাহেবের বিবির মাথা ধরেছে। বাঁদীকে বললেন—যা তাড়াতাড়ি মীর্জা সাহেবকে ডেকে আন। বলবি এক্ষুনি গিয়ে হাকিমের বাড়ি থেকে ওষুধ আনতে। ছুটে যা। দাসী গিয়ে সংবাদটা দিলে, মীর্জা বললেন চল এক্ষুনি যাচ্ছি। ঝিকে একা ফিরে আসতে দেখে বেগম সাহেবা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। আচ্ছা। বিবির মাথা ব্যথা—আর হুজুরের দাবার চালের বিরাম নেই? ক্রোধে মুখ রক্তিন হয়ে উঠে। বাঁদিকে হুকুম করে বলেন—গিয়ে বলবি, এক্ষুনি চলুন, নয়তো বিবিজীই হাকিমের কাছে চলে যাবেন।

মীর্জাজী মনোমত এক জবরদস্ত চাল চেলেছেন। আর দু'চালেই মীর সাহেবকে মাত করে দেবেন।

অসময়ে ঝগড়া।

মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন—কী, একেবারে দম বেরিয়ে যাচ্ছে? দেখছি একটুও তর সয় না।

মীর সাহেব বললেন—আরে মির্জাজী, যান না, গিয়ে চট করে শুনেই আসুন না। মহিলারা বড্ডো অল্পতেই কাতর হয়ে পড়েন।

মীর্জা—আজ্ঞে হ্যাঁ, চলে গেলে তো আপনি খুব খুশী। ছকিস্তিতেই মাত হতে চলেছেন কিনা।

মীর—জনাব, ওই আনন্দেই থাকুন। আমিও চাল ভেবে রেখেছি, আপনার ঘুঁটি যেমন আছে ঠিক তেমনি থাকবে, মাত হয়ে যাবেন। আচ্ছা যান, অন্দরে গিয়ে শুনে আসুন। কেন মিছি মিছি প্রেয়সীর মনে কষ্ট দেবেন।

মীর্জা—এত বড় কথা। মুখের মত জবাব দিয়ে তবেই উঠব।

মীর্জা—আরে দোস্ত। যেতে হবে সেই হাকিমের কাছে।—মাথা ব্যথা না ছাই, কেবল আমাকে নাজেহাল করার ফন্দি।

মীর—সে যাই হোক, বিবিজানকে খাস্তি তো করতে হবে।

মীর্জা—আচ্ছা, এই দানটা চেলেই যাই।

মীর—কিছুতেই না। যতক্ষণ না আপনি কথা শুনে আসছেন, আমি কিছুতেই ছকে হাত দিতে দোব না।

নিরুপায় হয়ে মীর্জা ভেতরে গেলেন। তাঁকে দেখে বেগম সাহেবা ভোল পালটে কাতরাতে কাতরাতে বললেন—ছাইপাঁশ দাবার চাল তোমার এত প্রিয় যে কেউ মরে গেলেও ওঠার নাম করনা। খোদা যেন তোমার মত ছুটো পয়দা না করেন।

মীর্জা—কী করি বল, মীর সাহেব মানতেই চান না। বড় কষ্টে ওর কবল থেকে ছুটে এসেছি।

বেগম সাহেবা—কেন? নিজে যেমন নিষ্কর্মা, সবাইকে তাই মনে করে নাকি? কি রকম মানুষরে বাবা, ঘর-সংসার, বাচ্চা কাচ্চা নেই নাকি। নাকি ও পাট তুলে দিয়েই এসে জুটেছে।

মীর্জা—ভীষণ ধান্দাবাজ লোক, একবার যদি এসে পড়েন আর না বলতে বাধে। অগত্যা খেলতে হয়।

বেগম—তাড়িয়ে দিতে পার না?

মীর্জা—এটা কি সম্ভব? সমগোত্রীয় মানুষ, সমাজে একসঙ্গে খানাপিনা। মানসম্ভ্রমে, বয়সে একচুল উঁচু বই নীচু নয়। তাই মানিয়ে নিতেই হয়। নয়তো মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবে।

বেগম—ঠিক আছে, তুমি না পার আমিই তাড়াচ্ছি। কারো রাগকে আমি পরোয়া করি না। কেন তিনি কি আমার অন্নদাতা। রাগ করে ঘরের ভাত বেশী ক'রে খাবেন। এই হরিয়া, যা বাইরে থেকে দাবার ছক তুলে নিয়ে আয়। আর মীর সাহেবকে বলবি যে মীর্জাজী আর খেলবেন না। আপনি মানে মানে চলে যান।

মীর্জা হাঁ হাঁ করে উঠল—আরে ছি ছি, এমন কাণ্ড করে

কখনো—মানী লোকের অসম্মান হবে। এই হুরিয়া দাঁড়া, চললি কোথায় ?

বেগম—যেতে দেবে না, কেন ? সাবধান। আমাকে আটকালে আমার মরা মুখ দেখবে। ঠিক আছে, ওকে আটকাচ্ছো। দেখি আমায় কে আটকায় ?

মুখের কথা শেষ হবার আগেই বেগম সাহেবা তড়িৎ বেগে বৈঠকখানার দিকে পা বাড়ান। মীর্জা সাহেবের প্রাণ পাখী উড়ে যাবার উপক্রম। বিবিজানকে মিনতি করে বলেন—আল্লার দোহাই, হজরত হোসেনের দিব্যি, ওঘরে গেলে তুমি আমার মরা মুখ দেখবে। বেগমও শোনার পাত্রী নয়। বেশ মেজাজ নিয়েই বৈঠকখানার দোর পর্যন্ত গেলেন। হঠাৎ পরপুরুষের সামনে যেতে পা সরে না। উঁকি দিয়ে দেখেন ভেতরে কেউ নেই। ঘর খালি। মীরসাহেব দু-একটি গুটি এদিক সেদিক করে, ভাল মানুষের মত বকে পায়চারি করতে ছিলেন। এদিকে হোলো কি, বেগম সাহেবা ফাঁকা ঘরে গিয়ে ধাক্কা মেরে দাবার ছক উলটে দিলেন। কিছু গুটি বাইরে মুখ থুবড়ে পড়ল, কিছু ছিটকে গেল চৌকির তলায়। বেগম সাহেবা দরজায় সশব্দে খিল দিলেন। মীরসাহেব বাইরে টইল দিচ্ছিলেন, গুটিগুলোকে বাইরে এসে পড়তে দেখলেন, চুড়ির ঝনঝনানিও কানে এসেছে, তারপরই দরজায় খিল। সব দেখেশুনে তাঁর আর বুঝতে বাকী রইল না যে এ বাড়ির বেগম সাহেবার মেজাজ বিগড়েছে। চুপচাপ ঘরের দিকে হাঁটা দিলেন। মীর্জা তখন বিবিকে বললেন—ছি। তুমি আমাকে অত্যন্ত লজ্জায় ফেললে।

বেগম—বেশ করেছি। এবার মীর সাহেব এদিকে এলে রাস্তা থেকেই বিদেয় করব। এত আশা নিয়ে আল্লার স্মরণ করলে উদ্ধার হয়ে যেত। জনাবরা বসে দাবা চালবেন আর আমি এদিকে হেঁসেলে বসে মাথা ঘামাবো। কী, যাবে হাকিমের বাড়ি না কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গড়িমসি করবে।

মীর্জা বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাকিমের দাওয়াইখানার বদলে মীর সাহেবের বাড়িতে গেলেন ও আদ্যোপান্ত ব্যক্ত করলেন। শুনে মীরজী বলে—আমি গুটি হাওয়ায় উড়তে দেখেই আন্দাজ করেছি। আর দাঁড়াইনি।

বড়ো রাগী বলে মনে হলো। অথচ আপনি তাকে মাথায় চড়িয়ে রেখেছেন? এটা ঠিক নয়। আপনি বাইরে কি করেন না করেন সে খবরদারিতে তাঁর কি দরকার? তিনি ঘরগেরস্থালী নিয়েই থাকুন না কেন? মেয়ে মানুষের অত খবরে কী দরকার।

মীর্জা—সে তো হল। এখন কোথায় বসা হবে তাই বলুন।

মীর—এটা কোন ভাবনার ব্যাপারই নয়। এত বড় ঘর পড়ে রয়েছে। বসে পড়ুন. এখানে জমা যাক।

মীর্জা - কিন্তু বিবিকে বোঝাই কেমন করে ঘরে বসলেই এত, আর এখানে বসলে তো আর আস্ত রাখবে বলে মনে হয় না।

মীর—আরে ভাই বকতে দিন না, কত বকবে দেখাই যাক্। দু চার দিনেই চুপ হয়ে যাবে। আর এক কাজ করুন এবার থেকে একটু কষে চলতে থাকুন তো!

দুই

মীর গিন্নী আবার কোন এক গোপন কারণ বশতঃ স্বামীর বাইরে বাইরে কাটানোই বেশী পছন্দ করেন। তাই কর্তার দাবাপ্রীতি নিয়ে কোন কথাই বলেন না। বরং কোনদিন মীর সাহেবের দেরী হয়ে গেলে স্মরণ করিয়ে দিতেন। এই জন্যেই মীর সাহেবের ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর বেগম অত্যন্ত পতিব্রতা ও সুবিবেচিকা। কিন্তু যখন বৈঠকখানায় দাবার আড্ডা বসল এবং মীর সাহেবও ঘরছাড়া হন না, তখনই হল বেগম সাহেবার মস্ত অসুবিধা। তাঁর মুক্ত বিচরণে পড়ল বাধা। দিনভর সদর দরজায় উঁকি মারা ছাড়া আর উপায় ছিল না।

অন্দরদিকে চাকর মহলেও চলে কানাঘুষা। এতদিনে কেবলমাত্র মাছি তাড়ানো ভিন্ন কাজ ছিল না। বাড়িতে কে এল গেল এ খবরের কেউ পরোয়া করত না। আর এখন অষ্ট প্রহর চরকি ঘুরন। কখনও পান আনার ফরমাস, কখনও মিঠাইয়ের। বিরহী প্রেমিকার হৃদয়ের ন্যায় গড়গড়ায় আগুন জ্বলেই চলেছে! তারা বেগমের দরবারে গিয়ে বলে—হুজুরাইন, মিঁয়াজীর দাবাপ্রেম আমাদের জান কালি করে দিল। রাতদিন দৌড়িয়ে পায়ে ফোস্কা পড়ে গেল। এ আবার কি খেলা যে সকালে বসে সন্ধ্যে কাবার করেন। এক আধ ঘড়ি সময় গুজরানের জন্য খেলেন সেটা আলাদা। এই খেলাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। আমরা হুজুরের গোলাম, হুকুমের অপেক্ষায় আছি। তবে কি না এ বড় পাজী খেলা একবার যে ধরেছে তার আর মঙ্গল নেই, গৃহস্থের একটা বিপদ হবেই! শুধু নিজের বাড়িই নয়, পাড়ার পর পাড়া উচ্ছন্নে গেছে, এমনও দেখা যায়। মহল্লার সব লোকের মুখেই এক কথা। হুজুরের নিমক খাই। মনিবের নিন্দে শুনলে বড্ড লাগে কি আর করব?—শুনে বেগমসাহেবা বলেন—আমি তো এই খেলা দুচক্ষেই দেখতে পারি না। কিন্তু মীর সাহেব তো কারো কথা শুনতে নারাজ। কি করা যায়।

পাড়ায় যে দু-চার জন প্রবীণ ব্যক্তি আছেন তারাও আলোচনা করেন—নাঃ, আর অমঙ্গল আসতে দেরী নেই। নানা রকম অশুভ চিন্তা দেখা দেয় তাদের মাথায়—যখন সমাজের মাথার এইরূপ চালচলন তখন দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার এই দাবা খেলাতেই, এই রাজত্ব গোল্লায় নিয়ে যাবে। সমস্ত রাজ্যে হাহাকারের রোল উঠেছে। দিন দুপুরে প্রজাদের [illegible] লুঠ হচ্ছে। নালিশ ফরিয়াদ শোনার মত কেউ নেই—পল্লী অঞ্চলের সমস্ত সম্পদ রাজধানী লক্ষ্ণৌতে এসে জমা হচ্ছে। আর তাই দিয়ে পতিতালয়, শুঁড়িখানা, রঙ বেরঙের বিলাসিতার আড্ডায় বেদম ফুর্তি করা হচ্ছে। ইংরেজ কোম্পানির কাছে ঋণের মাত্রা ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলছে। দিন দিন ভিজে কম্বল ভারীই হচ্ছে। দেশে

তহশীলের অব্যবস্থার দরুন বছরের খাজনা উশুল হয় না। রেজিমেন্ট বারবার হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে, ওদিকে লোকে বিলাসব্যসনে মগ্ন, নেশার ঘোরে রঙিন স্বপ্ন দেখতে ব্যস্ত। কেউ কারো কথায় কান দেয় না।

এদিকে কয়েকমাস গড়িয়ে গেছে। মীর সাহেবের বৈঠকখানায় দাবার আড্ডা জমজমাট। নিত্য নতুন চাল, নানারকম সমস্যা, তার অভিনব সমাধান। নিত্য নতুন দুর্গ নির্মাণ, ব্যূহ রচনা, প্রতিরোধ ভাঙছে গড়ছে। উভয় পক্ষের মধ্যেই বাগ্‌-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয় আবার মিটমাটও হয়ে যায়। ছক তুলে রাখা হল। মীর্জা রাগ করে আপন মহল্লায় চলে গেলেন। মীর সাহেবও অন্দর মহলে পা বাড়ান। সারা রাতের নিশ্চিন্ত নিদ্রার সঙ্গে মনোমালিন্য দূর হয়। সকাল হতে না হতেই দুই বন্ধু বৈঠকখানায় মিলিত হন।

একদিন দুই দোস্ত দাবার চোরাবালিতে হাবুডুবু খাচ্ছেন, এমন সময়ে বাদশাহীর ফৌজের এক ঘোড় সওয়ার অফিসার এসে হাজির। মীর সাহেবকে খুঁজছে। মীর সাহেবের আক্কেল গুড়ুম। এ আবার কোত্থেকে এসে জুটলো? তলবটাই বা কিসের? চাকরদের ডেকে বলেন—বাড়ি নেই, বলে দে। সওয়ার—বাড়ি নেই তো কোথায়? চাকর—তা তো আমি জানি না, কেন কি দরকার?

সওয়ার—কী দরকার তা তোকে বলতে হবে নাকি? হুজুরের তলবী হয়েছে। হাজির হতে হবে। ফৌজে সেপাই দরকার। ইয়ার্কি নাকি। জায়গীরদার হয়ে বসে থাকলেই হবে। মোর্চায় গেলেই বাছাধন টের পাবে—কতধানে কত চাল।

চাকর—ঠিক আছে বলে দেব। সওয়ার—এমন বলে দেবার ব্যাপার নয়। ফের কালই আবার আসবো। [illegible] নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে।

মীর্জাসাহেবকে বলে দোস্ত উপায় কি বলুন।

মীর্জা—বড় চিন্তার বিষয়। আমার তলব হবে না এটাই বা কথা কি?

মীর—হারামজাদা কাল আসার কথা বলে গেছে।

মীর্জা—আপদ আর কি। লড়াইয়ে গেলে প্রাণটা আমাদের যাবে।

মীর—ঠিক আছে। একটাই পথ। বাড়িতে দেখাই করবো না। কাল থেকে গোমতীর ওপারে বালির চড়ায় আড্ডা গেড়ে বসবো। সেখানে আর কে আমাদের খোঁজ পাবে। আসুক, ডেকে ফিরে যাক্।

মীর্জা—সাবাস্। বেড়ে চাল বার করেছেন বটে। এছাড়া আর পথ নেই।

ওদিকে মীর সাহেবের বিবি সেই সওয়ারীর কানে কানে বললো—তুমি খুব বুদ্ধি বার করেছ তো।

সে জবাব দিল—ও রকম গোমুখ্যুদের তুড়িমেরে নাচানোও কঠিন নয়। ওদের কি আর আক্কেল-বিবেচনা, বল-ভরসা কিছু বাকী আছে? সব গিয়ে ঢুকেছে দাবার ছকে। আর ভুলেও বাড়িতে থাকবে না।

তিন

পরদিন থেকে দুই বন্ধুই অন্ধকার থাকতেই বাড়ি থেকে বেরোয়। প্যাটকরা সতরঞ্চি বগলদাবা করে ডিবে ভর্তি পান নিয়ে গোমতীর ওপারে এক মান্ধাতা আমলের পুরোনো মসজিদেই দাবার জোরদার আড্ডা বসে। [illegible] সম্ভব নবাব আসফউদ্দৌল্লাই এর নির্মাতা। তামাক টিকে [illegible] থেকেই জোগাড় হয়ে যেত—তারপর মসজিদে পৌঁছে সতরঞ্চিটি পেতে, হুঁকোটি হাতে নিয়ে খেলায় বসেন। ব্যস, দুনিয়ার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধই থাকে না। কিস্তি, রাজা শামাস, মাত, এই জাতীয় দু'-একটি কথা ছাড়া আর কোন কথাই ওঁরা বলেন না। সম্ভবত যোগীরা সমাধিতে একাগ্র হয়ে লীন হয়ে যায়—কিন্তু

সে একাগ্রতার গভীরতা বিবেচ্য বিষয়। দ্বিপ্রহরে ক্ষুধার উদ্রেক হলে দুই দোস্ত কোনো এক খাবারের দোকানে ঢুকে খানা সারেন তারপর ছিলিম খানেক তামাক খেয়ে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, কোনো কোনো দিন আবার তাও মনে থাকে না।

এদিকে দেশের হালচালও শোচনীয়। কোম্পানীর ফৌজ লক্ষ্ণৌর দিকে চলে আসছে। শহরে দারুণ উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। লোকে ছেলেপিলে নিয়ে পালাতে শুরু করেছে। কিন্তু এই সব গণ্ডগোল আমাদের এই দুই দাবা প্রেমিকের কেশাগ্রও স্পর্শ করে না। তাঁদের এই সব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কোথায়? বাড়ি থেকে গা ঢাকা দিয়ে বেরোন। গলিপথে চলাফেরা করেন। তাদের একমাত্র ভয় পাছে পথে কোন সরকারী রাজকর্মচারীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। চোখে পড়লেই হয়ে গেল। ধরে নিয়ে যাবে। জায়গীর থেকে বছরে হাজার হাজার টাকা পায়, কিন্তু সেটা বেমালুম চেপে যেতে চায়—

রোজকার মত সেদিনও দুজনে ভগ্ন মসজিদ প্রাঙ্গণে বসে দাবা খেলছে। মীর্জাসাহেবের চাল একটু নরম ধরনের। মীর্জাসাহেব কিস্তির পর কিস্তি দিয়ে যাচ্ছেন। ঠিক এই সময় কোম্পানীর ফৌজকে আসতে দেখা গেল। গোরা সৈন্যদল। লক্ষ্ণৌ দখল করতে আসছিল।

মীরসাহেব বললেন—ইংরেজ ফৌজ আসছে। খোদার মনের কথা বোঝা মুশ্‌কিল।

মীর্জা—আসতে দিন, কিস্তি বাঁচান, এই কিস্তি—

মীর—একটু দেখা দরকার। আড়ালেই দাঁড়ানো যাক।

মীর্জা—আচ্ছা দেখবেন, এত তাড়া কিসের? আবার কিস্তি।

মীর—বুঝলেন, সঙ্গে কামান রয়েছে। তা প্রায় হাজার পাঁচেক সেপাই। তাগড়া জোয়ান। চেহারা দেখলে সত্যি ভয় হবার কথা।

মীর্জা—হুজুর নড়াচড়া করবেন না। ওসব নক্শা আর কাউকে দেখাবেন। এই ধরুন কিস্তি।

মীর—আপনি ভারী আশ্চর্য লোক মশায়। এদিকে শহরে ডামা-ডোল লেগে গেছে আর আপনি এখন কিস্তি দেবার জন্য ব্যস্ত। গোরাসৈন্যরা শহর ঘিরে ফেললে তখন বাড়ি যাওয়া হবে কেমন করে, সে কথা খেয়াল করেছেন কি একবার?

মীর্জা—বাড়ি যাবার সময় হলে তখন দেখা যাবে। এই কিস্তি—বাস, একবার রাজা নড়লেই পরের দানে মাত।

ফৌজ পার হয়ে গেল। বেলা দশটা আন্দাজ হবে। আবার পরের দানে খেলা চললো।

মীর্জা—আজ খাবার কি হবে?

মীর—আজ তো রোজা, কেন আপনার কি খিদে পেয়েছে?

মীর্জা—আজ্ঞে না, শহরে না জানি কী হচ্ছে।

মীর—কী আবার হবে। সবাই খেয়েদেয়ে আরামে ঘুমোচ্ছে। হুজুর নবাব সাহেবও এতক্ষণে আরাম করছেন।

দুই দোস্ত আবার জমিয়ে খেলতে বসেন। তিনটেও বেজে গেছে। এবার মীর্জার অবস্থা খারাপ যাচ্ছে। চারটের ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর ফৌজের আসার শব্দ পাওয়া গেল। নবাব ওয়াজেদ আলি ফৌজের হাতে বন্দী হয়েছেন, তারা নবাবকে কোন অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে চলছে। শহরে কোন হট্টগোল বা মারামারির চিহ্ন মাত্র নেই। কোথাও একবিন্দু রক্ত ঝরেনি। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো স্বাধীন দেশের রাজার পরাজয় এবং বন্দিত্ব এত অনায়াসে নির্বিঘ্নে এবং বিনা রক্তপাতে সম্ভব হয়নি। এটা কোন সাত্বিক অহিংসার নজীর নয়, এমন ধরনের কাপুরুষতা যা দেখলে বিশ্বের নিকৃষ্টতম কাপুরুষটিও লজ্জায় অশ্রু বিসর্জন করবে। অযোধ্যার বিশাল ভূখণ্ডের অধিকারী শেষ স্বাধীন নৃপতি বন্দিত্ব দশা প্রাপ্ত হয়ে শত্রু সৈন্যের সঙ্গে চলে যাচ্ছেন, আর লক্ষ্মৌ শহর পরিতোষের সঙ্গে নিদ্রায় বিবশ। এ হচ্ছে একটা দেশের রাজনৈতিক চরম অধঃপাতের জলন্ত নমুনা।

মীর্জা বলে উঠেন—হুজুর নবাব সাহেবকে পাহারওয়া বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে।

মীর—তা হবে হয় তো। নিন এই রাজার চাল।

মীর্জা—একটু থামুন মশায়। এখন আর ওসবে মন লাগছে না। হতভাগ্য নবাব সাহেবের এখন চোখে রক্তের নদী বইছে।

মীর—তা পড়বারই কথা, এই আরাম পরিতৃপ্ততা কি আর বরাতে জুটবে? এই রইল কিস্তি।

মীর্জা—চিরদিন কারুরই সমান যায় না। আহা অত্যন্ত দুঃখজনক অবস্থা।

মীর—হাঁ তা তো সত্যিই—এই যে আবার কিস্তি। ব্যস্ এই কিস্তিতেই মাত। আর বাঁচতে হচ্ছে না।

মীর্জা—আল্লার কসম, আপনি তো বড় পাষাণ মশায়, এতবড় একটা সর্বনাশেও আপনার প্রাণে দুঃখ এলো না। আহা বেচারা নবাব ওয়াজিদ আলি শা—

মীর—আগে নিজের বাদশাকে তো বাঁচান। তারপর নবাবের শোকে অশ্রুপাত করবেন। এই হলো কিস্তি আর মাত। বাড়ান-হাত

বাদশাহকে নিয়ে ইংরেজ সেনা সামনে দিয়ে চলে গেল। তারা চলে যাবার পরই মীর্জা ছক পেতে ফেললেন। পরাজয়ের আঘাত বড় গভীর। মীর বললেন আসুন জনাবের শোকে এক কবিতা আবৃত্তি করি। ওদিকে খেলায় হেরে মীর্জার রাজভক্তি উবে গেল। পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য মীর্জা উতলা হয়ে পড়েছেন।

চার

সন্ধ্যা আগত। মসজিদের ভাঙা খিলানে চামচিকেরা দারুণ চিৎকার শুরু করেছে। চড়াই পাখীর ঝাঁক যে যার কোটরে ঢুকে পড়েছে। কেবল মাত্র দুই নিঃশব্দ দাবাবীর স্থির চিত্তে চাল দিচ্ছে

যাচ্ছেন, মনে হচ্ছে যেন ছুই খুন পিয়াসী যোদ্ধা। পর পর তিনটে বাজীতে মীর্জার পরাজয়। এ দানও খুব একটা সুবিধের নয়। তিনি বার বার জিতবার দৃঢ় আশা নিয়ে সামলে সুমলে চাল ফেলেছেন, কিন্তু প্রতিবারই একটা না একটা বেয়াড়া চাল এসে পুরো বাজীটাই বরবাদ করে ফেলছে। প্রতিবার পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড জেদ চাপছে আর প্রতিকারের ভাবনা শক্ত হচ্ছে। ওদিকে জেতার আনন্দে মীর সাহেবের কণ্ঠ থেকে গজলের ফুলকি ঝরছে। হাতে তুড়ি দিয়ে গান গাইছেন দেখে মনে হচ্ছে কোন গুপ্তধনের কুঠুরির সন্ধান পেয়েছেন। শুনে শুনে মীর্জাজী অধৈর্য হয়ে পড়ছেন আবার পরাজয়ের গ্লানি এড়াতে মীরকে মদতও যোগাচ্ছেন। এদিকে চাল যত বেকায়দায় ফেলছে ধৈর্যের বাঁধন ততই আলগা হয়ে পড়ছে। একটা চাল দিয়েই পরক্ষণেই সেটা পালটাচ্ছেন।

—জনাব চাল যা দেবার একবার দেবেন, বার বার গুটিতে হাত দিচ্ছেন কেন? হাত সরিয়ে নিন। আগে চাল না ভেবে গুটিতে হাত দেবেন না। আর আপনি দেখছি এক এক চালে ঘণ্টাখানেক কাবার করছেন। এটা আদৌ নিয়ম নয়। একচালে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগলে, সে চাল মাত বলেই ধরে নিতে হবে। আরে, আবার চাল বদল করছেন? চুপচাপ গুটি রেখে দিন তো ইয়ার।

মীর সাহেবের মন্ত্রী মারা যায়। বলেন, আমি আবার কখন চাল দিলুম।

মীর্জা—আপনার চাল দেওয়া হয়ে গেছে। গুটি ওখানে ঐ ঘরেই রেখে দিন।

মীর—ও ঘরে রাখব কেন? আমি কখন আবার হাত থেকে গুটি ছাড়লুম?

মীর্জা—কেয়ামতের দিন অব্দি যদি গুটি না ছাড়েন, তাই বলে কি চাল হবে না? মন্ত্রী মারা যেতে দেখে আজেবাজে বকতে লাগলেন।

মীর—আপনি আজেবাজে বকছেন। হারজিত নসীবের খেল। আবোল তাবোল বকে কেউ জিততে পারে না।

মীর্জা—তা, এখন তো আপনি এই বাজীতে মাত হয়ে গেলেন।

মীর—কেন, আমি মাত হয়ে গেলাম কেন?

মীর্জা—তা হলে আপনি আগের ঘরেই ঘুঁটি রেখে দিন।

মীর—কি জন্য রাখবো? রাখবো না?

মীর্জা—কেন রাখবেন না শুনি? আপনাকে রাখতেই হবে।

তর্ক বেড়েই চলতে থাকে। দুইজনে আপন আপন কথা আঁকড়ে থাকে। কেউই দমবার পাত্র নয়। অপ্রাসঙ্গিক হোতে থাকল। মীর্জা বলে—বংশে দাবার চল থাকলে তবেই নিয়ম কানুন শেখা যায়—আপনার পূর্বপুরুষ বরাবর ঘাস কেটে এসেছে, আর আপনি জানবেন দাবার চাল, তবেই হয়েছে। আভিজাত্য জিনিসটাই আলাদা ধরনের। জায়গীরদার হলেই খানদানী হওয়া যায় না। জায়গীর পেলেই যদি কেউ জমিদার বনে যেত তাহলেই হয়েছিল আরকি।

মীর—কি বললেন? আপনার বাবাই ঘাস কাটতেন। এ বংশের লোক পুরুষানুক্রমে দাবা খেলে আসছেন মনে রাখবেন।

মীর্জা—আরে যান যান, বাজে বকতে হবে না। নাজিউদ্দিন হায়দরের রসুই ঘরে জন্ম কাটল বাবুর্চিগিরি করে। আর আজ জমিদারী দেখাচ্ছেন। খানদানি হওয়া যে সে কথা নয়।

মীর—কেন আর চাচ্ছ মিছিমিছি চৌদ্দগুষ্টির মুখে চুনকালি দিচ্ছ। বাবুর্চিগিরি কারা করত বোঝাই যাচ্ছে। এ বংশে সবাই বাদশার দস্তরখানে বসে খানা খেয়ে এসেছে।

মীর্জা—আরে থাম্ থাম্ ছোটজাতের বড় মুখ। বেশী লম্বা লম্বা কথা বলিস নে। জমিদারী পাওয়া ছেলের হাতে মোয়া নয়।

মীর—মুখ সামলান। বড্ডো বাজে বকছেন। আমি এ ধরনের কথা শুনতে নারাজ। এ বংশের লোক কারো চোখ রাঙানি সহ্য করে না। চোখ উপড়ে নিতে জানে। কিছু করবার ক্ষমতা আছে?

মীর্জা—ও, আপনি আমার ক্ষমতা পরখ করতে চান? এগিয়ে আসুন। হয়ে যাক্ দুহাত। আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন।

মীর—তুমি ভেবেছটা কি—তোমার তড়পানিতে কেউ ভয় পায়? দুই দোস্তই কোমর থেকে তলোয়ার বার করে। নবাবী আমল। ছোরা, তলোয়ার, হাতিয়ার সবার সঙ্গেই কিছু না কিছু থাকত। বিলাসিতাপ্রিয় হলেও কেউই কাপুরুষ নয়। রাজনৈতিক ভাবধারার বিপর্যয় ঘটেছিল বাদশাহর জন্য, দেশের জন্যে মরে আর কি হবে। তাই বলে ব্যক্তিগত বীরত্বের কমতি ছিল না। দুজনেই পাঁয়-তারা করে, তলোয়ার চক্‌চক্ করতে থাকে আর ছপাছপ শব্দও হয়। দুজনেই ঘায়েল হয়ে পড়ে যায়। ছটফট করতে থাকে। তারপর একসময় দুজনেরই প্রাণপাখী উড়ে যায়। দেশের বাদশার জন্য যারা এক ফোটা অশ্রু বিসর্জন করে নি, দাবা মন্ত্রী রক্ষার্থে তারা প্রাণ বিসর্জন দিতে দ্বিধা করল না।

অন্ধকার নেমে এল। দাবার ছক এখনো তেমনি পাতা আছে। দুপক্ষের রাজা সিংহাসনে আসীন দেখে মনে হচ্ছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যুতে অশ্রু বিসর্জন করছে। চারিদিক নিস্তব্ধতার ছায়ায় আচ্ছন্ন। ভাঙ্গা দালানের পোড়ো দেওয়াল, থাম আর ধুলিধূসরিত মিনারের চূড়োটা যেন শবদেহ দুটোর শোকে নীরবে অশ্রুপাত করছে।

কফন

বাপ বেটাতে কোলের কাছে নিভে যাওয়া আগুন পোয়াবার মালসা নিয়ে ঝুপড়ির দোরে বসে আছে। ভেতরে ছেলের দোমত্ত বৌ বুধিয়া প্রসব ব্যথায় আছাড়-পিছাড় খাচ্ছে। থেকে থেকে তার হৃদয় বিদীর্ণ করা কাতরানির আওয়াজ বাপ বেটার কানে আসছে। দুজনেই কান, পাঁজরা চেপে ধরছে। শীতের রাত, প্রকৃতি নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন, সারা গ্রাম আঁধারে লীন হয়ে গেছে।

বাপ ঘিসু বলে ওঠে—মনে হচ্ছে বাঁচবে না। দিনভর উথাল পাথাল করছে। যা, দেখে আয় তো।

ছেলে মাধব খিঁচিয়ে ওঠে—মরতে হলে তাড়াতাড়ি মরছে না কেন? দেখে করবটা কী শুনি?

কী পাষণ্ড তুই? সারা বছর যার সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করলি, তার ওপর একরত্তি মায়া থাকতে নেই?

ওর ছটফটানি আর হাত পা ছোড়া আমি আর দেখতে পাচ্ছি না।

এই চামার পরিবারের বদনাম সারা গাঁয়ে। ঘিসু একদিন কাজ করে তো তিনদিন চলে বিশ্রাম। মাধব এত ফাঁকিবাজ যে আধঘন্টা কাজ করে দুই ঘন্টা ছিলিম ফোঁকে। এইজন্য তারা কোন কাজই পায় না। ঘরে একমুঠো দানা থাকলে তো ওদের কাজেই বেরোতে নেই, দিব্যি দেওয়া আছে। দু-চার দিন স্রেফ বায়ু ভক্ষণ করে অগত্যা, ঘিসু গাছে চড়ে কাঠকুটরো ভেঙে আনে, মাধব বাজারে যায় সেগুলো বেচতে। তারপর যতক্ষণ না পয়সাগুলো ওড়ানো হচ্ছে ততক্ষণ এদিক-সেদিক গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরবে। গ্রামে কাজ

কামের অভাব নেই। চাষীর গাঁ, মেহনতী লোকের হাজার রকম কাজ আছে। নিতান্ত কাজের চাপে মজুর-মনিবের টানাটানি না পড়লে ওদের বাপ বেটার খোঁজ বড়-একটা কেউ করে না। নেহাৎ দায়ে ঠেকলেই একজনের কাজ দুজনে করবে। ওরা যদি সাধু হত তাহলে সংযম নিয়ম পালনের কোনো আবশ্যকতা থাকত না। তৃপ্তি তিতিক্ষায় ওরা স্বভাব-সিদ্ধ, আদর্শ নিরাসক্ত জীবন। ঘরে তৈজসপত্র বলতে দুটো মাটির সানকি, ছেঁড়া ত্যানায় হয় লজ্জা নিবারণ। বিষয়-চিন্তা মুক্ত। মাথায় ধারকর্জের পাহাড়, মারধর গালাগাল রোজের পাওনা, তাও ভ্রূক্ষেপ নেই, এত গরীব যে উসুলের আশা ছেড়ে দিয়ে দৈন্যদশা দেখে টাকাটা, সিকেটা ধার দেয়। ফসলের সময় এর ক্ষেতের আলুটা মুলোটা, ওর ক্ষেতের মটর তুলে এনে পুড়িয়ে খায়। তাও না জুটলে কারুর ক্ষেত থেকে পাঁচ, দশ ঝাড় আখ তুলে এনে তাই চুষে রাত কাবার করল। এই আকাশবৃত্তিতেই ঘিসুর জীবনের ষাট বছর কেটে গেল। মাধব ঘিসুর যোগ্য বেটা, বাপের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাপের নাম আরও উজ্জ্বল করছে। আজও কারুর জমি থেকে আলু তুলে নিয়ে এসেছিল, দুজনে তাই মালসার আগুনে পুড়িয়ে খাচ্ছিল। ঘিসুর বউ অনেক দিন আগেই গত হয়েছে। এই বছর খানেক হল মাধবের বিয়ে-থা হয়েছে। বউটা এসে অবধি সংসারের জন্য খেটে দেহপাত করেছে, ঘরে নিয়ম নিষ্ঠার পত্তন হয়েছে, এই নিষ্কর্মা মরদদের দুবেলা নরকের দোরে পাঠিয়েছে। হলে কি হবে, তবু তারা কুটো গাছটি নাড়েনি বরং ঘরে বউ আসায় তাদের আরও পায়াভারী হয়েছে। ঘটে গুমোর হয়েছে। কেউ কাজে ডাকলে যেন গরজ নেই দ্বিগুণ মজুরী হাঁকে। সব গরজ যেন বউটারই। সেই মেয়ে মানুষটাই প্রসব যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে, কাটা ছাগলের মত ছটফট করছে, আর বাইরে দুটোতে অপেক্ষা করছে বউটার পরান পাখী কখন খাঁচাছাড়া হবে, হাত পা ছড়িয়ে আরাম করে শোবে।

আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে ঘিসু বলে উঠে আরে একবার যানা, গিয়ে কী দশায় আছে একবার দেখে আয় না। এ পেত্নীর

ছাড়া আর কিছু না। ওঝা ডাকতে গেলেও এক টাকার নীচে নয়।

মাধবের ভয় পাচ্ছে বৌকে দেখতে ঘরে সেঁধোলে বাপ আলুর বড় ভাগ মেরে দেয়। বলে উঠে—আমার যেতে ভয় লাগছে।

ভয়টা কিসের শুনি? আমি তো এইখানেই আছি।

তা তুমিও তো গিয়ে দেখলে পার।

মরণ দশা, ওকি আমার ইস্ত্রী? সে সতীলক্ষ্মী যখন স্বর্গে যায় আমি তিন দিন তার শেয়র ছাড়ি নি, বুঝলি। আর তাছাড়া আমাকে দেখলে সে লজ্জা পাবে। কোনদিন যার মুখই দেখলুম না আর আজ তার আহুড় গা দেখব? আমাকে দেখলে গুটিয়ে যাবে। ভাল করে হাত-পাও ছুড়তে পারবে না।

ছেলে পুলে হলে কি হবে গো? ঘরে তো সেঁঠ, গুড়তেল সবই বাড়ন্ত।

ও সব এসে যাবে রে বেটা। ভগমানই সব দেয়। আজ যে একটা কানাকড়িও ঠেকাচ্ছে না, দেখবি কাল সেই এসে টাকা সাধবে। এই আমার কথাই ধর, সবই বাড়ন্ত কিন্তু ওনার কৃপায় সব ঠেকাই ঠিক উতরে গেছি।

পাঠক নিশ্চয়ই এদের ব্যাপার স্যাপারে বিস্মিত নন। একবার ভাবুন তো এদের সামাজিক চিত্র। যারা উদয় অস্ত পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে খেটে মরছে, তাদেরও নাভিশ্বাস উঠছে—তাদের হাল ঘিসু মাধব-দের চাইতে ভালো নয়। সমাজের মুখে অন্নপ্রদানকারী কৃষক এখানে থাকে উপবাসী। আর সেইসব সুবিধাবাদী লোভীর দল যারা চাষাদের ফাঁকি দিয়ে তাদেরই মাথায় কাঁঠাল ভাঙছে তারাই হচ্ছে সম্পদশালী গৃহস্থ। আমার মতে ঘিসু-মাধব কৃষকদের চাইতে বুদ্ধিমান। তাই হত-ভাগ্য নির্বোধ মজুরদের দলে না গিয়ে ধাপ্পাবাজ সুবিধাবাদীদের দলে নাম লিখিয়েছে। অবশ্য বৈঠকবাজদের সমস্ত কায়দা-কানুন রীতি নীতি শেখবার মত সুযোগ ছিল না। তা থাকলে গাঁয়ের মুখিয়া মোড়ল

হতে কোন অসুবিধাই হোত না, গাঁ জুড়ে লোক পেয়াম সু বেলায় না থাকলেও একটা সান্ত্বনা যে যতই হন্নছাড়া হোক না কেন, কিষাণ-কুলের মত পেটে-খেটে মরছে না। এছাড়া তাদের সরল, সাদাসিধে পেয়ে নেপোরা দইও মারতে অপরাগ। বাপবেটাতে আধপোড়া আলু মালসা থেকে বের করে মুখ পুড়িয়ে খাচ্ছে। কাল থেকে পেটে দানা পানি পড়েনি। ঠাণ্ডা হবারও সবুর সয় না, জিভ পুড়ে যাচ্ছে, খোসা ছাড়ালে ওপরটা ততটা গরম না লাগলেও দাঁতের চাপে আগুন-আগুন শাঁসে জিভ, টাকরা এমন কি আলজিভ পর্যন্ত পুড়ে যায়। বরং সেই আগুন মুখে না রেখে গিলে পেটে পাচার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ঠাণ্ডা করার অনেক মেসিনই সেখানে আছে। বাপবেটা তাই গব গব করে গিলছে তবে অবশ্য এই আংরা গেলার কসরতে চোখে জল দেখা দিয়েছে।

খেতে খেতে অনেক কাল আগের পুরোনো কথা ঘিসুর মনে পড়ল। প্রায় বিশ বছর আগে জমিদারের বিয়ের বরযাত্রীর কথা মনে পড়ল। সেই নেমন্তন্নের কথা লোকের জীবনভর মনে রাখার মত। আজও সেই ছবি ঘিসুর চোখে ভেসে ওঠে। বলে—সে কী রকম দারুণ ভোজ। জীবনে আর সে রকমটি জোটেনি। কন্যেপক্ষ পেট ভরে পুরি খাইয়েছিল সকলকে। খাঁটি ঘিয়ে ভাজা—ছোট বড় কেউ বাদ পড়ে নি। তিন রকম শাকভাজা, একটা তরকারী, সঙ্গে চাটনী, রায়তা, দই মিষ্টি। আহা! সে স্বাদের কথা তোকে কী বলব। মানা করার কেউ ছিল না। যা খুশি, যত খুশি খাও। লোকে সেঁটেওছে তেমনি। খাওয়ার চোটে জল খাবার ফাঁকটুকুও বন্ধ হবার জোগাড়। পাতে দিচ্ছে তো দিচ্ছেই, বারণ করলে শুনবে? হাত চেপে ধরলে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দিচ্ছে পাতে। গরম গরম গোল গোল সুগন্ধি কচুরি। সকলে মুখ ধুয়ে উঠতেই এলাচ দেওয়া পানের খিলি। পান খাবেটা কে। আমি তো দাঁড়াতেই পারছি নে। চট করে কম্বল পেতে কাত হয়ে পড়লুম। আহা কি দিল দরিয়া মানুষ।

দৃষ্টি—মাধব মনে মনে খাবারগুলোর স্বাদ নেয়। বলে—এখন আর কেউ অমন ধারা ভোজ খাওয়ায় না।

এখন খাওয়াবেটা কে শুনি? সে কাল পালটে গেছে। সব বেটাই এখন কেপ্পন হয়েছে। বে-থায় খর্চা কোরো না, কাজে কম্মে খর্চা কোরো না। করবিটা কবে শুনি। গরীবদের মেরে যে লুটছিস, বলি সেগুলো হবেটা কী শুনি। লোটবার বেলায় তো খুব ফুর্তি।'

'তা তুমি বোধ হয় এককুড়ি পুরি মেরে ছিলে?'

'তা এককুড়ির বেশী হবে।'

'আমি হলে তো খান পঞ্চাশেক সেঁটে দিতুম।'

'আমিও খান পঞ্চাশের কম খাইনি। এইয়া ভাগড়া ছিলুম, তুই তো তার আদ্দেকও হোস নি।'

আলু খেয়ে আকণ্ঠ জল গিলে যে যার ধুতির মুড়োয় আপাদমস্তক ঢেকে শুয়ে পড়ল। এই মালসার পাশেই। দেখে মনে হচ্ছে যেন দুটো ময়াল সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে।

ওদিকে বুধিয়া একনাগাড়ে কাতরে যাচ্ছে।

সকালে মাধব ঘরের ভেতর উঁকি মেরে দেখল বউটা খতম হয়ে গেছে। গালের দুপাশে মাছি ভনভন করছে। পাথরের মত দুই চোখ কপালে উঠে বসে আছে। সারা গা ধুলোয় মাখামাখি। পেটের মধ্যেই বাচ্চা মরে গেছে।

মাধব দৌড়ে এসে বাপকে ডেকে তুলল। তারপর দুজনে মিলে বুক চাপড়ে কাঁদতে বসল। পাড়ার লোক ছুটে এল এই মড়া কান্না শুনে তারপর গতানুগতিক প্রথায় বাপ-বেটাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

কাঁদবার সময় কোথায়? মড়া ঢাকবার নতুন কাপড় চাই, দাহ করার কাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। পয়সা কড়ির কথায় আর কাজ নেই। শকুনের বাসায়ও মাংস খুঁজলে একটুকরো পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এদের ঘরে পয়সা? নৈব নৈব চ।

কাঁদতে কাঁদতে বাপছেলেতে জমিদারের কাছে উপস্থিত হল।

নচ্ছার ছুটোর মুখদেখেই তার পিত্তি জলে যায়। কাজের বেলায় টিকির দর্শন পাওয়া ভার, চুরি করবার গোঁসাই। জোর ঠেঙিয়েছেনও কয়েকবার এর আগে। জিজ্ঞেস করেন—কীরে ঘিসুয়া ব্যাপার কী, কাঁদছিস যে ভারী। আজকাল তো একেবারে অমাবস্যার চাঁদ হয়ে গেছিস। আর এ গ্রামে থাকবি না মনে হচ্ছে ?

ঘিসু মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে জলভরা চোখে বলে হুজুর, আমার বড় দুর্দ্দিন। মাধবের ইস্তিরি কাল স্বগ্‌গে গেছে, রাতভর যন্ত্রনায় ছটফট করেই গেল। আমরা দুজনে ঠায় পেয়রে বসে কাটালুম। ওষুধ বিষুধ যদ্দুর পেরেছি করলাম কিন্তু হায় হায় হুজুর—দাগা দিয়ে সরে গেল। দুটো ফুটিয়ে দেবার আর কেউ নেই। আমার যথা সব্বস্ব গেছে. ঘর শ্মশান হয়ে গেল। বান্দার মা-বাপ আপনি হুজুর। আপনি ছাড়া আর কার কাছে দাঁড়াব। ঘাটকাজ সারতে পারব না মালিক। যথা সব্বস্ব খুইয়ে চিকেচ্ছে করেছি। এখন আপনি ভরসা।

দয়াশীল ব্যক্তি এই জমিদার। কিন্তু ঘিসুকে দয়া করা আর বেনো বনে মুক্তো ছড়ানো একই কথা। একবার মনে করলেন, বলবেন—দূর হ, বদমাস পাজী কোথাকার। ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না। আর আজ দায় ঠেকে ছুটে এসেছে তোষামোদ করতে, হারামজাদা নচ্ছার কোথাকার। কিন্তু এটা শক্ত কথা শোনাবার মত সময় নয়। মনের রাগ মনে রেখে ফেলে দিলেন দুটো টাকা। ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেও রাগ হয়। একটি কথাও বল্লেন না। মনে হলো মাথার বোঝা দূর হয়েছে।

স্বয়ং জমিদার যেখানে দুটাকা দিলেন সেখানে গ্রামের বেনে মহাজনেরা দিতে অস্বীকার করবে কোন সাহসে। এছাড়া জমিদারের নামে ঢেড়া পিটতেও সিদ্ধহস্ত। দু আনা চার আনা করে অনেকেই ঠেকাল। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ঘিসুর ট্যাঁক ভারী হয়ে প্রায় টাকা পাঁচেকের মত জমা হল। কোথাও থেকে কাঠের জোগাড়ও হয়ে গেল। দুপুরে

মাধব ও ঘিসু বাজারে গেল খাট কাপড় কিনতে। কিছু লোক গেল মাচার বাঁশ কাটতে।

কোমলহৃদয়া গ্রাম্য নারীরা শব দেখতে এসে দুচার কোঁটা অশ্রুপাত করে গেল।

বাজারে এসেই ঘিসু বলে ওঠে—হাঁরে মাধব, ওই কাঠেই দাহ হবে তো?

মাধব বলে—ঢের কাঠ আছে। এখন শুধু বাকী রইল কাপড় কেনা।

'তবে চল, একটা পাতলা গোছের কাপড় কিনে ফেললেই চুকে যাবে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ যাহোক একটা হলেই চলে যাবে। লাশ উঠতে তো সেই রাত হয়ে যাবে। তখন কাপড় আর কে দেখতে আসছে।'

'কী সিষ্টিছাড়া নিয়ম বাপু। বেঁচে থাকতে তো গা ঢাকার একটা ত্যানাও জোটে না। মলেই নতুন কাপড় দরকার। যত্ত সব।'

'কফন কাপড় তো মড়ার সঙ্গে চিতেয় উঠবে?'

'তা নয় তো কী তোলা থাকবে? ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ টাকা পাঁচটা আগে পেলে বউটাকে ওষুধ কিনে দেওয়া যেত।'

দুজনেই একে অন্যের কথা টের পায়। বাজারে এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে দেখে। এদোকান সেদোকান করতে থাকে নানান রঙের রেশমী শাড়ী, সুতীর কাপড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। কিছুই আর পছন্দ হয় না। এই করতেই সন্ধে কাবার। তখন দুজনেই এক অজ্ঞাত শক্তির প্রেরণায় পানশালার দোর গোড়ায় এসে দাঁড়ায়। তারপর যেন পূর্ব নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী সোজা ভেতরে হাজির। সেখানে দুজনেই চুপচাপ কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থাকে। তারপর ঘিসু শুড়িওয়ালার গদীর সামনে গিয়ে বলে—সাহুজী এদিকে একবোতল দেখি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চানাচুর আর ভাজা মাছের চাট এসে পড়ে বাপ-বেটাতে পরমতৃপ্তির সঙ্গে রকে বসে পান করতে থাকে। ঢক ঢক

করে কয়েক গেলাস পান করেই দুজনে বেশ একটা মৌতাতের আমেজ অনুভব করে।

ঘিসু বলে ওঠে—কফনে মড়াটাকে মুড়ে লাভটা কী। মিছি মিছি ছাইই হবে। বউ এর সঙ্গে আর যেতে হয় না।

মাধব আকাশের দিকে চেয়ে দেবতাদের নিজের সততার জলন্ত সাক্ষী মেনে বলে—দুনিয়ার নিয়ম। নয় তো লোকে হাজার হাজার টাকা বামুনকে দেয় কেন। পরলোকে কী পায় না পায় তা কেই বা দেখতে যাচ্ছে।

'বড় লোকদের টাকা আছে, তারা ফুঁকে দিক্‌গে। আমাদের টাকা কোথায় শুনি।'

'কিন্তু লোকের কাছে জবাবটা দেবো কি শুনি।'

ঘিসু হাঁসে—আরে দূর তুইও যেমন। বলে দেব ট্যাঁক থেকে পড়ে গেছে। কত খুজলুম, পাওয়া গেল না। লোকে বিশ্বাস না করলেও কফন কিনবে আবার তারাই।

মাধবও হাঁসে এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে, বলে আহা বড্ড ভালো-ছিল মেয়েটা মরেও আমাদের খাইয়ে গেল।

আধ বোতলের ওপর ফাঁকা হয়ে গেল। ঘিসু সের দুই পুরি আনাল। সঙ্গে চাটনি, আচার, কলজের তরকারী এল, সামনেই দোকান। দৌড়ে দুটো পাতায় খাবার সাজিয়ে নিয়ে এল মাধব। পাকা দেড় টাকা নিঃশেষ। অবশিষ্ট রইল আর কিছু পয়সা।

সে সময় দুজনেই বেশ মৌজ করে খাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন দুটো বাঘ নিজের শিকারের সামনে বসে ভোজনরত। জবাব-দিহির পরোয়া নেই, বদনামের ভয় নেই। এই সব ভাবনাচিন্তার বাঁধন তারা অনেকদিন আগেই কেটে ফেলেছে।

এক বিজ্ঞ ভঙ্গিমায় ঘিসু বলে ওঠে—আমাদের আত্মা শান্তি পেল, এতে কি তার পুণ্যি হবে না?

গভীর শ্রদ্ধায় মাধব সায় দেয়—হবে না কেন শুনি; আলবৎ হবে।

ভগবান তুমি অন্তর্যামী, ওকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাও। আমরা কলজে নিংড়ে আশীর্বাদ করছি। আজকের মত ভোজ জীবনের আর এমনটা খেলুম না।

কিছুক্ষণ পরে মাধবের মনে শঙ্কা দেখা দিল। বলে—আচ্ছা বাবা, পরপারে আমাদের তো একদিন যেতে হবে।

ঘিসু এই বালোচিত জিজ্ঞাসার কোন উত্তর দেয় না। সাময়িক স্ফূর্তিটাকে এই পারলৌকিক চিন্তায় নষ্ট করতে গররাজী।

'যদি সেখানে আমাদের ধরে বলে কেন আমাকে ঘাট বস্তর কিনে দাও নি? তখন কী জবাব দেবে?'

'বলব তোর মুণ্ডু।'

'তখন যারা দিয়েছিল, এখনও দেবে তারাই, তবে হ্যাঁ, এবার তোর আমার হাতে দেবে না।'

ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে, তারকা দলের দীপ্তি বাড়ছে। পানশালার রঙ, তামাশা, রোশনাইও বাড়তে শুরু করেছে। কেউ প্রাণ খুলে গান গাইছে, কেউ ডিগবাজি খাচ্ছে, কেউ বা বান্ধবের গলা নিবিড় আবেগে জড়িয়ে ধরেছে। দোস্তের মুখে কেউ বা শরাব তুলে দিচ্ছে।

সমগ্র পরিবেশটা নেশায় বিভোর, বাতাসে নেশার ছটা। নিশ্বাসেই হালকা মৌতাতের ঘ্রাণ লাগছে। জীবনে ব্যর্থতার নৈরাশ্য এখানে হাতছানি দিয়ে আনে। কিছুক্ষণের জন্যেও লোক ভুলে যায় গ্লানির শ্লাঘা। এক ঢোকেই কারুর কাজ হয়ে যায়। জীবন্ত কি মৃত, নাকি দুটোর উর্ধ্বে চলে গেছে।

বাপ-বেটায় খুব আয়েসে চুমুক দিয়ে যাচ্ছে। সকলের চোখ এদের ওপর পড়েছে। ও ভাগ্যবান। পুরো বোতল মাঝখানে রেখে বসে আছে।

আকণ্ঠ খেয়ে মাধব ভোলানাথ বনে গেছে। লোলুপ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে একটা ভিক্ষুক অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। পাতায় অবশিষ্ট

কয়েকটা পুরি পড়েছিল। পাতা শুদ্ধু তার দিকে ফেলে দিল। দানের গৌরব, ঔদার্যময় আনন্দ, উল্লাসের স্বাদ জীবনে এই প্রথম অনুভব করল।

'জিজ্ঞেস তো করতে পারে।'

'কি করে জানলি যে ঘাট-বস্তর জুটবে না? তুই আমাকে এতই গাধা ঠাউরেছিস। ষাট বচ্ছর ধরে কি আমি খামোকা ঘোড়ার ঘাস কাটলুম। কফন আসবে, আর বেশ ভাল কাপড়েরই হবে।'

মাধবের বিশ্বাস হোল না। বলে ওঠে 'দেবেটা কে শুনি? টাকা তো সব উড়িয়ে দিলে। ধরলে আমাকেই ধরবে। ওর সিঁথের সিঁদুর দিয়েছি আমি।'

ঘিসু রাগভরে বলে ওঠে—'বলছি কফনের ঠিক ব্যবস্থা হবে, তবু তুই মানছিস না।'

'দেবেটা কে শুনি সেটা বলবে তো নাকি।'

ঘিসু বলে—নে, খুব কষে খা, আর মন ভরে আশীর্বাদ কর, যার দৌলতে খাচ্ছিস সে মরে গেছে। তবে তোর আশীর্বাদ তার কাছে সোজা চলে যাবে। বেশ কেঁদে কেঁটে আশীর্ব্বাদ কর দিকি বাপু। বড্ড কষ্টের ধনরে বাপ্।

মাধব আকাশের দিকে চেয়ে বলে ওঠে—বউটা আমার সগ্গে যাবে গো বাবা, বৈকুণ্ঠের রাণী হবে।

ঘিসু উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে, অফুরন্ত উল্লাসের সাঁতারে মগ্ন। বলে—হ্যাঁ বাপ, স্বগ্গে যাবে বৈকি। কাউকে কষ্ট দেয় নি, ভোগায় নি। নিজে মরেও আমাদের জীবন স্বাদে, আনন্দে পূর্ণ করে গেছে। সে পুণ্যবতী যদি স্বগ্গে, বৈকুণ্ঠে না যায় তবে কী যাবে ওই পেট মোটা বড় লোকগুলো। যারা গরীবদের দুহাতে লুটছে রক্ত চুষে খাচ্ছে—আর পাপ মুক্ত হতে যাচ্ছে গঙ্গায় নাইতে, মন্দিরে ঘটা করে পুজা চালায়—তারা যাবে?

মাতালের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মুহূর্তেই ভাব পরিবর্তন। শ্রদ্ধা,

গৌরব, আনন্দ নিমেষেই বদলে গেল। ভগ্ন আশা আর নৈরাশ্যের পালা।

মাধব কাঁদ কাঁদ স্বরে ফিসফিসিয়ে ওঠে—বাবা, সারা জীবন বড্ড কষ্ট পেয়ে গেছে। আহা, কী ভোগাটাই না ভুগে মরল। ও হো হো ···

ঘিনু ছেলেকে ভোলায় - কেঁদোনা বাপু আমার। সে সব মায়াজাল কাঁসিয়ে চলে যেতে পেরেছে তাতেই খুশী হও। সব জঞ্জালের মায়া কাটিয়ে চলে গেল। আহা বড় ভাগ্যবতী পুণ্যবতী মা ছিল, এত তাড়াতাড়ি মায়া ছিড়ে চলে গেল।

বাপ বেটায় বৈরাগ্যের গান গেয়ে ওঠে—

"ঠগিনী কোঁ নৈনা ঝমকাবে। ঠগিনী।"

তাদের চারপাশে পানাসক্তের দল মুগ্ধ কৌতূহলে চেয়ে আছে। পিতাপুত্র বৈরাগ্য কীর্তন করতে মত্ত। সঙ্গে নাচও শুরু করে। উদ্দাম উন্মত্ত নৃত্যের মূর্ছনা। লম্ফঝম্ফ, পতনের উন্মাদনায় মশগুল, গুলজার হয়ে উঠেছে। এই রঙ্গ, অভিনয় কিছুক্ষণ ধরেই চলতে থাকে। ভাবের নেশায় ভরপুর, মাতোয়ারা। অবশেষে মাত্রাতিরিক্ত নেশার ঝোঁকে গড়িয়ে পড়ে পানশালার মেঝেতে। ওখানেই বেহুস হয়ে পড়ে।

গৃহদাহ

বহু অর্থ ব্যয় করে লালা দেবপ্রকাশ সত্যপ্রকাশের জন্মদিন পালন করেছেন। তার 'হাতে খড়ি'তেও অত্যন্ত ঘটা করা হয়েছিল। মুক্ত বায়ু সেবনের জন্য একটি ছোট ধরনের গাড়িও ছিল। বিকালে এক চাকরের সঙ্গে সে গাড়ি চেপে বেড়াতে যেত। পাঠশালায় পৌঁছে দেবার জন্য আর এক চাকর ছিল। সারাদিন ওখানে বসে থেকে স্কুলের ছুটির পর সত্যপ্রকাশকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরত। অত্যন্ত শান্ত এবং বর্দ্ধনশীলযুক্ত বালক, সুন্দর মুখশ্রীযুক্ত দীর্ঘায়ত চক্ষু, উন্নত ললাট, লাল পাতলা ঠোঁট এবং পরিপুষ্ট ছিল তার পায়ের গোছ। তাকে দেখে সকলেই বলত—'ভগবান একে রক্ষা করুন, কালে প্রতাপশালী হবে। লোকে তার শক্তি এবং বুদ্ধির তারিফ করত। সর্বদা মুখে হাসি লেগেই ছিল। কেউ তাকে কখনো জেদ করতে বা কাঁদতে দেখে নি—

বর্ষার দিন। দেবপ্রকাশ পত্নী সহ গঙ্গাস্নানে গেছেন। পরিপূর্ণ নদী, দেখে মনে হচ্ছে অন্ধ ব্যক্তি তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেয়েছে। পত্নী নির্মলা জলে বসে জলকেলি করছে। কখনো সামনে, কখনও বা পিছনে যাচ্ছে, ডুব দিচ্ছে, আবার কখনো আঙুল দিয়ে জল ছেটাচ্ছে। দেবপ্রকাশ বলে —'আচ্ছা শোন, এখন ওঠো, সর্দি হয়ে যেতে পারে।'

নির্মলা—তুমি যদি বল, তাহলে গলাজলেও নামতে পারি।

দেবপ্রকাশ—যদি পা পিছলে যায়?

নির্মলা—পা পিছলে যাবে কেন?

এই কথা বলেই সে গলা জলে চলে গেল। স্বামী বললেন—আরে, শোন আর সামনে যেও না। কিন্তু নির্মলার মাথায় খুন চেপেছে। এই জলকেলি মরণ খেলারই সামিল। সম্মুখগামী পা পিছলে গেল।

চিৎকার করে উঠল। বাঁচার জন্য হাত দেখাল কিন্তু জলে তলিয়ে গেল। চক্ষের নিমেষে রাক্ষসী নদী তাকে টেনে নিল। এদিকে দেবপ্রকাশ তোয়ালে দিয়ে গা মুছছিল, দেখেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেহারাও ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুইজন মাঝিও জলে লাফ দিল। সকলেই ডুব দিল, অনুসন্ধান করল, কিন্তু নির্মলা ততক্ষণে সমস্ত নিশানার বাইরে। তারপর ডোঙ্গা আনা হল। মাঝিরা বার বার ডুব দিয়েও লাশের সন্ধান পেলনা। শোকবিহ্বল দেবপ্রকাশ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঘরে ফিরে এলো। বাবাকে দেখে সত্যপ্রকাশ কিছু পাবার আশায় ছুটে এল। পিতা তাকে কোলে তুলে নিলো। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও অশ্রু রোধ করতে পারল না। সত্যপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করল—মা কোথায়?

দেবপ্রকাশ—বাবা, গঙ্গা তাকে নেমতন্ন খাবার জন্য রেখে দিয়েছে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পিতার দিকে চেয়ে সমস্তই বুঝে নিল। 'মা মা' করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

দুই

জগতে মাতৃহীন বালক সর্বদাই করুণার পাত্র। দীন থেকে দীনতর প্রাণীরও শোকে-সন্তাপে, ভালবাসা, স্নেহের প্রলেপ-প্রদানকারী পরম সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। মাতৃহীন শিশু সেই স্নেহ-সুশীতল স্নিগ্ধ আশ্রয়স্থল থেকে চিরতরেই বঞ্চিত। আর সেই কুসুমাদপি আশ্রয়স্থলের আবাস মায়ের মধ্যেই। মাতৃহীন শিশু পাখা বিহীন বিহঙ্গমবৎ।

প্রকৃতির সঙ্গে সত্যপ্রকাশের বন্ধুত্ব হোলো একা চুপচাপ বসে থাকে। বাড়িতে কারো কাছ থেকেই সে আগেকার মত আন্তরিক ভালবাসার স্পর্শ পায় না, সেই সহানুভূতির এক অজ্ঞাত অনুভব সে বুকের মধ্যে পায়—মা থাকলে তবেই সকলের স্নেহ ভালবাসা পাওয়া যায়। দুনিয়া থেকে মাতৃপ্রেম নিঃশেষ হয়ে গেলে সকলেই নিষ্ঠুর হয়ে যায়—পিতার চক্ষে আগেকার মত প্রেম জ্যোতি নিষ্প্রভ। নিঃস্বকে কে দয়া দেখাবে।

ছয় মাস পরের কথা। নতুন মায়ের আগমন অবশ্যম্ভাবী জেনে পিতার নিকটে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—আমার কি নতুন মা আসবে ?

পিতা বল্লো—হ্যাঁ, এসে তোমাকে খুব আদর করবে।

সত্য—আমার মা-ই কী স্বর্গ থেকে আসবে ?

দেবপ্রকাশ—হ্যাঁ, তোমার মা-ই আসবে।

সত্য—আমাকে আগের মত ভালবাসবে ?

দেবপ্রকাশ কিছু উত্তর খুঁজে পেলো না। এদিকে সত্যপ্রকাশকে সেই দিন থেকে প্রফুল্ল মনে দেখা গেল। কি মজা, মা আসবে। আমাকে কোলে নিয়ে আদর করবে। আমি আর কখনো দুষ্টুমি করব না, রাগ করব না। ভাল ভাল গল্প শোনাব।

বিয়ের দিন। প্রস্তুতিপর্ব শুরু হোল। সত্যপ্রকাশের হৃদয় আনন্দে ডগমগ। নতুম মা আসবে। পাল্কী চেপে বরযাত্রী গেল নতুন পোশাক পেল। ঠাকুমা ভেতরে ডেকে কোলে নিয়ে একটি মোহর দিল।

সেখানেই সে নতুন মাকে দেখলো। ঠাকুমা বল্লে দেখ বৌমা তোমার কি সুন্দর ছেলে। ওকে আদর কোরো।

সুন্দরের প্রতি শিশুরা সহজেই আকৃষ্ট হয়। নতুন মাকে দেখে সত্যপ্রকাশ মুগ্ধ হয়ে গেল। এক লাবণ্যময়ী আভূষণে বিভূষিতা প্রতিমা তার সামনে দণ্ডায়মানা।

দুই হাতে নতুন মার কাপড়ের আঁচল ধরে বলে ওঠে—মা।

দেবপ্রিয়া নাম্নী সেই নারীর কাছে এই ভবিষ্যতের দায়িত্ব-বহুল ত্যাগ ও ক্ষমার মাতৃডাক ছিল অসহনীয়, বিশ্রী লজ্জাযুক্ত। এখন সে প্রেমের রঙীন স্বপ্নে বিভোর। কামনাবাসনাময় যৌবনের আনন্দ হিল্লোলে আন্দোলিতা। এই শিশু কণ্ঠে মাতৃডাক তার স্বপ্নে আঘাত হেনেছে। রোষ ভরে বলে উঠে—আমাকে মা বলবে না।

তিন

বিমাতার কাছে সতীনপুত্র কি এতই বিষবৎ? এর যথার্থতা উপলব্ধি করতে কোন মননশীল ব্যক্তির পক্ষেই আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। আমরা আর কি করে পারব। গর্ভাবস্থার পূর্বে দেবপ্রিয়া সত্যপ্রকাশের সঙ্গে কখন কখন কথাবার্তা বলত, গল্প করত, কিন্তু গর্ভিণী হওয়ার পর থেকে তার নিষ্ঠুরতার প্রকাশ পেল। তার প্রসবকালে কেউ সামনে এলেই কঠোরতা বৃদ্ধি পেত। তারপর কোল আলো করা ছেলে আসতেই সত্যপ্রকাশের আনন্দের সীমা রইল না। ছুটতে ছুটতে আতুড়ঘরেই ছোট্টভাইকে দেখতে এল। দেবপ্রিয়া বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে ছিল। আনন্দে আত্মহারা সত্যপ্রকাশ বিমাতার কোল থেকে বাচ্চাকে ওঠাতে চাইল। ক্রুদ্ধ হয়ে দেবপ্রিয়া বললো—তোকে সাবধান করে দিচ্ছি, আর কোনদিন ওকে ছুঁবি না। ছুঁলে একেবারে কান ছিড়ে দেব।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ছুটে চলে এসে ছাতে গিয়ে খুব কাঁদতে লাগলো। আমি শুধু একটু মজা করে কোলে নিতে গেলাম। আমি তো আর ফেলে দিতাম না, তাইতেই আমাকে বকে দিল? হায়রে অবোধ বালক! ও কি আর জানত যে তিরস্কারের কারণ সাবধানতা নয়, অন্তরের অনেক জ্বালাই আছে।

শিশুর নাম জ্ঞানপ্রকাশ। একদিন দেবপ্রিয়া তাকে শুইয়ে দিয়ে স্নানের জন্য বাথরুমে গেছে। এই সময় সত্যপ্রকাশ চুপিসাড়ে এসে বাচ্চার ঢাকনা সরিয়ে অনুরাগভরে দেখতে লাগল। ইচ্ছে হলো ওকে কোলে নিয়ে আদর করে, কিন্তু মায়ের ভয়ে সে আশা ছেড়ে দিল, কেবলমাত্র গালে চুমু খেতে লাগল। ঠিক এই সময় দেবপ্রিয়া এসে হাজির হলো। ওকে চুমু খেতে দেখে রেগে আগুন হয়ে—দূর থেকেই বলতে লাগল—এই এখান থেকে চলে যা বলছি।

সত্যপ্রকাশ মায়ের দিকে খুব করুণ চোখে তাকিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো, সন্ধ্যার সময় বাবা জিজ্ঞাসা করল—তুমি ছোট্টভাইটিকে কাঁদিয়েছ কেন?

সত্য—আমি তো ওকে কখন কাঁদাইনা। নিশ্চয় মা ওকে খেতে দেয় নি।

দেবপ্রকাশ—মিথ্যে বলবে না। আজকে তুমি তাকে চিমটি কেটেছ।

সত্য—না, চিমটি কাটিনি।

দেব—তবু মিথ্যে কথা বলছো!

সত্য—আমি মিথ্যে কথা বলছি না।

দেবপ্রকাশ ক্রোধান্বিত হয়ে পড়লো ছেলের পিঠে গোটাকতেক চড় চাপ্পড় পড়ল। নিরপরাধ বালক। যাতনার অন্ত নেই। মানসিক চেতনা সংকুচিত হয়ে এলো। ক্রমে জীবনপট বদলে গেল।

সেদিন থেকে সত্যপ্রকাশের স্বভাবে পরিবর্তন দেখা দিল। ঘরে তার দেখা পাওয়াই ভার। বাবা বাড়ি এলে মুখ লুকিয়ে ঘোরে। খাবার জন্য কেউ ডাকলে চোরের মত চুপি চুপি এসে খেয়ে যায়, না কিছু চায়, না কিছু বলে। আগে ওর বুদ্ধির প্রখরতায় লোক মুগ্ধ হয়ে যেত, তার পরিচ্ছন্নতা, ভদ্রতা ও হাসিমাখা চোখমুখ লোককে আকৃষ্ট করত। আর আজ, পড়বার নাম শুনলে পালিয়ে যায়, পরিধেয় অত্যন্ত নোংরা। ঘরে আদর ভালবাসা, ডাক-খোঁজ করার মত কেউ নেই। বাজারের ছোকরাদের সঙ্গে গলায় গলায় ভাব, তাদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করছে সব সময়, ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, গালিগালাজ শিখে গেছে। শরীরও ভেঙ্গে গেছে। আগের মত সৌন্দর্যও আর নেই। দেবপ্রকাশকে আজ-কাল তার দুষ্টামি-দৌরাত্ম্যের নালিশ হামেশাই শুনতে হচ্ছে, সত্য-প্রকাশেরও দিনভর আড্ডা-টো টো করে ঘোরা বেড়েই চলেছে। চড়-চাপ্পড় খাচ্ছে বিস্তর কিন্তু কাজ হচ্ছে না, আর বলারই বা কি

আছে, ওকে ঘরে দেখলেই সকলেই ঘৃণা দৃষ্টিতে দূর দূর করে ওঠে। জ্ঞানপ্রকাশকে পড়াতে মাস্টার মশাই আসেন। হাসিমাখা মুখ আদুরে বেটাকে নিয়ে রোজই দেবপ্রকাশ ভ্রমণ সারেন। আর দেবপ্রিয়া সতীনপুত্রের সঙ্গ হতে ওকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর, ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে দিতে নারাজ।

দুই ছেলের মধ্যে আস্‌মান্ জমীন্ ফারাক। একজন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ভাল পোশাক পরিহিত, শান্ত ভদ্রের আকার। স্বভাবে আকৃষ্ট হয়ে স্পষ্ট বক্তার মুখ থেকে অনায়াসেই আশীর্বাদ নির্গত হয়ে যায় আর অপরজন নোংরা, বদমাস্, চোরের মত মুখ করে রাখে, মুখর গালিবাজ, সহবৎ-এর ধার ধারে না। এ যেন স্নেহ-বারি সিঞ্চনে, প্রেম-ভালবাসার বন্যায় আপ্লুত এক পুষ্ট চারাগাছ। আর অপর গাছটির গোড়ায় এক আঁচলা জলও পড়ে না স্নেহ ভালবাসার সিঞ্চন বঞ্চিত, আগাছায় ঢাকা বাঁকা এক পত্রবিহীন নবরক্ষ। একজন পিতার নয়নের মণি, তার দিকে তাকালে হৃদয় জুড়িয়ে যায়—অপরদিকে সারাদেহ জ্বলে পুড়ে খাঁক করে দেয়, মনে ঘেন্না ধরে গেছে, সেই হতভাগ্য মাতৃহীন অনাদরে বর্দ্ধিত বালকের কথা ভেবে।

চার

এটা একটা আশ্চর্যের বিষয় বৈকি সত্যপ্রকাশের এত অবনতি ঘটা সত্বেও ছোট ভাইকে বিন্দুমাত্র ঈর্ষা করার কথা স্বপ্নেও অগোচর। তার সুকুমার মতি ভাবের সম্পূর্ণ বিকারতা ঘটলেও মনের মণিকোঠায় সযতনে রাখা আছে ভ্রাতৃপ্রেম নামক বিষয়বস্তু। ভাইয়ের প্রতি সত্য-প্রকাশের স্নেহের সীমা নেই · সে হৃদয় নিঙড়ানো মমতাবোধ তা কেবল ভাইয়ের জন্যই। এ যেন বিশাল মরু মাঝে এক সবুজ বৃক্ষ, যা পান্থ-পাদপ স্বরূপ। ঈর্ষা-সাম্যভাবে দ্যোতক স্বরূপ। সত্যপ্রকাশ ভাইকে নিজের চাইতে অনেক বড়, গুণবান তথা ভাগ্যবান মনে করে। স্বকীয় মতের কাছে ঈর্ষা করেছে মাথা নত।

ঘৃণাই ঘৃণার জন্মদাতা। প্রেমের মাঝেই প্রেমাঙ্কুর প্রোথিত। জ্ঞানপ্রকাশও অগ্রজঅন্ত প্রাণ। বড়ভাইকে মনে-প্রাণে ভালবাসে। কখনও কখনও দাদার পক্ষ নিয়ে মায়ের সঙ্গে বচসা হয়। বড়দার জামা ছিঁড়ে গেছে, ব্যস শুরু হয়ে গেল মায় পোয় কথা কাটাকাটি, বলে— ভাইয়ার আচ্‌কান ছিঁড়ে গেছে, আচ্ছা মা ওকে আচ্‌কান তৈরি করে দিচ্ছ না কেন ? মা বলে ওঠে—চুপ কর, ওটাই ওর পক্ষে ভাল আচ্‌কান। এ আর কি, এখন ও নেংটা ফিরবে। জ্ঞানপ্রকাশ নিজের হাত-খরচা বাঁচিয়ে বড়ভাইকে কিছু দিতে অনেক চেষ্টা করেছে। সত্যপ্রকাশ কিন্তু এটা মেনে নেয়নি, বরং নিতে অস্বীকার করেছে। বাস্তবিক ও যতক্ষণ পর্যন্ত ছোট ভাই-এর সঙ্গে থাকে ততক্ষণ ওর মনে এক অনাবিল বিমল আনন্দ বিরাজ করে, এক শান্তিময় ঐহিক জগতের সন্ধান পায়। কিছু সময়ের জন্য এক সৎ সুন্দর ভাবের জগতে বিচরণ করে। তার মুখে কোন কুৎসিৎ বা অপ্রিয় কথা উচ্চারিত হয় না। এক সুপ্ত আত্মার উত্থান ঘটে কিছুক্ষণের জন্যে।

দিনকতক সত্যপ্রকাশ স্কুলে যায়নি। বাবা জিজ্ঞেস করে—তুমি কি আজকাল পড়তে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছ। ভেবেছটা কি শুনি—আমি কি জীবন-ভর তোমাকে টেনেই যাব ?

সত্য—স্কুলে আমার জরিমানা এবং ফী বাবদ কিছু টাকা বাকী পড়েছে। গেলেই দরজার বাইরে বার করে দেয়।

দেব—ফী বাকী পড়ল কেন ? তুমিতো প্রতি মাসেই স্কুলের ফী নিয়ে গেছ।

সত্য—সেদিন চাঁদা চাইতে এল, তাই ফীর টাকা চাঁদায় দিয়ে দিয়েছি।

দেব—আর জরিমানা সেটা কেন হল শুনি ?

সত্য—ফী না দেওয়াতে।

দেব—তুমি চাঁদা দিলে কেন ?

সত্য—জ্ঞানু চাঁদা দিল, তাই দেখে আমিও দিলাম।

দেব—কেন তুমি কি জ্ঞানুকে হিংসা কর? মন জ্বলে-পুড়ে যায়?

সত্য—কেন, জ্ঞানুকে আমি হিংসা করব? ঘরে আমরা দুজন হলেও বাইরে কিন্তু আমরা এক। আমার কাছে যে কিছু নেই, এটা বলতে পারলাম না।

দেব—কেন খুব লজ্জা হোল?

সত্য—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার বদনামের ভয়ে।

দেব—তবু ভাল, যে তুমি আমার মান রেখেছ। এটা কেন বললে না যে পড়াশোনা এখন নাকচ করলাম। আমার কাছে টাকার গাছ গজায় নি যে তোমাকে এত টাকা খরচা করে এক ক্লাসে তিন বার পড়াব আর প্রতি মাসেই খরচার জন্য উপরি দেব। জ্ঞানবাবু তোমার চাইতে কত ছোট হয়েও তোমার থেকে আর এক ক্লাস নিচে পড়ে। এবার তুমি ফেল করবেই এটা অবধারিত, আর ও পাস করে তোমার সঙ্গে পড়বে। তখন তো তোমার মুখে চুণ-কালি পড়বে না?

সত্য—আমার ভাগ্যে বিদ্যা বিরূপ।

দেব—তবে তোমার ভাগ্যে কি আছে?

সত্য—বোধ হয় ভিক্ষে মাগা।

দেব—তবে তাই মাগো। আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।

দেবপ্রিয়াও হাজির হোল। বলে ওঠে লজ্জা-শরমের তো আর বালাই নেই, কি ঘেন্নার কথা মাগো, মুখে মুখে চোপা।

সত্য—কপালে ভিক্ষাবৃত্তি আছে বলেই শিশুকালে অনাথ হলাম।

দেবপ্রিয়া—এইসব জ্বালাধরা কথা আমার কাছে এখন অসহ্য। আমি পান্তা ভাতে ফুঁ দিয়ে খেয়েও দেখেছি এ অসম্ভব।

দেবপ্রকাশ—বেহায়া কোথাকার। কাল যদি এর নাম না কেটে দিই তো কি। ভিক্ষে মাগার ইচ্ছে হয়েছে? তো তাই যেন করে ও।

পাঁচ

দ্বিতীয় দিন সত্যপ্রকাশ গৃহত্যাগের জন্য তৈরী হল। ১৬ বছর বয়স। এত কথা শোনার পর তার পক্ষে ঘরে থাকা অসম্ভব ঠেকল। যখন হাত-পা ছিল না, কৈশোরের অসমর্থতায় অনাদর-অবহেলা, নিষ্ঠুরতা, তিরস্কার সব কিছু নীরবে সয়েছে। এখন স্বাবলম্বী হয়ে গেছে, হাত-পা গজিয়েছে আর এই বন্ধনে থাকার কোন আবশ্যকতা নেই। কি দরকার পরের গলগ্রহ হয়ে থাকার? আত্মাভিমানের আলোর দীপশিখা মানবমনে সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রদান করে, চিরজীবী করে তোলে।

গ্রীষ্মকাল। বেলা প্রায় দু-প্রহর। ঘরে সব প্রাণীই অলস নিদ্রায় মগ্ন। সত্যপ্রকাশ নিজের পরিধেয় বগলদাবা করে ছোট একটি থলে হাতে নিয়ে নিঃশব্দে বৈঠকখানা দিয়ে যেই বেরিয়ে যাবে জ্ঞানু এসে হাজির। তাকে কোথাও যেতে তৈরী দেখেই বলে ওঠে—

ভাইয়া, কোথায় যাচ্ছ?

সত্য—চলে যাচ্ছি রে কোথাও চাকরি করবো।

জ্ঞানু—দাঁড়াও আমি মাকে গিয়ে বলছি।

সত্য—তবে কিন্তু আমি তোমাকে লুকিয়ে চলে যাব।

জ্ঞানু—কেন চলে যাবে? তোমাকে কী আমি ভালবাসি না?

সত্যপ্রকাশ ভাইকে জড়িয়ে ধরে বলল—তোমাকে ছেড়ে যেতে প্রাণ চায় না, কিন্তু কী করব যেখানে ডাক-খোঁজ করার কেউ নেই সেখানে বেহায়ার মত পড়ে থেকে লাভ কী? কোথাও পাঁচ-দশ টাকার চাকরি করে নিজের পেট চালাতে পারব। বেশ লায়েক হয়ে গেছি।

জ্ঞানু—তোমার ওপর মা সব সময় বিরক্ত কেন? আমাকে তোমার সঙ্গে মিশতে বারণ করেন।

সত্য—আর কি করব আমার ভাগ্যই খারাপ।

জাহ্নু—তুমি লেখাপড়ায় মন দাও না কেন ?

সত্য—মন লাগছেই না, কি করে দিই ? যখন কেউ পাত্তা দেয় না তখন ভাবি—হায় এটা হয়নি, ধাক্কা খেয়ে যাব, এরকম শঙ্কা হয়।

জাহ্নু—আমাকে ভুলে যাবে না তো ? আমি তোমার কাছে চিঠি লিখব। তুমি তোমার ঠিকানা জানিও।

সত্য—তোমার স্কুলের ঠিকানায় চিঠি লিখব।

জাহ্নু—(কাঁদতে কাঁদতে) আমি নিজেই জানি না কেন তোমাকে এত ভালবাসি।

সত্য—তোমাকে সব সময় মনে রাখব।

একথা বলে পুনরায় ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরল, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। তার কাছে একটি কানাকড়িও নেই, সহায় সম্বলহীন অবস্থায় কলকাতা চলেছে।

ছয়

সত্যপ্রকাশের কলকাতায় আগমন বৃত্তান্ত লেখার চেষ্টা করা বৃথা, অসীম সাহসী যুবক। মাত্রাতিরিক্ত সাহসের নেশায় মসগুল, তার উত্তম-শক্তি হাওয়ার মাঝে কেল্লা গড়তে সক্ষম,—স্থলে নৌকা চালাতেও প্রেরণা দান করে। কোন কাজই তার কাছে কঠিনতা আনয়ন করে না। দুর্গমকে সে পাত্তাই দেয় না, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। কলকাতায় আসাটা তার কাছে কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। সত্যপ্রকাশ সুচতুর যুবক। কলকাতায় গিয়ে কি করবে না করবে সে সিদ্ধান্ত সে প্রথমেই নিয়ে ফেলেছে। তাই থলেতে লেখার সামগ্রী সঙ্গে নিতে ভুল হয় নি। কলকাতার মত জনবহুল শহরে জীবিকা নির্বাহ যেমন কঠিন ব্যাপার আবার তেমনি সহজসাধ্যও। যে হাতের কাজ করতে সক্ষম তার কাছে অত্যন্ত সরল। কলম পেষা লোকের পক্ষেই তা কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলে বোধ হয়। মজুরের কাজ সত্যপ্রকাশের কাছে অত্যন্ত নীচু বলে মনে হোত। এক ধর্মশালায় তার জিনিসপত্র রাখল।

তারপর শহরের প্রধানস্থানগুলি অবলোকন করে লেখার সাজ সরঞ্জাম নিয়ে এক ডাকঘরের সামনে বসে পড়ল। কুলী কামীনদের চিঠিপত্র, মনিঅর্ডার ফরম্ ইত্যাদি লিখে দেবার কাজ নিল।

প্রথম কয়েকদিন তো ভরপেট খাবার পয়সাই কামাই হোত না। কিন্তু ধীরে ধীরে তার বিনীত ব্যবহার মজুরদের আকৃষ্ট করল। এছাড়া তাঁদের সমাচার এত বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করত যা শুনে তারা অত্যন্ত তৃপ্ত হোত। অশিক্ষিত লোক এক কথারই পুনরাবৃত্তি করে দু-তিন বার লিখতে চায়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায়ই তাদের দশা, যে নাকি আপন রোগের যথার্থতা ডাক্তারের কাছে ব্যক্ত করতে কোন প্রকার কষ্ট বা ক্লান্তি অনুভব করে না। সত্যপ্রকাশ সঠিক সূত্রের ব্যাখ্যা করে মজুরদের মুগ্ধ করে ফেলেছে। একজন হৃষ্ট চিত্তে ফিরে যায় তো তার অন্যান্য দেশওয়ালী ভাইদেরও এই সন্ধান দিতে ভুল করে না।

এই ভাবে এক মাসেই সে দিনপিছু ১ টাকা কামিয়েছে। ধর্মশালা থেকে শহরের বাইরে ৫ টাকার এক ছোট কামরায় ভাড়া গেল। এক বেলা আহার করে নিজের হাতেই বাসন কোসন পরিষ্কার করে। ভূমিতেই নিদ্রা যায়। এইরূপ নির্বাসন তার কাছে কোন দুঃখই আনয়ন করেনি। আত্মীয় স্বজনের কথা ভুলেও স্মরণ করত না। এইরূপ জীবন ধারণ করে সে কোন গ্লানি তো অনুভব করেই নি, উপরন্তু একপ্রকার তৃপ্তই লাভ করেছে। কিন্তু ভাই জ্ঞানপ্রকাশের সুমিষ্ট প্রেমমধুর কথা সর্বদাই কানে বাজে, তাকে সে ভুলতে পারছে না। এ যেন আঁধারের মাঝে দীপ্তির প্রকাশ। বিদায়ের সেই করুণ দৃশ্য চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পায়।

জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারে সুনিশ্চিত হয়ে জ্ঞানপ্রকাশকে একটি চিঠি লিখে দেয়। উত্তরও পেয়ে যায়, এক অফুরন্ত আনন্দের স্রোতে ভেসে চলে। সীমাহীন পরিতৃপ্তি অনুভব করে। জ্ঞানু আমাকে স্মরণ করে কাঁদে, আমার কাছে আসতে চায়, শরীর ভাল নেই। তৃষ্ণার্তের কাছে জল যেরূপ পরিতৃপ্তি প্রদান করে সেইরূপ তৃপ্তি এই চিঠি পড়ে

সত্যপ্রকাশ অনুভব করে। সংসারে আমি একা নই, জনবহুল জগতে একজন অন্ততঃ আমাকে ভালবাসে—আমাকে স্মরণ করে।

সেইদিন থেকে জ্ঞানপ্রকাশকে একটি উপহার পাঠাতে সত্যপ্রকাশ বদ্ধপরিকর হল। যুবকদের অতি সহজেই বন্ধু জুটে যায়। সত্যপ্রকাশেরও কিছুকালের মধ্যেই কিছু যুবকদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। বেশ কয়েকবার তাদের সঙ্গে সিনেমাও দেখেছে। গাঁজা-ভাঙ্গ, শরাব-কাবাবও চলেছে তার সাথে। আয়না-চিরুনী, সুগন্ধি তেল ইত্যাদি প্রসাধনও সামগ্রীর দিকে বেশ ঝোঁক দেখা দিয়েছে। হাতে যা আসছে সবই খোলাম-কুচির মত উড়িয়ে ফাঁক করে দিচ্ছে, নৈতিক অধঃপতন ঘটতেও খুব বেশী সময় লাগল না, ক্রমে শরীর বিনষ্ট হতে বসল। এই ভ্রাতৃ প্রেমাপ্লুত পত্র তার শৃংখলা বিহীন চরিত্রের পায়ে বেড়ি বাঁধল। এক নতুন জগতের সন্ধান পেল। উপহার দেবার বাসনা তীব্রভাবে জেগে উঠল। শুরু হল বিলাসহীন জীবন। সমস্ত কলুষতার অবসান ঘটল। সিনেমার নেশা টুটে গেল। বন্ধুদের নানান ছল-ছুতায় এড়িয়ে যেতে লাগল। সাত্বিক ধরনের সাদামাটা আহার করতে লাগল। ধন সঞ্চয়ের ইচ্ছা জীবনের সকল কামনাবাসনাকে পরাস্ত করে দিল একটি ভাল ঘড়ি দিতে মনস্থ করল। যার দাম হবে অন্তত পক্ষে ৪০ টাকা। আগামী ৩ মাসে এক কানাকড়িও অপব্যয় করবো না, তা'হলেই একটা ঘড়ি হয়ে যাবে। জ্ঞানু ঘড়ি দেখে কতই না খুশী হবে। মা-বাবাও নিশ্চয়ই দেখবেন। তাঁরা বুঝতে পারবেন যে সত্য শুকিয়ে মরে যায় নি। মিতব্যয়িতার নেশায় পেয়ে বসল। অনেক সময়ই বাতি জ্বালাতো না। খুব ভোরেই কাজে বেরিয়ে যেত আর সারাদিন দু-চার পয়সার মিষ্টি খাবার খেয়েই কাজ করে যেত। ক্রমে ক্রমে গ্রাহকের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। চিঠিপত্রের উপর অতিরিক্ত 'তার' লেখার অভ্যাস করেছে। ছ'মাসেই তার কাছে ৫০ টাকা জমল। তারপর যখন ঘড়ির সাথে একটি সোনালী রং-এর চেন জ্ঞানুর নামে পার্সেল করে পাঠাল, সেদিন তার আনন্দ দেখে কে—তার মনে উৎসাহের

জোয়ার এসেছে। মনে হচ্ছে কোন নিঃসন্তান ব্যক্তির অনেক কামনার ধন ছেলে হয়েছে।

সাত

'ঘর' নামক স্থান কত কোমল, পবিত্র মধুর স্মৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রেমের আশ্রয়স্থলও ঘর। বহু তপস্যার ফলেই প্রেমে এই ঘর লাভ। কৈশোরে 'ঘর' মাতা-পিতা, ভাই-ভগ্নী, বন্ধু-বান্ধবীর কথাই স্মরণ করিয়ে বিমল আনন্দ প্রদান করে। প্রেমময় স্মৃতিটুকু অক্ষয় করে রাখে। গৃহিণী ও সন্তান-সন্ততির প্রেম সিঞ্চিত মধুময় হাতছানির পরশ, শিশু সন্তানের কলকাকলির কলকল ধ্বনি 'ঘরই' প্রৌঢ়ের হৃদয়ে সাড়া জাগায়। এই প্রীতিময় স্মৃতি মানবমনের গভীরে সর্বদাই অনুরণিত হয়। এই হিল্লোলের দোলা বহুবাঞ্ছিত ঘরেরই অবদান যা মানব-মনকে বিচলিত করে না সুস্থির করে তোলে, চিত্তে শান্তি জাগায়। বিশাল সংসার সমুদ্রের বেগবতী লহরী ও নানা ঘাত-প্রতিঘাত যা মানব জীবনে অবধারিত, সেই বিপদ-সঙ্কুল প্রস্তরাকীর্ণ জীবন-পথ থেকে 'ঘর'ই রক্ষা করে। এই তার মন্দির, ধ্যান-জ্ঞান সব কিছু, যা জীবনের সমস্ত বাধাবিঘ্ন থেকে রক্ষা করে সুরক্ষিত রাখে।

সত্যপ্রকাশের মনে তো 'ঘর'-এর মধুময় স্মৃতি রোমন্থিত হয় না। এই মধু কুম্ভের অমৃতের স্বাদ জীবনে পায় নি কখনও। তবে সে কোন শক্তির সাহায্যে কলকাতার মত জনবহুল শহরের বিরাট প্রলোভনকে জয় করতে সক্ষম হয়েছে! মাতৃপ্রেম, পিতৃস্নেহ অথবা গৃহীর ন্যায় সন্তান-সন্ততির চিন্তা? —না, তার রক্ষক, উদ্ধারকারী, পরিতৃপ্তি সে কেবলমাত্র ভাই জ্ঞানপ্রকাশের প্রীতি সুগম্ভীর ভালবাসা। তার জন্যই তো এই মিতব্যয়িতা, কঠোর পরিশ্রম। পয়সা উপার্জনের নতুন নতুন উপায় খোঁজে। জ্ঞানপ্রকাশের চিঠির মাধ্যমেই দেবপ্রকাশের আর্থিক অবস্থার কিছুটা আঁচ করেছে। এখন আর আগের মত অবস্থা নেই। জ্ঞানপ্রকাশের জন্য আর গৃহশিক্ষক নেই। একটি ঘর তৈরী করতে

গিয়ে অনুমানের চাইতে অধিকমাত্রায় ব্যয় হয়ে যাওয়াতে ঋণী হয়ে পড়েছে। সেই থেকে জ্ঞানপ্রকাশের পড়া বাবদ প্রতিমাসেই কিছু পাঠাতে সত্যপ্রকাশের ভুল হয় না। এখন আর সে কেবল মাত্র পত্র লেখকই নয়, লেখার এক সাজসরঞ্জামের ছোট দোকানও সাজিয়ে বসেছে। এতে লাভও হয় প্রচুর। আমদানিও খুব। এইভাবে পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হোল। রসিক দোস্তের দল তার কৃপণতা ও উদাসীনতা লক্ষ্য করে যাওয়া আসাই ত্যাগ করল।

আট

সন্ধ্যা আগত। বাড়িতে বসে দেবপ্রকাশ জ্ঞানপ্রকাশের বিবাহ সম্বন্ধে দেবপ্রিয়ার সঙ্গে আলোচনায় রত। জ্ঞানু এখন ১৩ বছরের সুন্দর তরুণ। কন্যাপক্ষ ৫০০০ টাকা পণ দিতে রাজী। বাল্যবিবাহ বিরোধী হয়েও আজও দেবপ্রকাশ এই সুযোগের শুভমুহূর্ত হারাতে গররাজী।

দেবপ্রকাশ—আমি তো তৈরীই, কিন্তু তোমার ছেলে, সে রাজীতো।

দেবপ্রিয়া—ও রাজী হতে কতক্ষণ, তুমি কথাবার্তা পাকা কর তো। সব ছেলেই প্রথমে আপত্তি করে। তারপর ঠিক।

দেব—জ্ঞানুর এই অস্বীকার সংকোচজনিত নয়, এটা সিদ্ধান্তসূচক অস্বীকারই বটে। সে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে ভাইয়ার বিয়ে না হলে, আমি বিয়ে করছি না।

দেবপ্রিয়া—তার ভায়ের কথা বাদ দাও। নিশ্চয়ই কোনো মেয়েমানুষ রেখেছে, আর বিয়ে করেছে কি না তা কি কেউ দেখতে গেছে?

দেব—(রাগত কণ্ঠে) রক্ষিতা রাখলে আর তোমার ছেলেকে মাসকে মাস ৪০ টাকা পাঠাতো না আর জিনিসও পাঠাতো না। ও বরাবর দিয়ে আসছে। আমি বুঝতেই পারছি না যে কেন তুমি ওর সম্বন্ধে

কদর্য ধারণা নিয়ে বসে থাক। ও চায় কলজে নিংড়ে সব দিয়ে দিতে, কিন্তু তোমার মন তাতেও একটু দয়ার্দ্র হয় না।

দেবপ্রিয়া নারাজ হয়ে চলে গেল। সত্যপ্রকাশের আগে বিবাহ দেওয়া কর্তব্য এটাই ছিল দেবপ্রকাশের মনোবাঞ্ছা, কিন্তু দেবপ্রিয়া কিছুতেই সে প্রসঙ্গে আসতে দিতে চায় না। প্রথমে বড় ছেলের বিবাহ দেওয়াটাই দেবপ্রকাশের আন্তরিক ইচ্ছা, কিন্তু আজ পর্যন্ত সত্যপ্রকাশের কাছে একটি চিঠিও দেন নি। দেবপ্রিয়া চলে যেতে আজই প্রথম চিঠি লিখতে বসলেন। এতদিন চুপচাপ থাকার জন্য প্রথমে পুত্রের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে বাড়িতে আসতে অনুরোধ করলেন। লিখলেন, বাবা সত্যপ্রকাশ আর কি, এ সংসারের মায়াময় মোহের জাল কাটতে আমার আর বেশী দেরী নেই। আর দিন কতকের অতিথি আমি। তাই আমার একান্ত ইচ্ছা তোমার এবং তোমার ভাইয়ের বিবাহ দেখে যাই। তুমি আমার কথা না রাখলে অত্যন্ত দুঃখ পাব। তারপর জ্ঞানপ্রকাশের অবিবেচনার কথাও লিখলেন। অবশিষ্ট একটি কথার উপর জোর দিয়ে লিখলেন কাউকে ক্ষমা না করতে পারলেও জ্ঞানপ্রকাশের প্রেমডোরে তোমাকে অবশ্যই বাঁধা পড়তে হবে। সে ডাক তোমাকে অবশ্যই হাতছানি দেবে।

এ চিঠি পেয়ে সত্যপ্রকাশের মনে ভীষণ খেদ এলো। আমার ভ্রাতৃস্নেহের এই পরিণাম। হায় আমি বুঝতে পারিনি। সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মার মানসিক অশান্তির কথা ভেবে ঈর্ষাময় আনন্দের সঞ্চারও হোল। আমার জন্যে তো তাদের কোন চিন্তা নেই। আমি মরে গেলেও ওদের চোখে এক ফোঁটা অশ্রু দেখা দেবে না। সাত বছর কেটে গেল, কই কখনও তো ভুলে চিঠি দিয়ে খোঁজ করেনি মরে গেছি কি বেঁচে আছি। এখন যদি কিছুটা চেতনা হয়। জ্ঞানপ্রকাশও শেষে বিয়ে করতে রাজী হবে, তবে তা খুব সহজসাধ্য হবে বলে মনে হয় না। আর কিছু না হোক একবার অন্ততঃ অস্বীকারের কারণ জানিয়ে চিঠি দিতে ভুল করবে না। জ্ঞানুর প্রতি আমার অপরিসীম স্নেহ, কিন্তু তাই বলে পারিবারিক

অশান্তির দোষী সাব্যস্ত হব না। আমার ব্যক্তিগত জীবন ভুলেছ তরা। সকলের কাছেই আমি ন্যায়-বিরোধী, দোষী। এইরূপ মনোমালিন্য ও কুবুদ্ধি সর্বদাই ক্রূরতা, নৃশংসতার বীজ বপন করে সংসারকে বিষময় করে তোলে। প্রেমময় অমৃতও তখন গরল বোধ হয়। এইরূপ মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে মনুষ্য আপন সন্তানেরও শত্রু হয়ে উঠে। কিছুতেই তা হতে দেব না। দেখেশুনে এই আগুনে আমি হাত দিতে নারাজ। জ্ঞানুকে আমি অবশ্যই বোঝাব। আমার শেষ কপর্দকটিও তার বিয়েতে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হবনা। ব্যস, এর অধিক আর কিছু করাই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জ্ঞানু অবিবাহিত থাকলে বংশ রক্ষা হবে কি করে? সংসার দুর্দান্ত মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করবে। বংশানুক্রমে এইরূপ পিতার পদাঙ্ক কি অনুসরণ করবে? ভগবান না করুন তার জীবনে সেই নাটকীয় পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি না ঘটে। উঃ! কি ভয়াবহ অভিনয়! যা আমার জীবনে সর্বনাশা ঝড়ের মত প্রবাহিত হয়ে গেছে। সেই পরিণতি আমার জীবন পটে উদ্ভাসিত।

পরদিন সত্যপ্রকাশ ৫০০ টাকা পিতার নামে পাঠিয়ে দিয়ে চিঠির উত্তর দেয়—আমার মত হতভাগ্যকে যে আপনি স্মরণ করেছেন তার জন্য আমি নিজে একজন ভাগ্যবান বলেই মেনে নিলাম। চিন্তা করবেন না, জ্ঞানুর বিবাহ অবশ্যই হবে, এ তারই আশীর্বাদ, অভিনন্দন স্বরূপ। এই টাকায় নববধূকে কোন অলংকার প্রদান করে আমার আশীষ জানাবেন। আমার বিবাহ! সে কথা থাক্। নিজের চোখে যা দেখলাম, যে ঝঞ্ঝা আমার মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেল, সে কথা স্মরণ করলে আজ আমি ভয়ে শিউরে উঠি। এত জেনেশুনে এই কুটুম্বিতা সূত্রে আবদ্ধ হলে লোকে আমার গায়ে থু থু ছেটাবে, আমার মত বড় গর্দভ আর একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আশা করি আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। বিবাহ-চর্চা আমার হৃদয়ে কুঠরাঘাত স্বরূপ মর্মদায়ক।

মাতাপিতার আজ্ঞা শিরোধার্য করতে জ্ঞানপ্রকাশকে চিঠি লিখল—

আমি অশিক্ষিত, মূর্খ, নির্বোধ। বিবাহ করার অধিকার থেকে আমি বঞ্চিত। যদিও আমি তোমার বিবাহের শুভ উৎসবে সম্মিলিত হতে অসমর্থ তথাপি এর চাইতে বড় আনন্দ আমার কাছে আর নেই।

চিঠি পড়ে দেবপ্রকাশের আশ্চর্য হবার পালা। কিন্তু পুনরায় আগ্রহ প্রকাশ করার সাহস তিরোহিত হল। ওদিকে নাক সিট্‌কিয়ে দেবপ্রিয়া বলে—ছোঁড়া অত্যন্ত কায়দাবাজ। দেখতেই অমন সাদা-সিধা অন্তর বিষময়। অতদূরে বসেও কেমন বড়শিতে টোপ ফেলেছে।

চিঠি পড়ে জ্ঞানপ্রকাশ অত্যন্ত মর্মাহত হোল। বাবা মার সাংঘাতিক অন্যায় আচরণই আজ তাকে এইরূপ ভীষণ ব্রত গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। তাঁরাই তাকে এই নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করেছে, এবং তা সব সময়ের জন্যই। ভগবান জানেন ভাইয়ার প্রতি মার কেন এই আক্রোশ, কিসের প্রতিশোধ তা আমার বুদ্ধির অগোচরে। আমার যতটা স্মরণ আছে তাতে দেখেছি সে কৈশোর থেকে অত্যন্ত আজ্ঞাকারী, বিনয়ী, গম্ভীর। মায়ের কথার অন্যথা করতে দেখিনি আমি ভাল খেতাম, ভাল পড়তাম, তথাপি ভাইয়াকে কখনো ক্ষুণ্ণ হতে দেখিনি যদিও তার মনে ঈর্ষার উদ্রেক হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল এইরূপ ব্যবহার যদি তাকে জীবনের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার করে তবে তা আশ্চর্যের কিছু নয়। পুনরায় আমিই বা কেন এইরূপ বিপত্তিতে আবদ্ধ হব? কে জানে, হয়তো আমাকেও এইরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি পড়তে হবে। ভাইয়া চতুর্দিকের কথা বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সন্ধ্যাকালে মাতাপিতা দুজনেই এই সমস্যার বিষয় আলোচনারত। সেইসময় জ্ঞানপ্রকাশ এসে বলল—কাল আমি ভাইয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাব।

দেবপ্রিয়া—কলকাতা যাবে?

জ্ঞান—আজ্ঞে হ্যাঁ।

দেবপ্রিয়া—তাকে এখানে আসতে বলতে পারলে না?

জ্ঞান—কোন মুখে তাকে ডাকব? সে পথ বন্ধ। আপনারা প্রথমেই আমার মুখে কালি লেপন করে দিয়েছেন। দেবতার মত লোক, আপনাদের জন্যই বিদেশ বিভূঁইয়ের মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে। আমি এতই নির্লজ্জ হয়ে গেছি যে……

দেবপ্রিয়া—আচ্ছা চুপ কর। না, বিয়ে করবে না। আমাকে আর কাটা ঘায়ে নুন ছিটিও না। মা-বাপের কর্তব্য, তাই বলা, নইলে আমার ঠ্যাঙের দায় ভারী। মন চায় বিয়ে কর নয়তো আইবুড়ো থাক্, আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা হতচ্ছাড়া।

জ্ঞান—কি হোল, আমাকে দেখতেও কি ঘেন্না ধরে গেছে।

দেবপ্রিয়া—যখন তুই আমাদের কথার বাইরে চলে গেছিস তো মন যা চায় তাই করতে পারিস। জানব, ভগবান আমাদের কোন ছেলে দেননি।

দেব—মিথ্যে কেন কটুবাক্য বলছ?

জ্ঞান—আপনাদের যখন এই মনোবাসনা, তখন তাই হবে।

ক্রমে কথা বেড়ে যেতে লাগল দেখে দেবপ্রকাশ জ্ঞানুকে ইশারায় ঘরের বাইরে চলে যেতে বললেন এবং পত্নীর ক্রোধ নিবারণে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু দেবপ্রিয়া কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল - আমি ওর মুখ দেখতে চাই না। হতাশ হয়ে দেবপ্রকাশ চিৎকার করে বলে ওঠেন—তুমিই গালিগালাজ করে ওকে উত্তেজিত করেছ।

দেবপ্রিয়া—এই সমস্ত ওই চাঁড়ালের কাজ। ও এই বিষ ছড়িয়েছে। সাত সমুদ্দুরের পারে বসেও আমাকে ধূলিসাৎ করে দেবার ফিকির করছে। ছেলেকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যেই মিথ্যে প্রেমের সঙ সেজেছে। আমি হাড়ে হাড়ে ওকে চিনেছি। এই কুমন্তর দিয়ে ও আমার জ্ঞান সাবাড় করে দেবে। নয়তো যে জ্ঞানু আমার কথার কখনও অবাধ্য হয় নি সে কিনা আমার এত জ্বালাচ্ছে।

দেব—আরে বাবা, তাই বলে কি বিয়ে করবে না। রাগের মাথায় বলে দিয়েছে। একটু শান্ত হলেই আমি ঠিক রাজী করাব।

দেবপ্রিয়া—ও এখন হয়তো বাইরে চলে গেছে।

দেবপ্রিয়ার আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হোল। দেবপ্রকাশ ছেলেকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলেন। বল্লেন—এই শোকে তোমার মা মরে যাবে, কিন্তু তাতেও কোন ফল হোল না। 'না' কে একবারও হ্যাঁ করানো গেল না। অগত্যা পিতা নিরাশ হয়ে বসে পড়লেন।

তিন বৎসর পর্যন্ত প্রতিবারই বিবাহের তারিখগুলো এগিয়ে এলে এই কথাই উঠত, কিন্তু জ্ঞানপ্রকাশ নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল। মায়ের কান্নাকাটি সবই নিষ্ফল হয়ে গেল। তবে মায়ের একটি কথা সে মাথা পেতে মেনে নিয়েছে—দাদার সাথে দেখা করতে কলকাতায় যায় নি।

তিন বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দেবপ্রিয়ার তিন কন্যার বিবাহ হয়ে গেছে। ঘরে এখন স্ত্রীলোক বলতে সেই। শূন্যঘরটা মনে হয় তাকে গিলতে আসে। ক্রোধে, নৈরাশ্যে পাগল প্রায় হয়ে গিয়ে সত্যপ্রকাশকে প্রাণভরে শাপ শাপান্ত করত। কিন্তু দুই ভাইয়ের মধ্যে মধুময় পত্রের আদান-প্রদান অব্যাহত ছিল।

দেবপ্রকাশের চরিত্রে এক বিচিত্র ধরনের উদাসীনতা প্রকাশ পেল। তিনি চাকরিতে অবসর গ্রহণ করে পেন্‌সন নিতে লাগলেন, এবং ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করলেন। ওদিকে জ্ঞানপ্রকাশও 'আচার্য' উপাধি নিয়ে এক বিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন। সংসারে দেবপ্রিয়া এখন একা।

নিজপুত্রকে সংসারী করার জন্য দেবপ্রিয়া নিত্য নতুন তুকতাক করতে ব্যস্ত। কুটুম্ব কন্যাদের রূপ, গুণপনা ও শিক্ষার ব্যাখ্যা করাই তার একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়াল। জ্ঞানপ্রকাশের কিন্তু এই কথায় কান দেবার সময়ও নেই।

পড়শীঘরে প্রায়ই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। নববধূ আসে, তারপর

কোল আলো করা শিশুরও আগমন ঘটে, ঘরে আনন্দের ফোয়ারা বয়ে যায়। কেউ যায় কেউ আসে, এই হাসিকান্নার খেলাতে গুলজার হয়ে ওঠে। গান বাজনায় মুখরিত হয়ে ওঠে তাদের গৃহ। এইরূপ ক্রীড়া-কৌতুক, আমোদ-প্রমোদে দেবপ্রিয়ার চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটাই স্বাভাবিক। মন উথাল পাথাল হয়ে পড়ে একটিই তার চিন্তা। এ সংসারে আমার মত অভাগিনী আর নেই। এসুখ আমার কপালে লেখা নেই। ভগবান, এমন দিন কি আমার হবে যে বৌ-এর মুখ দেখে প্রাণ জুড়াব, নাতি নাতনীকে নিয়ে আদর করব। আনন্দোৎসবের মধুময় গীতের তান কি আমার ঘরেও শোনা যাবে। রাত দিন কেবল এই চিন্তা। তার দশা উন্মাদিনীর ন্যায় হয়ে গেল। আপনমনেই সত্যপ্রকাশকে অভিশম্পাত করতে থাকে—এই আমার প্রাণঘাতক দুষমন। আত্ম-চিন্তার অতল গহ্বরে লীন হয়ে যাওয়াই পাগলের বিশেষত্ব. এই তল্লীনতাভাব ভীষণভাবে রচনাশীল হয়ে থাকে। কল্পনা প্রবণতার দিকেই ঝোঁক বেশী। আকাশে দেবতার রথও সে এই প্রবণতায় চালাতে সক্ষম হয়। দিবসেও স্বপ্নে বিভোর। আজকাল প্রায়ই ব্যঞ্জনে লবণ বেশী হয়ে যায়, তাও ওই শত্রুর কারসাজি। ওর ঘাড়েই দোষ চাপে। অনবধানতাবশতঃ দেবপ্রিয়ার মনে হয়। সত্যপ্রকাশ বাড়িতে এসেছে, সে আমাকে মারতে আসছে, জ্ঞানপ্রকাশকে গরল ভক্ষণ করিয়েছে। যতদূর অভিশাপ করার করে একদিন সত্যপ্রকাশকে এক চিঠি লিখল। তুই আমার প্রাণের চরম বৈরী, আমার বংশঘাতক, হত্যাকারী। ভগবান তোকে কবে নেবে। তুই আমার ছেলেকে বশ্ করেছিস্। দ্বিতীয় দিনও এইরূপ পত্র লিখল, এখন থেকে এটাই তার নিত্যকর্ম হয়ে উঠল। যতক্ষণ না সত্যপ্রকাশকে চিঠিতে গালি দিতে পারত ততক্ষণ কোন আরামই বোধ করত না। কোন কাজেই মন বসত না। এইসব চিঠি কহারিনের* হাত দিয়ে জমা দিত।

* এক ধরনের মহিলা যারা জল তোলে। কহার জাতির স্ত্রীলিঙ্গে কহারিন।

জ্ঞানপ্রকাশের অধ্যাপক হবার সংবাদ সত্যপ্রকাশের কাছে বজ্রাঘাতেরই সামিল। পরবাসে থেকেও সে দুনিয়ায় সহায়হীন নয় এই সন্তোষ মনে ছিল, এই চিন্তাই তাকে উদ্যম দান করত, প্রেরণা যোগাত, কিন্তু সেই অন্ধের যষ্ঠিরূপ শেষ সম্বলটুকুও নষ্ট হয়ে গেল। মনও ভেঙ্গে গেল। জ্ঞানপ্রকাশ জোর দিয়ে লিখেছে—এখন আর আপনাকে আমার জন্য কোন কষ্ট করার প্রয়োজন নেই, কাজ কমিয়ে দিন। পর্যাপ্ত পরিমাণেই আয় করছি। আমার প্রয়োজন বেশ ভালোভাবেই—মিটে যাবে। বরঞ্চ উদ্‌বৃত্তই হবে।

এতদিন সত্যপ্রকাশের দোকানও খুব ভালই চলত, কিন্তু কলকাতার মত শহরে এক ছোট দোকানদারের জীবনযাত্রা খুব একটা সুখের নয়। মাসিক আয় ৬০-৭০ টাকা হলে কি হবে, এতদিন মিতব্যয়ী হয়ে যা কিছু বাঁচিয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা উদবৃত্ততো নয়ই, প্রত্যুত এটা এক ধরনের ত্যাগ। একবেলা শুকনো খাবার খেয়ে, অস্বাস্থ্যকর, স্যাঁত-স্যাঁতে ঘরে বাস করে মাসে ২৫-৩০ টাকা বাঁচাত। এখন দুবেলাই ভরপেট খায়। কাপড় চোপড়ও পরিষ্কার হয়েছে কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তার খরচার মধ্যেই ওষুধ-পাতির খরচের অঙ্কটা অত্যন্ত বেড়ে গেল। আবার আগের অবস্থা ফিরে এল। বেশ কয়েক বছর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকার দরুন ও অপুষ্টিকর খাদ্যজনিত রোগে আক্রান্ত হলো, স্বাস্থ্য বেশ ভালো করেই নষ্ট হোতে বসল। অরুচি, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি নানান রোগ সত্যপ্রকাশকে ঘিরে ধরছে। মাঝে মধ্যেই জ্বরের কবলে পড়ছে। যুবাবস্থায় আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ছিল, এর বাইরে কিছুকেই পাত্তা দিত না। ভয়ডরের ধার ধারত না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবদেহে অনেক কিছুই দেখা দেয়, দানা বাধে অনেক নতুন উপসর্গ। আগে এক ঘুমেই রাত কাবার হয়ে যেত। বাজার থেকে আনা লুচি-পুরী মিঠাই খেয়েই কাল কাটিয়ে দিত। এখন আর সেই সুনিদ্রাও হয় না, বাজারের খাবারও অখাদ্য মনে হয়। রাত্রিতে ঘরে এলে শরীর ক্লান্তিতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। উনুন

শ্মশান, রান্না করা অত্যন্ত কষ্টকর মনে হয়। কখনও বা তার একাকিত্বের কথা স্মরণ করে রোদন করে। রাতে কোনমতেই ঘুম হয় না, সেই সময় কারো সঙ্গে সুখদুঃখের কথা কইতে অন্তর লালায়িত হয়ে ওঠে। কিন্তু রাতের ঘন আঁধার ছাড়া কেই বা তার সঙ্গী? দেওয়ালের কান থাকলেও মূক, প্রাণপণ করে চেষ্টা করলেও সব চেষ্টাই বিফল হবে। এদিকে জ্ঞানপ্রকাশেরও চিঠি দেওয়া কমে গেছে, দিলেও তা মধুহীন নীরস। তাতে সরলতাময় অভিব্যক্তির লেশমাত্র ন-ই। সত্যপ্রকাশের চিঠিতে আজও সেই ভাবময় আকুতি। প্রেম-ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে ওঠে পত্রগুলি। কিন্তু একজন অধ্যাপকের কাছে তা অশোভনীয়, নিরর্থক। জ্ঞানপ্রকাশও আমার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। নয়তো দিন কতকের জন্য আমার কাছে আসা অসম্ভব নয়, ক্রমে ক্রমে এই ভ্রম তার মনে বদ্ধমূল হলো। আমার কাছে চিরদিনের মত ঘরের দ্বার রুদ্ধ, কিন্তু তার তো কোন বাধাই নেই? সেই হত-ভাগোর এই কথাই বার বার মনে হোল যে মা নিশ্চয়ই জ্ঞানপ্রকাশকে কলকাতায় না আসার দিব্যি দিয়েছে। এই চিন্তা তাকে তিলে তিলে হতাশ করে দিল। দুনিয়ার সব কিছু অসার অনর্থক মনে হলো।

শহরে মানুষের প্রাচুর্যতা থাকলেও মানবিকতার অভাব বুকে বড় বেশী করে বাজত। এই বহুসংখ্যকের মধ্যে বাস করেও নিজেকে বড় একা নিঃস্ব অনুভব করত। এই একাকিত্বের চিন্তায় মনে এক নব আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত হোল। ঘরে ফিরে যাই না কেন? হাসি কান্নায় মাখা বহুজনের বহু আকাঙ্ক্ষিত 'ঘর' তাকে পিছু টানে। অন্তরের এই ক্ষুধা প্রেম পিয়াসী। তবে কি আমি কোন যোগ্য সঙ্গিনী নির্বাচন করে জীবন মধুময় করে তুলব? তার প্রেমের শরণাগত হব? জীবনের সব সুখশান্তির বারি কি সে সিঞ্চনে সমর্থ? আমার এই আশাহীন আঁধার জীবনে সেকি প্রেমদীপ জ্বালাবে? নিজের সমস্ত বিচারশক্তি দিয়ে সে এই আবেশ বিহ্বলতা রুদ্ধ করতে সচেষ্ট, কিন্তু শিশু যেমন ঘরে জমা থাকা মিষ্টি-মেওয়ার চিন্তায় খেলা ছেড়ে চলে আসে, সেইরূপ

তার মনও এই মধুর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যায়। ভাবে—আমি অভাগা তাই এই দশা, ভগবান জীবনের সব সুখ-শান্তি থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছেন। কেন ঈশ্বর আমাকে এত বুদ্ধিহীন করে সৃষ্টি করেছেন ? তবে কি আমি কাজে ফাঁকি দিয়েছি ? তা কি করে সম্ভব ? ছেলেবেলা থেকেই আমার উৎসাহ অভিরুচি কোন কিছুর কাছেই মাথা নত করেনি। শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার টুঁটি কেউ চেপে রাখতে পারেনি, অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে আজকে আমি দাঁড়িয়েছি, সাবালক হয়ে গেছি। পেটের জন্য আর বিদেশ বিভুঁইয়ে পড়ে থাকব না। আত্মাকে আর কষ্ট দিতে বা অত্যাচার করতে পারব না।

মাসাবধি সত্যপ্রকাশের মন ও বুদ্ধির মধ্যে এই চিন্তার ঝড় বয়ে গেল। একদিন দোকান থেকে এসে উনুনে আঁচ দিতে গেছে কি পিয়ন এসে ডাকতে লাগল। জ্ঞানপ্রকাশ ব্যতীত আর কারো চিঠি সে আশা করে না। জ্ঞানপ্রকাশের চিঠিও আজই পেয়েছে। আবার চিঠি ? মনে অনিষ্ট আশঙ্কার উদয় হোল। পত্র পেয়ে পড়ায় মনোনিবেশ করল। মুহূর্তেই তা হাত থেকে ভূপতিত হোল, সেও মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল, ভাগ্য ভাল পড়ে যায় নি।

এইটি দেবপ্রিয়ার বিষযুক্ত লেখনীজাত গরলপূর্ণ পেয়ালা, যা এক পলকেই জ্ঞানহীন করে দিতে সক্ষম। তার সমগ্র মর্মান্তিক ক্রোধ, নৈরাশ্য, কৃতঘ্নতা, গ্লানি এক হিমশীতল দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেই নিবৃত্তি ঘটল।

চৌকিতে গা এলিয়ে দিল, মানসিক ব্যথা সেই আগুনে জল হয়ে গেল। হায় ! সারাজীবন বৃথা গেল আমিই নাকি জ্ঞানপ্রকাশের চরম শত্রু, এতদিন কেবলমাত্র তার প্রাণনাশের নিমিত্তই প্রেমাভিনয় করে গেছি, তার বুক চিরে কলজে উপড়ে নিয়ে এক পিশাচ-নৃত্যই নাকি আমার আসল উদ্দেশ্য। ভগবান ! তুমিই এর একমাত্র সাক্ষী।

তৃতীয় দিবসে আবার দেবপ্রিয়ার পত্র এল। পড়ার হিম্মত কোথায় ? সত্যপ্রকাশ তা ছিঁড়ে ফেলে দিল।

একদিন পরেই আবার তৃতীয় পত্রের আবির্ভাব। তার পরিণতিও সেই একভাবেই ঘটল। এটাই তার নিত্যকর্ম হয়ে গেল। পত্র আসে, সে ছিঁড়ে ফেলে। দেবপ্রিয়ার অভিপ্রায়, বিনা পাঠেই পূরণ হোলো—সত্যপ্রকাশের হৃদয়ের গভীর অন্তস্থলে এক আঘাত হানলো।

অত্যন্ত হৃদয়াঘাত ও ক্ষত ছাড়াও একমাসেই সত্যপ্রকাশের জীবনে ঘৃণা ধরে গেল। দোকানের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে যাতায়াতও বন্ধ করে দিল। বেশীরভাগ সময় শুইয়েই কাটল। পুরানো দিনের সুখময় স্মৃতি মানসপটে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল। যেন মা কোলে নিয়ে বলছেন—'সোনা আমার, মাণিক আমার'! সন্ধ্যের সময় বাবা এসে কোলে নিয়ে বলতেন, 'বাছা'! স্নেহময়ী মায়ের সজীব, প্রাণবন্ত মূর্তি তার চোখে ভেসে উঠত, গঙ্গায় স্নান করতে যাবার দিনের সেই মূর্তি। তার সুধাময় বাণী আজও যেন কর্ণকুহরে ধ্বনিত হয়। পুনরায় সেই ভয়াল দৃশ্যের অবতারণা ঘটলো—নববধূকে 'মা' ডাকা। মাতৃসুলভ ব্যবহারের পরিবর্তে সেই কঠোর শব্দের কথা স্মরণ হোলো। ক্রোধাগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত সেই নেত্রদ্বয়ের ছবি সামনে ভেসে উঠল। সেই চাপা কান্নার কথাও মনে হোলো। সুতিকাগৃহের দৃশ্য মনে ভেসে উঠলো। কত সুগভীর ভালবাসা দিয়ে শিশুকে কোলে নিতে চেয়েছিল। মায়ের সেই বজ্রকঠোর শব্দ কানে এল। হায়, সেই বজ্রগম্ভীর স্বর আমার বিনাশকারী, আমাকে তিলে তিলে বিনষ্ট করে দিয়েছে। এইরূপ ছোটখাট কত ঘটনার কথাই স্মরণ হলো। আর এখন বিনা অপরাধে মা কটুবাক্য বর্ষণ করছেন, অভিশপ্ত হয়ে উঠেছে। পিতার নির্দয় আচরণ, নিষ্ঠুর ব্যবহার। কথায় কথায় বিদ্রূপ করা আর মায়ের মিথ্যাপবাদে বিশ্বাসী—হায় এই মর্মান্তিক ঝড় কি দুর্দান্ত আঘাতে আমার জীবন বিধ্বস্ত করে দিয়েছে! পাশ ফিরল, সেই বিভীষিকাময় দৃশ্যাবলী মানসপটে ভেসে উঠল। ঘন ঘন পাশ বদল করতে লাগল, সহসা চিৎকার করে উঠল—এই জীবন কেন শেষ হয়ে যাচ্ছে না।

শুয়ে শুয়ে কয়েকদিন কেটে গেল। সন্ধ্যা সমাপন্ন হঠাৎ দরজায় কারো ডাক শোনা গেল। মন দিয়ে শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর। তড়িৎবেগে সদরে গেল, দেখল, জ্ঞানপ্রকাশ তার সম্মুখে দণ্ডায়মান। এক রূপবান যুবক! বক্ষে জড়িয়ে ধরল। জ্ঞানপ্রকাশ তার পদস্পর্শ করে অভিবাদন জানাল। উভয়ে ঘরে এসে বসল। অন্ধকার ঘনীভূত হোল। ঘরের দশা দেখে জ্ঞান-প্রকাশের রুদ্ধ আবেগ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। সত্যপ্রকাশ লণ্ঠন জ্বালাল। এ ঘর, না ভূতের ডেরা। তাড়াতাড়ি জামা গায় দিল। ভাই-এর রুগ্ন, জর্জরিত কায়া, ফ্যাকাশে মুখ, ঘোলাটে চক্ষু এই দেখে জ্ঞানপ্রকাশ অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল।

সত্যপ্রকাশ বলে—ভাই, আমি বড় অসুস্থ।

জ্ঞানপ্রকাশ—তাতো দেখতে পাচ্ছি।

সত্য—তোমার আসার কারণ কি? বাড়ির সব ভালতো?

জ্ঞান—খবর তো দিয়েছি। কিন্তু আপনি তার কোন উত্তরই দেন নি।

সত্য—তবে তা দোকানে আছে। দিনকতক দোকানে যায় নি। বাড়ির সকলের শরীর কুশল তো।

জ্ঞান—মা মারা গেছেন।

সত্য—হায়, হায়! কেন অসুস্থ ছিলেন?

জ্ঞান—আজ্ঞে না। ঠিক জানিনা। মনে হচ্ছে কিছু খেয়েছিলেন। প্রথমদিকে উন্মাদপ্রায় অবস্থা। বাবাও কিছু কটুকথা বলেন। তাই কিছু খেয়ে থাকতে পারেন।

সত্য—বাবার শরীর ভাল তো?

জ্ঞান—হ্যাঁ, এখনও না মরে বেঁচে আছেন।

সত্য—কেন? খুব অসুস্থ।

জ্ঞান—মা বিষ খেয়ে নিলে, বাবা মার মুখে হাত দিয়ে ঔষধ খাওয়ান। মা খুব জোরে তাঁর দু আঙুলে কামড়ে দেন। সেই

বিষ বাবার শরীরে প্রবেশ করে। সারা শরীর বিষিয়ে গেছে। হাসপাতালে আছেন। কাউকে দেখলেই কামড়াতে আসেন। বাঁচার আশা নেই।

সত্য—তাহলে ঘর তো একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে।

জ্ঞান—এরূপ পরিবারের অনেকদিন আগেই বিনষ্ট হওয়া উচিত ছিল।

তৃতীয় দিবসে দুই ভাই প্রাতঃকালেই কলকাতা থেকেই চলে গেল।

—০—

জুগ্‌নু কী চমক

(জোনাকির আলো)

পাঞ্জাবকেশরী রাজা রণ্‌জিৎ সিংহ অনেকদিন আগেই গত হয়েছেন। ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত একজন প্রতিষ্ঠিত নৃপতি হিসাবে। তাঁর মত মহান কর্ণধারের নাম আজও দেশের মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। পারস্পরিক দ্বেষ, হিংসা-কলহ মনোমালিন্যই তাঁর মৃত্যুর কারণ রূপে পরিগণিত। তা সত্ত্বেও রাজার আমলের সুন্দর, মনোরম রাজপ্রাসাদ এখন শূন্য, কালের করালগ্রাসে বিনষ্ট। কুমার দিলীপ সিংহ ইংলণ্ডে আর রাণী চন্দ্রকুমারী চুনার দুর্গে। প্রায়-বিনষ্ট রাজ্যের শাসন কার্য নির্বাহ করতে রাণী চন্দ্রকুমারী অত্যন্ত সচেষ্ট। শাসনকার্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সুতরাং কূটনীতি ঈর্ষার অগ্নি বর্ষণ ছাড়া আর কিবা করবেন?

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত প্রায়। আপন প্রাসাদের ছাদে দণ্ডায়মান হয়ে স্বচ্ছসলিলা গঙ্গার রূপ নিরীক্ষণ করছেন আর ভাবছেন—কল্লোল-বাহিনী কত স্বাধীন! এই সচেতনার মূলে কে শক্তি প্রদান করছে? কত গ্রাম গঞ্জ, নগর-বন্দর জলমগ্ন করে দেয়, কত জীবজন্তু তথা মনুষ্য-প্রাণ বিনষ্ট করে, কত সম্পদ নষ্ট করে দেয়, কিন্তু স্বাধীনতা সেই সাবলীল গতিতেই প্রবাহিত হয়। তার গতি রোধ করা সকল ক্ষমতার অতীত। অস্থির, চঞ্চল, প্রাণবন্ত উচ্ছল ঢেউয়ের বিরামহীন গতিই এর মূলে। গভীর গর্জন ও প্রচণ্ড শক্তিমত্তায় এই ধ্বংসকারী ঢেউ দল আদিম উল্লাসে নেচে ওঠে, বাঁধ বিনষ্ট করে নিজ প্রবাহে ধুয়েমুছে দিয়ে যায়।

এইরূপ চিন্তা-ভাবনা নিমজ্জিতা রাণী কেদারায় বসে পড়েন। তাঁর চোখের সামনে অতীতের মনোহর স্মৃতি স্বপ্নের ন্যায় উদ্‌ভাসিত

হয়ে উঠল। কখনও তাঁর ভ্রূযুগল বক্র তরবারি অপেক্ষা অধিক কঠোর, তীব্র হয়ে উঠত, আর হাসি ছিল বসন্তের মৃদু সুগন্ধিত সমীরণের চাইতেও প্রাণ-বন্ত। কিন্তু হায়, এখন তিনি শক্তিহীনা। তাঁর ক্রন্দনের শ্রবণকারী নিজেই, হর্ষ তাও আত্ম-প্রবাহের শক্তিপ্রদানকারী। তাঁর ক্রোধের পরোয়া কেউই করে না, আর প্রসন্ন হলেই বা কার কি? এতে কারোরই লাভ ক্ষতির বিষয় জড়িত নয়। রাণী ও বাঁদির মধ্যে বিশাল পার্থক্য। রাণীর চক্ষের অশ্রুবিন্দু কখনও গরলাপেক্ষা প্রাণহরক, আবার অমৃতাপেক্ষা মূল্যবান। নির্বান্ধব, নৈরাশ্যময় জীবন, আকাশের নক্ষত্র ব্যতীত তাঁর ক্রন্দনের সাক্ষী কেহই নয়।

দুই

এইভাবে কাঁদতে কাঁদতে রাণী তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র কুমার দিলীপ সিংহ, যাঁর মধ্যে তাঁর প্রাণ অন্তর্হিত, উদাস এক করুণ মুখচ্ছবি মানসপটে ভেসে উঠল। খাদ্য অন্বেষণে গাভী সমগ্রদিন বনে জঙ্গলে কাটিয়ে দিয়ে সন্ধ্যাকালে ঘরে ফিরে নিজ শাবককে দেখে মাতৃপ্রেমের উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে স্তন দুগ্ধে পূর্ণ করে দেয়, লেজ তুলে ছুটতে থাকে। সেইরূপ চন্দ্রকুমারী নিজের দুই বাহু প্রসারিত করে সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরতে যায় চোখ খুলতেই সব নেশার পরিসমাপ্তি ঘটে। জীবনের সমস্ত আশার ন্যায় সেই স্বপ্নও বিনষ্ট হয়ে যায়। গঙ্গার দিকে চেয়ে রাণী বলে উঠেন—মা, আমাকেও তোমার বুকে ঠাঁই দাও। সঙ্গে নিয়ে চলো। অতঃপর অতিশীঘ্র রাণী ছাদ থেকে অবতরণ করেন। লণ্ঠনের ম্লান আলোয় ঘরে আলো-ছায়ার মায়াময় মোহজাল বিস্তার করেছে। তাকে উজ্জ্বল করে এক ধারাল অস্ত্র কোমরে গুজলেন, নৈরাশ্যপূর্ণ সাহসিকতার প্রতিমূর্তি হয়ে পথে নেমে এলেন।

সান্ত্রী চিৎকার করে উঠল—কে যায়?

রাণী উত্তর দিলেন—আমি ঝঙ্গী।

কোথা যাচ্ছ?

গঙ্গাজল আনতে। কুঁজো ভেঙ্গে গেছে, ওদিকে রাণীজী জল চাইছেন।

সান্ত্রী একটু অগ্রগামী হয়ে বলে—একটু থাম্ আমিও সঙ্গে যাব।

ঝঙ্গী—আমার সঙ্গে এসোনা। রাণীজী এখন ঘরে আছেন। দেখে ফেলবেন।

সান্ত্রীর চোখে ধূলো নিক্ষেপ করে চন্দ্রকুমারী গুপ্তদ্বার দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, অন্ধকারে কণ্টকবিদ্ধ হয়ে পাথরে হোচট খেয়ে পা ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত।

অবশেষে গঙ্গাতীরে গিয়ে পৌঁছলেন। অর্দ্ধাপেক্ষা বেশী রাত। মা গঙ্গা এখন সন্তোষপ্রদায়িনী, সর্বশান্তি বিরাজকারিণী, যেন তারকা-খচিত উর্মিলাকে অঙ্কে নিয়ে বিশ্রামরতা। চতুর্দিকে এক সুগভীর নিস্তব্ধতা বিরাজমান। নদীর ধার দিয়ে যেতে যেতে রাণীজী ঘনঘন পিছনে ফিরে দেখেছেন। খালি একটি নৌকোকে নোঙ্গরাবস্থায় দেখতে পেলেন। এক মাঝিকে শুয়ে থাকতে দেখলেন। যথাসময়ে জাগাবার সঙ্কল্প নিয়ে শীঘ্র রসি খুলে তাতে উঠে পড়লেন, ধীরে ধীরে তা তীর ঘেষে চলতে লাগল। কোলাহলশূন্য ও অন্ধকারময় স্বপ্নের ন্যায় ধ্যানের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়ে সেই স্থান থেকে চলে গেলেন। নৌকা দোলায় চমকিত হয়ে মাঝি উঠে পড়ল। চোখ রোগড়ে দেখল তার সামনে তক্তার উপর এক নারীমূর্তি বৈঠা হাতে বসে আছে। হতবুদ্ধি হয়ে জিজ্ঞেস করল—তুমি কে গো? নৌকো কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

রাণী হেসে উঠলেন। ভীতিশূন্যতাকেই সাহস বলা হয়ে থাকে। বললেন—সত্যি না মিথ্যে কোনটা শুনতে চাও।

মাঝি একটু ভীতিভরে বলে ওঠে—সত্যি বল। রাণী বললেন—

আচ্ছা, তবে শোন, আমি লাহোরের রাণী চন্দ্রকুমারী। এই দুর্গে বন্দিনী ছিলাম। আজ সুযোগ এসেছে, তাই পলায়ন করছি। শীঘ্র আমাকে বেনারসে পৌঁছে দে। উপযুক্ত পরিশ্রমিক দিয়ে তোকে সন্তুষ্ট করে দেব। আর শয়তানের বশবর্তী হলে, এই কাটারি দেখে রাখ, তোর গর্দান যাবে। জীবনদীপ নিভে যাবে। ভোর হবার পূর্বেই আমাকে বেনারস পৌঁছতে হবে, স্মরণ রাখিস।

হুমকি মন্ত্রের ন্যায় কাজ করল। মাঝি অত্যন্ত বিনীত ভাবে নিজের কম্বল পেতে বসবার ঠাঁই করে দিয়ে তড়িৎগতিতে দাঁড় বাইতে শুরু করল। তীরবর্তী গাছপালা আকাশের প্রজ্জ্বলিত তারকারাজিও সঙ্গে ধাবিত হোল।

তিন

প্রত্যূষে চুনার দুর্গের প্রতিটি মানুষ অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত আশ্চর্য হয়ে গেল। সান্ত্রী, প্রহরী, দাসী বাঁদী সকলেই নত মুখে দুর্গস্বামীর সামনে কৈফিয়ত দিতে হাজির। চতুর্দিকে অত্যন্ত সুচতুরতার সহিত অন্বেষণ শুরু হলো, কিন্তু সব বৃথা, তাঁর সন্ধান কেউই দিতে পারল না।

অপরদিকে রাণী বেনারসে পৌঁছলেন। কিন্তু পূর্ব পরিকল্পনানুসারে পুলিশ ও সেনাবাহিনী জাল বিস্তার করেছে। নগরের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ। রাণীর সন্ধান-প্রদানকারীর জন্য বহুমূল্য পারিতোষিকেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কারাগারের বাইরে এসে রাণী জ্ঞাত হলেন যে তাঁর চতুষ্পার্শ্বে আরও দৃঢ় প্রতিরোধ। দুর্গের প্রতিটি মানুষ তাঁর অত্যন্ত অনুগত ছিল। স্বয়ং দুর্গপতিও তাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। কিন্তু আজ, স্বাধীন হোয়ে তারাও রুদ্ধ বাক্। সর্বত্র শত্রুর কঠিন বেড়াজাল। পূর্বের মিত্রকুল এখন অরি। পক্ষবিহীন পক্ষীর পিঞ্জরেই সুখানুভূতি হয়।

প্রতিটি যাতায়াতকারীর প্রতি পুলিশ অফিসারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কিন্তু এই ভিখারিণীকে আর কে দেখবে? এক ছিন্ন বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত, আনত মুখে যাত্রীদের পশ্চাতে গঙ্গার দিকে গমন করল। কোন প্রকার বিকৃত ভাব দেখা গেল না। নির্দ্বিধায় সে পথ অতিক্রম করল। ভিখারিণীর প্রতিটি ধমনীতে রাণীর রক্ত প্রবাহিত।

ভিখারিণী অযোধ্যার পথ ধরল। সমগ্রদিন দুর্গম পথ লঙ্ঘন করে রাতে কোন নির্জন স্থানে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ল। মুখমণ্ডল বিবর্ণ হোয়ে গেল। পা ক্ষতবিক্ষত। ফুলের মত মুখ নিষ্প্রভ হোয়ে গেছে।

চলতে চলতে প্রায় গ্রামেই লাহোরের রাণীর আলোচনা শুনতে পেত। রাণীর গোপন সংবাদে একাগ্রতা ও পুলিশের গোপন সাহায্যকারীর দৃষ্টি এড়াত না। তাদের দেখলেই ভিখারিণী হৃদয়ের সুপ্ত রাণী জেগে উঠতেন। ঘৃণার দৃষ্টিতে তাদের দিকে দেখতেন, রাগে শোকে তাঁর চক্ষু জ্বলে উঠত।

একদিন অযোধ্যার নিকটবর্তী এসে রাণী এক বৃক্ষের নীচে বসে পড়লেন। কোমর থেকে অস্ত্র উন্মুক্ত করে সামনে রাখলেন। ভাবলেন—কোথায় যাব? এই যাত্রাপথের অন্ত কোথায়? এই সংসারে কি আমার আর কোন স্থান নেই? সেই স্থান থেকে কিছু দূরে এক আমবাগিচা দেখা গেল। তাঁবুতে আচ্ছাদিত বড় বড় শিবির। চটকদার উর্দি পরিহিত সান্ত্রীদল পায়চারি করেছে, ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। এই রাজসিক সাজসজ্জার প্রতি অত্যন্ত শোকের সহিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। একবার তিনি কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তাঁর শিবির এর চাইতে আড়ম্বর পূর্ণ ছিল।

বসে বসেই সন্ধ্যা হোল। সেই স্থানে রাত কাটাতে রাণী মনস্থির করলেন। হঠাৎ এক ভ্রমণরত বৃদ্ধ তাঁর সম্মুখে হাজির হোল। পাকানো দাড়ি, পরনে চাপকান্ কোমরে তলোয়ার ঝুলছে। তড়িৎগতিতে রাণী

সেই কাটারি কোমরে রাখলেন। গভীর দৃষ্টিতে দেখে সৈনিক বলে উঠল—মা, তুমি কোথা থেকে এসেছ?

রাণী উত্তর দিলেন—বহু দূর থেকে।

'কোথায় যাবে?'

'তা বলতে পারছি না, দূরে বহু দূরে।'

পুনরায় গভীর মনোযোগের সহিত রাণীকে দেখে বলে উঠল—

'তোমার অস্ত্রটি আমাকে দেখাবে কি?'

রাণী অস্ত্র সামলে দাঁড়িয়ে পড়লেন, বল্লেন—শত্রু না মিত্র? কে তুমি?

ক্ষত্রিয় সন্তান উত্তর প্রদান করল—মিত্র।

সেপাইএর আচার ব্যবহার, কথাবার্তা চেহারায় কিছু মিত্রতাসুলভ লক্ষণ প্রকটিত হোল, যার ফলে রাণী বিশ্বাস করলেন।

সে বলে উঠল—বিশ্বাসঘাতক হব না, তুমি দেখে নিও।

কাটারি হাতে তুলে নিয়ে গভীর মনোযোগের সহিত দেখতে লাগল। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে শির নত করে রাণীর সামনে এসে বলে উঠল মহারাণী চন্দ্রকুমারী দেবী।

সকরুণ কণ্ঠে রাণী বলেন না, এখন আর রাণী নয়, অনাথিনী, ভিখারিণী। তুমি কে? সেপাই উত্তর দিল—আপনার একান্ত অনুগত সেবক।

নৈরাশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে বললেন—দুর্ভাগ্য ব্যতীত এই সংসারে আমার আর কেউ নেই।

সেপাই বলে উঠল—মহারাণীজী, এইরূপ বলে লজ্জা দেবেন না। পাঞ্জাব কেশরীর মহিষীর কথায় এখনও বহু সহস্র মানুষ নীরবে মাথানত করে সম্মান জ্ঞাপন করতে জানে। দেশে এখনও এইরূপ লোকের সংখ্যা বিরল নয় যারা আপনাদের নুন খেয়ে গুণ গাইতে ভুল করবে না। যারা আপনাদের ভুলে যায় নি। সর্বদাই আপনাদের আনুগত্য প্রকাশ করে প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

রাণী—এখন আমার তা ইচ্ছা নয়। আপাতত এক শান্তিপূর্ণ, নির্জন, স্থানাভিলাষী, এক পর্ণশালা ব্যতীত আর কিছুই চাই না।

সেপাই—পার্বত্য এলাকায় এইরূপ স্থানের নিদর্শন পাওয়া যায়। হিমালয় পাদদেশে চলুন মা, সমস্ত রকম উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে পারবেন।

রাণী (আশ্চর্য হয়ে) বৈরী এলাকায় যাব? নেপাল আমাদের চিরকালের শত্রু।

সেপাই—রাণা জঙ্গ বাহাদুর একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজপুত।

রাণী—কিন্তু এই জঙ্গবাহাদুর প্রায়ই আমাদের বিরুদ্ধে লর্ড ডালহৌসীকে সাহায্য প্রদানে যথেষ্ট পরিমাণে সচেষ্ট ছিল।

সেপাই—(লজ্জিত হয়ে) তখন ছিলেন আপনি মহারাণী চন্দ্রকুমারী দেবী। আর আজ, এক ভিখারিণী। ঐশ্বর্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত শত্রুর অভাব হয় না। চতুর্দিকে তারা সুগভীর জাল বিস্তার করে। জ্বলন্ত অগ্নি নির্বাপিত হয় বারিদ্বারা, অতঃপর সেই ভস্মই হয় শিরোধার্য। লোক অত্যন্ত ভক্তিসহকারে তা তুলে ধারণ করে। আপনি নির্ভাবনায় থাকুন, নেপাল যথার্থ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়নি। আপনি নির্ভয়ে চলুন। দেখবেন তাদের আদর-যত্নের কোন ত্রুটি ঘটবে না। আপনাকে মাথায় করে রাখবে

রাণী সেই রাত বৃক্ষতলেই কাটালেন। সেপাইও সেখানে নিদ্রা গেল। অতি প্রত্যূষে দুটি দ্রুতগামী ঘোড়া দেখতে পেল। একটির ওপর সেপাই আরোহণ করল। অপরটির সওয়ারি এক রূপবান যুবক। এই যুবকই রাণী চন্দ্রকুমারী, যিনি নিরাপদ স্থানান্বেষণে নেপালে যাত্রা করলেন। কিছুক্ষণ পরে রাণী পশ্চাতের দিকে উদ্দেশ করে বললেন—এ শিবির কার?

সেপাই উত্তর দিল—রাণা জঙ্গবাহাদুরের। তিনি তীর্থযাত্রায় চলেছেন। কিন্তু আমাদের আগেই পৌঁছে যাবেন বলে বোধ হয়।

রাণী—তুমি আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার এখানে কেন ঘটিয়ে দিলে না? তার আন্তরিক মনোভাব প্রকট হয়ে যেত।

সেপাই—এখানে তার সঙ্গে দেখা করা অসম্ভব ব্যাপার। গুপ্তচরদের কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। তাদের কঠিন বেড়াজালে চতুর্দিক আবদ্ধ।

চার

প্রাণ হাতের মুঠোয় করে সেই সময় কোন স্থানে পাড়ি দিতে হোত। এই যাত্রীদ্বয়কে বহুবার ডাকাতের মোকাবিলা করতে হয়েছে, সেই সময় রাণীর বীরত্ব, রণনিপুণতা তথা স্ফূর্তি দেখে বৃদ্ধ সেপাইয়ের চক্ষুস্থির। কখনো তাঁর তীক্ষ্ণ তরবারির সূক্ষ্ম চালনা আবার কখনো ঘোটকের তেজস্বী গতি।

সুদীর্ঘ যাত্রাপথ, জ্যৈষ্ঠমাসের পরিসমাপ্তি গমনপথেই ঘটলো। বর্ষা এল। আকাশ মেঘমালায় সজ্জিত হোল। শুষ্ক নদী এখন পরিপূর্ণ-যৌবনা। পাহাড়ী নদী সুগম্ভীর গর্জনে রত। নদী পথের দিশা পাওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার, তার ওপর নৌ চলাচল প্রায় বন্ধ। কিন্তু ঘোড়াদুটো লক্ষ্যস্থির করে নিল। জলে নেমে কখনও ডুবে কখনও ভেসে, সাঁতারে, চক্কর খেয়ে নদী নালা পার হয়ে যেত। একবার কচ্ছপের পৃষ্ঠে আরোহণ করে নদী পার হতে হয়েছিল। এই অভিযান তাদের কাছে কম রোমাঞ্চকর ছিল না।

কোথাও উঁচু উঁচু পুল, মহুয়ার ঘন বন; আবার সবুজ গমে পরিপূর্ণ ক্ষেত, হস্তিযূথ ও হরিণ দল তার মাঝে আনন্দ সহকারে ক্রীড়া করে। আলবদ্ধ ক্ষেত্র জলে পরিপূর্ণ। কৃষক রমণীরা সুমিষ্ট স্বরে গীত গেয়ে ধান রোপন করতে ব্যস্ত। কোথাও বা সেই হৃদয়গ্রাহী মনোহর সুরের মধ্যে ক্ষেত্রের আলে ছাতা মাথায় বিশ্রামকারী ভূস্বামীর কঠোর কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়।

নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করে অনেকানেক বিচিত্র দৃশ্যাবলী অবলোকন করে অবশেষে এই দুই যাত্রী তরাই অঞ্চল পেরিয়ে নেপালরাজ্যে প্রবিষ্ট হোল।

পাঁচ

প্রাতঃকালের এক আশ্চর্য মনোরম ক্ষণ। নেপাল মহারাজ সুরেন্দ্র বিক্রম সিংহের জমকালো দরবার জমজমাট হয়ে বসেছে। রাজ্যের সুপ্রতিষ্ঠিত মন্ত্রীবর্গ স্ব স্ব আসনে আসীন হয়েছেন। এই সাংঘাতিক যুদ্ধে জয়ী হয়ে নেপাল তিব্বত জয় করেছে। এখন সন্ধির শর্ত নিয়ে উভয়পক্ষে মতদ্বৈধতা চলছে। কারো নজর যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির প্রতি কেউ বা রাজ্য বিস্তারে আগ্রহী। কিছু মাননীয় ব্যক্তিদের মতে বার্ষিক করের উপর জোর দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সবই প্রায় ঠিক, কেবল রাণা জঙ্গবাহাদুরের আগমনের অপেক্ষায় সকলেই অধীর। মাসকতক দেশপর্যটনের পর আজ রাতেই দেশে ফিরেছেন। তাঁর আগমনের অপেক্ষায় যে প্রসঙ্গ আপাতত স্থগিত ছিল, মন্ত্রীসভায় তা উত্থাপন করা হয়েছে। আশা ও ভয়ের দোলায় দোদুল্যমান হয়ে তিব্বতের যাত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের কথা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। চোপদার যথাকালেই রাণার আগমনের কথা ঘোষণা করল। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত দরবারের প্রত্যেকে দণ্ডায়মান হোল। মহারাজকে প্রণাম পূর্বক তিনি নিজের সুসজ্জিত আসন গ্রহণ করলেন। মহারাজ বললেন রাণাজী, সন্ধির নিমিত্ত আপনি কি ধরনের প্রস্তাব করতে চান?

রাণা নম্রতা সহকারে বল্লেন—আমার অল্পবুদ্ধি প্রসূত মত, এই সময় কঠোর ব্যবহার করা অনুচিত। শোকাকুল শত্রুর প্রতি দয়া প্রদর্শন করাই আমাদের ধর্ম। এই সময়ে স্বার্থের মোহে পতিত হয়ে আমাদের মহামূল্যবান উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়া যথার্থ ধর্মের পরিচয় কি? আমরা এইরূপ সন্ধিই কামনা করব যা আমাদের হৃদয়-এর

প্রতি সামান্যতম করও দিতে সক্ষম। যদি তিব্বতরাজ আমাদের বাণিজ্যিক সুখ-সুবিধার প্রদান করতে উৎসাহী হন, তবে তাদের সঙ্গে সন্ধি প্রস্তাবে আমরা সর্বদাই উদ্যত।

মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ পেল। এই দয়ালুতার প্রতি সকলের সম্মতি ছিল না। কিন্তু মহারাজ সানন্দে রাণাকে সমর্থন করলেন। মন্ত্রীমণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্যের বৈরীকুলের প্রতি এরূপ নরম ব্যবহার অপছন্দ। তথাপি মহারাজের বিপক্ষে বলার মত সাহস কার!

যাত্রীবর্গ বিদায় হবার পর রাণা জঙ্গবাহাদুর দাঁড়িয়ে বল্লেন—সভায় উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলী, আজ নেপালের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হবার অপেক্ষা করছে, আপনাদের জাতীয় নীতিমত্তার যোগ্যতা পরিমাণ যথার্থ যার মধ্যে লুক্কায়িত। আপনাদের কর্তব্যপরায়ণতার উপরই সাফল্য নির্ভরশীল। রাজসভায় আগমনের প্রাক্কালে এক আবেদন পত্র আমার হাতে আসে। উপস্থিত সজ্জন মহোদয়ের নিকট তা উপস্থাপন করছি। তুলসীদাসের এই চৌপাই নিবেদক লিখেছেন—

"আপৎ কাল পরখিয়ে চারী
ধীরজ ধম মিত্র অরু নারী!"

(*বিপদকালেই* ধৈর্য, ধর্ম, মিত্র এবং নারীর যথার্থ পরিচয় লক্ষণীয়। *বিপদে ধৈর্য* এবং ধর্ম চ্যুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়। প্রকৃত বন্ধুর দেখাও মেলে এই বিপদে।)

মহারাজ জানতে চাইলেন—পত্রদাতা কে?

'এক ভিখারিণী।'

'কে এই ভিখারিণী?'

'মহারাণী চন্দ্রকুমারী।'

কড়বড় ক্ষত্রী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল—আমাদের মিত্র ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে যে পলায়ন করেছে?

লজ্জিত হয়ে রাণা জঙ্গবাহাদুর বলে উঠেন—আজ্ঞে হ্যাঁ অত্যাবধি এরূপ বিচার করতেই আমরা অভ্যস্ত।

কড়বড় ক্ষত্রী—ইংরেজরা আমাদের মিত্র পক্ষ। মিত্রের শত্রুর প্রতি সহায়তা প্রদান মিত্রতার নীতি বিরুদ্ধ।

জেনারেল শামশের বাহাদুর—এ অবস্থায় এটা একটা ভীতিজনক ব্যাপার। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আমাদের সব সম্পর্ক না নাশ হয়ে যায়।

রাজকুমার রণবীর সিংহ—সর্বোপরি একথা অপরিহার্য যে অতিথি সৎকার আমাদের পরম ধর্ম। কিন্তু তার সময় নির্ধারিত, মিত্র পক্ষের বিরুদ্ধাচারণ করে সেই আচরণ করা অত্যন্ত শংকাজনক।

এই প্রসঙ্গ নিয়ে নানা মতভেদ দেখা গেল ও সোরগোলের সৃষ্টি হোল। কিছু মুখ্য—মহোদয়ের কণ্ঠে শোনা গেল মহারাণীর এই সময় আগমন দেশের পক্ষে কখনই মঙ্গলজনক নয়।

তখন রাণা জঙ্গবাহাদুর উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম আকার ধারণ করল। সদ্বিচার ক্রোধের উপর অধিকার বিস্তারে ব্যর্থ প্রযত্নশীল। তিনি বলে ওঠেন—ভাই সকল এই সময় আমার কথা আপনাদের নিকট অত্যন্ত কঠোর অনুভূত হলে, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার শ্রবণ ক্ষমতার কাছে আমি পরাভূত। জাতীয় সাহসহীনতার এই লজ্জাকর দৃশ্য দেখার শক্তি আর আমার নেই। যদি নেপাল দরবারের অতিথি সৎকার ও সহায়তা নীতি প্রদর্শনের যথেষ্ট সৎসাহস না থাকে তবে এই ঘটনা সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার ভার নিজ স্কন্ধে তুলে নিলাম। দরবার নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষরূপে সর্ব-সাধারণের মধ্যে ঘোষণা করতে পারে।

কড়বড় ক্ষত্রী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠে—কেবলমাত্র এই ঘোষণার দ্বারাই দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও সুরক্ষা সম্ভব নয়।

রাণা জঙ্গবাহাদুর ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন, কিন্তু সে ভাব গোপন করে বল্লেন—দেশের শাসনভার যাদের ওপর ন্যস্ত, এইরূপ

অবস্থায় পতিত হওয়া তাদের পক্ষে অনিবার্য স্বাভাবিক। যাদের লালন পালন পোষণ করাই আমাদের একান্ত কর্তব্য সেই নীতির প্রতিতো অবহেলা করতে পারি না। চোখ বুজে বসে থাকাও সম্ভবপর নয়।

আশ্রয় প্রার্থী তথা সাহায্য প্রার্থীর প্রতি অনুকূল নিয়ম দেখানোই রাজপুতদের প্রধান ধর্ম। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই ধর্ম রক্ষার্থে —প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। চিরাচরিত প্রথা, ধর্ম ও নিয়ম ভঙ্গ করা যে কোন স্বাধীন জাতির পক্ষেই অত্যন্ত লজ্জাকর! এটা অতি আনন্দের কথা—যে ইংরেজরা আমাদের বুদ্ধিমান মিত্রপক্ষ! মহারাণী চন্দ্রকুমারী দেবীকে নজরবন্দী করে রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে উপদ্রবকারীদের মূল উৎপাটন করা কখনই সম্ভব নয়, সেই শত্রুর বীজ লুকায়িত থাকেই। তাদের এইরূপ উদ্দেশ্য ভঙ্গ না হলে আমাদের অমূলক শঙ্কার কোন কারণই থাকতে পারে না, উচিতও নয়। আর তাদের কাছে লজ্জিত হবার কোন আবশ্যকতা নেই।

কড়বড়—মহারাণী চন্দ্রকুমারীর এই স্থানে আগমনের হেতু?

রাণা জঙ্গবাহাদুর—এক নির্জন শান্তিপ্রিয় সুখময় স্থানের অন্বেষণে। যেখানে তিনি নিজের দুরবস্থার চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম। রংগমহলে সুখ-বিলাসে-ব্যসনে চিরঅভ্যস্থা এক ঐশ্বর্য্যশালিনী রাণী। আজ পুষ্পশয্যাও তাঁর কাছে কণ্টকময়, কষ্টদায়ক। শত শত বাধা বিপত্তি সত্বেও, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত লঙ্ঘন করে সহস্র সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করে শুধু একটু সুরক্ষিত স্থানের আশায় এখানে আগমন করেছেন। বর্ষাকালের যৌবনোন্মত্ত, স্ফীত নদনদী, খালবিল সম্পর্কে সকলেই সচেতন। সেই সকল বিঘ্ন অনায়াসে হাসিমুখে সহ্য করেছেন এক চিলতে সুরক্ষিত আশ্রয়াভিলাষে কিন্তু আমরা এতই অকিঞ্চন, স্থানহীন যে তাঁর এই ক্ষুদ্র অভিলাষ পূরণেও অসমর্থ। ভূমির বদলে স্বহৃদয়ে স্থান দেওয়াই আমাদের উচিত। আপনারা একটু বিবেচনা করে দেখুন, এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় বিপদে পতিত হয়ে

রাণী নিজের দুঃখের দিনে যে দেশের শরণার্থী, তা অতি পবিত্র স্থান। আমাদের এইরূপ অভয়প্রদ স্থানে মহারাণী চন্দ্রকুমারীকে—শরণাগতদের, আমাদের আশ্রয়ের প্রতি পূর্ণ আশ্বাস, ভরসা সেই বিশ্বাসভরেই মহারাণীজীও আশ্রয় সন্ধানে এতদূর এসেছেন। স্বয়ং পশুপতিনাথ এইরূপ আশায় আশান্বিত আমাকে শান্তি প্রদান করবেন, সেই সর্বশান্তি বিরাজকারীর ইচ্ছায়ই তিনি এস্থানে এসেছেন। তাঁর সেই অভিলাষ পূর্ণ করতে বা ধূলিসাৎ করে দিতে পারেন সে অধিকার আপনাদের আছে। ইচ্ছে করলে, রক্ষাকরণ—শরণাগতের প্রতি সদাচরণ—এই সকল প্রথা, নিয়ম পালন করে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বজাতির নাম সমুজ্জ্বল করুন, অথবা জাতীয়তা তথা সদাচরণ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীকে ভঙ্গ করে তা থেকে নাম মুছে ফেলুন, মসীলেপন করুন। এখানে এমন একজনও নিরভিমান আছেন যিনি শরণাগত পালন ধর্ম বিস্মৃত হয়ে নিজের শির উচ্চ রাখতে সক্ষম একথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। এখন আমি আপনাদের অন্তিম সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষা করছি। বলুন, জাতি, স্বদেশের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল করতে সক্ষম হবেন, অথবা স্বধর্ম, নীতি বিনষ্ট করে মসী লেপন করবেন? অপযশের তিলক ভালে ধারণ করতে প্রস্তুত?

রাজকুমার উল্লসিত হয়ে বল্লেন—আমারা মহারাণীজীর চরণতলে বুক পেতে দেব যাতে একটি কণ্টকও বিদ্ধ না হয়।

কাপ্তেন বিক্রমসিংহ—আমরা রাজপুত, স্বধর্ম পালনে সদাই প্রস্তুত।

জেনারেল বনবীরসিংহ—সমস্ত সংসারকে চমকিত করে দিয়ে তাঁকে আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করব।

রাণা জঙ্গবাহাদুর—আমি বন্ধু কড়বড় ক্ষত্রীর মুখে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা শুনতে ইচ্ছুক।

কড়বড় ক্ষত্রী এক প্রভাবশালী পুরুষ। মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে তিনি রাণা জঙ্গবাহাদুরের বিরুদ্ধ পক্ষের প্রধান। তিনি লজ্জাবিনম্র কণ্ঠে

বল্লেন—মহারাণীর এই আগমন আমার কাছে একেবারে ভয়রহিত নয়, কিন্তু এই দুঃখের দিনে মহারাণীকে আশ্রয় প্রদান করাই আমাদের পরম ধর্ম। ধর্ম বিচ্যুত হওয়া কোন জাতির পক্ষে গৌরবের নয়।

সভাস্থ বহু সদস্য সানন্দে এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

মহারাজ সুরেন্দ্র বিক্রমসিংহ—এই প্রস্তাবকে আমি সানন্দে অভিনন্দিত করছি। আমি আশা করছি তোমরা জাতির মুখ উজ্জ্বল করবে। স্বয়ং পশুপতিনাথ তোমাদের সহায় হোন।

সভা ভঙ্গ হোল। দুর্গ থেকে তোপধ্বনি হতে লাগল। পাঞ্জাবের মহারাণীর শুভাগমনের সংবাদ সমগ্র শহরে ছড়িয়ে পড়ল। জেনারেল রণধীর সিংহ ও জেনারেল সমরধীর সিংহ বাহাদুর ৫০,০০০ সেনায় সুসজ্জিত হয়ে স্বাগত জানাতে চল্লেন।

অতিথি ভবন সুসজ্জিত হোতে লাগল। বাজারও নানা প্রকার উত্তম সামগ্রীতে ভরপুর।

ঐশ্বর্যের প্রতিষ্ঠা ও সম্মান সবস্থানেই পরিলক্ষিত হোতে লাগল, কিন্তু ভিখারিণীর প্রতি এইরূপ আচরণ দেখা যায় কি? বাদ্যে, পতাকায় সুসজ্জিত হয়ে সেনাবাহিনী এক স্ফীত নদীর ন্যায় অগ্রগামী। সারা নগরে আনন্দের হাট বসেছে। পথের দুধারে বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিত দর্শকবৃন্দ অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত। সেনাবাহিনীর কমাণ্ডারেরা ঘোড়সওয়ারী হয়ে আগে চলেছেন। সর্বাগ্রে জাতীয় গৌরবের গর্বে লীন জঙ্গবাহাদুর, সুবর্ণখচিত হাওদায় চেপে অগ্রগামী হচ্ছেন। এ উদারতার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন কুটীরের সামনে রাণা হাতী থেকে অবতরণ করলেন। মহারাণী চন্দ্রকুমারীদেবী সেই কুটীর থেকে বাইরে এলেন। রাণা মস্তক অবনত করে চরণ বন্দনা করলেন। চরম বিপদের সেই পরম বন্ধু বৃদ্ধ সেপাইকে আশ্চর্যান্বিত হয়ে দেখতে লাগলেন। চোখে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। মৃদু হাসলেন। মনে হোল প্রস্ফুটিত ফুল থেকে শিশির বিন্দু ঝরে পড়ছে।

রাণী বল্লেন—বুড়ো ঠাকুর মশাই! তুমিই আমাকে পথ দেখিয়েছ,

আমার জীবন-নাও কূলে এসেছে সে তোমারই অবদান। তোমার প্রশংসার স্তুতি আমি কিরূপে করব?

রাণা শির নত করে বলেন—আপনাদের চরণারবিন্দের জন্য আমার ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন, উদিত।

ছয়

নেপাল সরকার ২৫ হাজার টাকা ব্যয় করে রাণীর জন্য এক উত্তম ভবন নির্মাণ করলেন। আর মাসিক ১০ হাজার টাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন। নেপালের শরণাগতপ্রিয়তা তথা প্রজাপালন তৎপরতার স্মারক হয়ে আজও সেই ভবন বর্তমান। পাঞ্জাবের রাণীকে লোক আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

সেই সোপান, যার সাহায্যে জাতি যশের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছতে সক্ষম।

এরূপ ঘটনার দ্বারাই জাতীয় ইতিহাস সুসমৃদ্ধ হয় ও মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

রাজনৈতিক প্রতিনিধি সরকারকে এই রিপোর্ট পেশ করলেন। সদাই এ আশংকা ছিল, হয়তো ভারত সরকার ও নেপাল রাজ্যের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেবে। কিন্তু রাণা জঙ্গবাহাদুরের প্রতি সরকারের পূর্ণ আস্থা ছিল। মহারাণী চন্দ্রকুমারী দেবীর মনোভাব শত্রুভাবাপন্ন নয় এ আশ্বাস নেপাল রাজসভা সরকারকে জানালেন, তখন ভারত-সরকার যথার্থই সন্তুষ্ট হলেন। এ ঘটনা ভারতীয় ইতিহাসের অন্ধকার রাতে, 'জোনাকির আলো'র মতই রহস্যঘন দীপ্তি প্রকাশ করে।

* *
*

বড় ভাই সাহেব

দাদা

আমার বড় ভাই আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়, কিন্তু মাত্র তিন ক্লাশ উঁচুতে পড়ে। আমি যে রকম বয়স থেকে পড়াশুনা শুরু করেছি সেও সেই রকম বয়স থেকেই করেছিল, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, সে যে-কোন কাজ তাড়াহুড়ো করে সেরে ফেলতে অপছন্দ করে। কোন বিষয়ে ধারণাটিকে সে খুব মজবুত করে ফেলতে চায়, যাতে কিনা ভবিষ্যত-প্রাসাদের ভিত সুদৃঢ় হয়। এক বছরের কাজটা সে দুবছরে করে। কখনো কখনো তিন বছরও লাগিয়ে দেয়। ভিত যদি পোক্ত না হয় তবে বাড়ি কেমন করে মজবুত হবে।

আমি তার চেয়ে ছোট, আমার যখন ন'বছর বয়স, তার তখন চৌদ্দ। আমাকে দেখাশুনা করা আর সতর্ক করে দেবার জন্মসিদ্ধ অধিকার আছে তার। আর আমিও এত শিষ্ট ছিলাম যে তার হুকুমকেই আইন বলে জানতুম।

স্বভাবে সে বড়ই অধ্যয়নশীল ছিল। যখন তখন বইপত্তর খুলে বসে পড়ত। আর প্রায়শঃ মস্তিষ্ককে অবসর দেবার জন্য কখনো খাতায়, কখনো বইয়ের চারপাশে পাখী, কুকুর, বিড়ালের ছবি আঁকতে থাকতো। কখনো কখনো একই নাম, শব্দ বা বাক্য দশ-বিশ বার লিখে চলতো। কখনো একটা বাক্যকে নানারকম ভাবে নকল করতো, কখনো বা এমন এমন শব্দ বানাতো যার না হয় কোন অর্থ না থাকে কোন সামঞ্জস্য। একবার তার খাতায় আমি কী দেখেছিলুম বলি—"স্পেশল, অমীবা, ভাইয়োঁ, ভাইয়োঁ, দর-অসল, ভাই-ভাই, রাধেশ্যাম, শ্রীযুক্ত রাধেশ্যাম, একটা থেকে"—এরপর একটা লোকের চেহারা আঁকা

রয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও আমি এর কোন অর্থ খুঁজে পেলুম না, কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হ'ল না। সে তখন অষ্টম শ্রেণীতে আর আমি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। তার রচনার অর্থোদ্ধারের চেষ্টা আমার পক্ষে ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যায়।

পড়াশুনা আমার একদমই হোত না। একঘণ্টাও বই নিয়ে বসা অসহ্য ছিল। সুযোগ পেলেই হোস্টেল থেকে বেরিয়ে মাঠে চলে যেতাম, কখনো কাঁকর ছুঁড়তাম, কখনো কাগজের প্রজাপতি ওড়াতাম, আর কখনো সঙ্গী পেয়ে গেলে তো কথাই নেই। কখনো পাঁচিল থেকে নীচে লাফ দিতাম, কখনো সদর দরজার মাথায় চড়তাম, তাকে একবার সামনে আর একবার পেছনে দিকে নিয়ে মোটরগাড়ি চড়ার আনন্দ তুলে নিতাম। কিন্তু ঘরে ফিরে বড় ভাই এর রুদ্ররূপ দেখেই প্রাণ শুকিয়ে যেত। তার প্রথম প্রশ্নই হ'ত—"কোথায় ছিলিস?" প্রায়শঃই এমন স্বরে সে প্রশ্ন করতো যে আমাকে চুপ করেই থাকতে হোত। কেন জানি না আমি বলতে পারতাম না যে, "একটু বাইরে খেলতে গিয়েছিলাম।" আমার মৌনতা আমার অপরাধ স্বীকারের প্রমাণ। আর বড় ভাই-এর এমন কোন উপায় ছিল না যে, স্নেহ আর রোষ মিলিয়ে শাসন করেন।

"এইভাবে ইংরেজী পড়লে সারাজীবন ধরেই পড়ে যাবে, কোনদিন কিছুই আয়ত্ত হবে না। ইংরেজী পড়া অত সোজা ব্যাপার নয় যে, যেই চায় পড়ে নেবে, তা হলে তো রাম-শ্যাম-যদু সকলেই ইংরেজীতে বিদ্বান হয়ে যেত। এখানে রাতদিন চোখ নাচিয়ে বেড়াচ্ছিস্, হৈ হুল্লোড় করছিস্, ভেবেছিস্ কি এতেই বিদ্যে হয়ে যাবে। বড় বড় বিদ্বানই শুদ্ধ ইংরেজী লিখতেই পারে না, বলা তো দূরের কথা। আর আমি বলি কি, তুমি কেমন বুদ্ধু হে, আমাকে দেখেও কি একটু শিখতে পারো না। আমি কেমন মেহনত করছি সে তো তুমি নিজের চোখে দেখছোই, আর না যদি দেখে থাকো, সে তোমার দোষ, তোমার বুদ্ধির দোষ। এত যে মেলা তামাশা হোচ্ছে, তুমি কি আমাকে কোন-

দিন যেতে দেখেছো ? রোজই তো ক্রিকেট আর হকি খেলা হচ্ছে, কোনদিন গেছি ? সব সময়ই পড়ছি, এক এক শ্রেণীতে তিন-তিন বছর পড়েছি, তাহলে তুমি কিভাবে আশা কর যে হেসে খেলে তুমি পাস করে যাবে ? আমার তবু দু'তিন বছরে হয়ে যাচ্ছে, আর তুমি দেখছি সারাজীবন এই ক্লাসে পড়ে থাকবে। আর যদি তুমি এই ভাবে সময় নষ্ট করতে চাও, বেশ তবে ঘরে ফিরে যাও আর মজা করে গুলি-ডাণ্ডা খেলো। দাদার কষ্ট করে উপার্জনের অর্থ এভাবে নষ্ট করছো কেন ?"

এ কথা শুনে আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়তো। এর আর কি জবাব আছে। অপরাধ তো আমিই করেছি, কথা কে আর শুনবে ? দাদার উপদেশ দেবার ক্ষমতা দারুণ : এমন এমন হৃদয়ভেদী শব্দ আর তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ ছুঁড়তে লাগল যাতে আমার কলজে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগলো, সব আশা হারিয়ে ফেলতে লাগলুম। এই ভাবে প্রাণপাত পরিশ্রম করার মতো শক্তি নিজের মধ্যে খুঁজে পেলুম না, এবং এত নিরাশ হয়ে পড়লুম যে, চিন্তা করে দেখলুম—আমার ঘরে ফিরে যাওয়াই উচিত। যে কাজ আমার সাধ্যাতীত তার নাগাল পাবার চেষ্টা করে কেন জীবন নষ্ট করবো। এর চেয়ে আমার মূর্খ থাকাই ভাল, বাব্বা : এত পরিশ্রম ! আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক বাদে আমার মনের নিরাকারে কালো মেঘ কেটে গেল। এবং স্থির করলাম আগের চেয়েও অনেক মন দিয়ে পড়বো। চটপট একটা টাইম টেবিল তৈরি করে ফেললাম। প্রথমে নক্সা, তারপর স্কীম তৈরি করলাম কেমনভাবে পড়া শুরু করবো। টাইম টেবিল থেকে খেলাধূলার সময়টুকু উবে গেল। প্রাতঃকালে উঠবো, ছ'টায় মুখ হাত ধুয়ে, জলখাবার খাবো। পড়তে বসবো। ছ'টা থেকে আটটা ইংরেজী, আটটা থেকে ন'টা হিসাব (সংরক্ষণ), ন'টা থেকে সাড়ে ন'টা ইতিহাস, তারপর খেয়ে দেয়ে স্কুল। সাড়ে তিনটায় স্কুল থেকে ফিরে আধ ঘণ্টা বিশ্রাম, চারটে থেকে পাঁচটা

ভূগোল, পাঁচটা থেকে ছ'টা গ্রামার, আধ ঘণ্টা হোস্টেলের সামনে ভ্রমণ, সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটা ইংরেজী কম্পোজিশন, রাতের আহার সেরে আটটা থেকে ন'টা অনুবাদ, ন'টা থেকে দশটা হিন্দী, দশটা থেকে এগারোটা বিভিন্ন বিষয়, তারপর বিশ্রাম।

কিন্তু টাইম টেবিল তৈরি এক কথা আর তা মানা আর এক কথা। প্রথম দিন থেকেই তার প্রতি অবহেলা শুরু হয়ে গেল। ময়দানের সবুজ ঘাস, ফুরফুরে হাওয়া, ফুটবলের দৌড় ঝাঁপ, কবাডির মোড়-দান, সঙ্গী-সাথীদের ফুর্তি, হৈ হুল্লোড় অনিবার্য ভাবে আমার মনকে অজ্ঞাতসারে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, আর সেখানে গিয়েই আমি সবকিছু ভুলে যাচ্ছিলাম। ঐ মৃত্যুপণ টাইম টেবিল, ঐ চক্ষুশূল বইগুলো আর কিছুই মনে রইল না। আর বার বারই দাদার উপদেশ আর আমার দুর্দশাগ্রস্ত ভবিষ্যতের কথা শুনতে লাগলুম। আমি তাকে এড়িয়ে যাবার—তার চোখের আড়ালে থাকবার চেষ্টা করতুম। এমন পা টিপে টিপে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকতাম যেন সে টের না পায়। আমার প্রতি তার নজর পড়লেই ভয়ে আমার প্রাণ কেঁপে উঠতো। আমার মাথার ওপর সব সময়ই যেন একটা উন্মুক্ত তরবারি ঝুলছে। তবু মোহগ্রস্ত মানুষ যেমন বাধা বিপত্তি দেখেও সেই দিকে ছুটে চলে, আমিও সেই মাঠের দিকেই ছুটে যেতুম।

বাৎসরিক পরীক্ষা হয়ে গেল। দাদা ফেল করে গেল, প্রথম হয়ে পরের শ্রেণীতে উঠলাম। আমার আর তার মধ্যে আর মাত্র দুবছরের ফারাক রইল। মনে মনে ঠিক করলুম দাদাকে বেশ এক হাত নেবো—"কি হলো, তোমার ঘোর তপস্যার সেই ফল? আমাকে দেখ, কেমন মজা করে খেলে কাটাচ্ছি, আবার প্রথমও হচ্ছি।" কিন্তু তাকে এত দুখী আর উদাস দেখলাম যে তার জন্য আমারও দুঃখ হতে লাগলো, আর তার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবার কথা চিন্তা করার জন্য নিজেই লজ্জিত বোধ করলাম। তবে হ্যাঁ, এখন আমার নিজের মধ্যে কিছু গর্ব আর আত্মাভিমান দেখা দিল।

আমার ওপর তাই দাদার সেই রোষ আর রইল না। স্বাধীন-ভাবে হেসে খেলে কাটাতে লাগলাম। হৃদয় বলছিল—যদি আবার সে আমাকে উপদেশ দিতে আসে তো সাফ বলে দেব যে, তুমি প্রাণপাত পরিশ্রম করে কি বাহাদুরিই না দেখালে। আমি তো খেলেই প্রথম হয়ে গেলাম। যদিও মুখে এ কথা বলার মত দুঃসাহস আমার ছিল না, তবুও চলনে বলনে এটা তার কাছে স্পষ্ট হলে উঠল যে, তাকে আর আমি ভয় করি না। দাদা এটা সহজেই বুঝে ফেললো, সাধারণ বোধশক্তি তার তীব্র ছিল। তাই একদিন যখন ভোর থেকে ডাংগুলি খেলে ঠিক খাবার সময় ঘরে ফিরলুম তখন দাদা তার বাক্য-বাণ ছুড়ে মারল আমার দিকে—"দেখছো তো, এ বৎসর পাস করে প্রথম হয়ে ক্লাসে উঠেছো বলে তোমার কি রকম অহংকার হয়েছে। বিখ্যাত লোকেদের তো গর্ব থাকে না, তবে তোমার এ অবস্থা কেন? ইতিহাসে রাবণের দশা পড়েছো তো। তার চরিত্র থেকে কি উপদেশ পেলে? পড়েছোতো নাকি? পরীক্ষায় পাস করা কোন একটা ব্যাপারই নয়, আসল জিনিস হল বুদ্ধির বিকাশ। যা কিছু পড়বে তার মর্মার্থ উপলব্ধি করবে। রাবণ ছিল বিরাট ভূস্বামি। এই ধরনের রাজাদের চক্রবর্তী বলা হ'ত পৃথিবীতে। অনেক রাজাই ইংরেজদের আধিপত্য স্বীকার করেনি। বিলকুল স্বাধীন। রাবণ ছিল রাজচক্রবর্তী, বিশ্বসংসারে মহীশ্বর। বড় বড় দেবতা ছিল তার গোলাম। অগ্নি আর জল দেবতা ছিল তার দাস। তবু রাবণের অন্তিম দশা কি হল? অহঙ্কারের ফলে তার সমস্ত সুনাম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

মানুষ যদি কোন কুকর্ম করে ফেলে, তারজন্য গর্ব করে না, অভি-মানী হয় না। অভিমান করলেই জগৎ-সংসার সব অন্ধকার। শয়-তানের কথা পড়েছো তো? তার প্রভাব পড়লে আর তাকে এড়িয়ে কেউ ঈশ্বরের কথা চিন্তা করতে পারে না। শেষে এমন হবে যে স্বর্গ থেকে ধাক্কা দিয়ে নরকে ঠেলে দেবে। রোমের বাদশা একবার

অহংকারী হয়ে উঠেছিলেন। শেষে ভিক্ষে করতে করতে তার জীবন শেষ হল। তুমি এখন কেবল মাত্র একটি শ্রেণী পাস করেছো। এখনই যদি তোমার মাথা ঘুরে যায়, তবে আরও পড়বে কি করে। মনে রেখো নিজের চেষ্টায় তুমি পাস করোনি। হঠাৎ তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্য বার বার আসে না। কখনো কখনো ডাংগুলির মধ্যে দিয়েও সৌভাগ্য আসে। কিন্তু তাতেই কেউ সেরা খেলোয়াড় হয়ে যায় না। সেরা খেলোয়াড় সেই যার একটি মারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।

আমার মতো ফেল করতে হবে না। আমার ক্লাসে ওঠ না একবার, রক্ত জল হয়ে যাবে। আলজেব্রা আর জ্যামিতি নয় তো, লোহা চিবোতে হবে, আর ইংলিস্তানের ইতিহাস পড়তে হবে, বাদশাহদের নামই মনে রাখতে পারবে না। আট আট জন হেনরী আছে। কি কাণ্ড কোন হেনরীর সময়ে যে হয়েছিল তা মনে রাখা খুব সোজা ভেবেছো? সপ্তম হেনরীর বদলে অষ্টম হেনরী লিখলেই গেল। কিছু নম্বর পাবে না। পরিষ্কার। বুঝেছো তো শূন্য। কি কিছু খেয়াল হচ্ছে? ডজন ডজন জেমস্, ডজন ডজন উইলিয়ম, কোটি কোটি চার্লস। মাথা ঘুরতে থাকবে। আঁধি রোগ দেখা দেবে। এই অভাগাদের নামও জোটে নি। একজনের নামের পেছনে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম লাগিয়ে গেছে। আমায় জিজ্ঞাসা করলে তো দশলাখ নাম বলে দেবো।

আর জ্যামিতিতে তো খোদার শরণ নিতে হবে। এ. বি. সি-এর জায়গায় এ. সি বি. লিখেছো তে সব নম্বর গেল। কেউই পরীক্ষককে জিজ্ঞাসা করবেন না যে এ. বি. সি. আর এ. সি বি তে তফাৎ কি আর কেনই বা ব্যর্থ ছাত্রদের খুন করে চলেছেন? ডাল-ভাত-রুটি খাই আর ভাত-ডাল-রুটি খাই তফাত কি রইল? কিন্তু এই পরীক্ষকদের পরোয়া কি? বইতে যা লেখা আছে তাই তারা দেখছেন। তাঁরা চান ছেলেরা অক্ষরে অক্ষরে মুখস্থ রাখুক আর তাদের এই মুখস্থ

বিদ্যার নাম রাখা হল 'শিক্ষা'। আর এভাবে পড়ে লাভই বা কি? এই রেখাটির উপর লম্ব টেনে দাও অমনি আধার দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এর প্রয়োজন কি? দ্বিগুণ হোক, চতুর্গুণ হোক কি অর্ধেক থাক পরীক্ষায় পাস করতে হলে এই সব ফালতু কথাগুলো মনে রাখতে হবে। 'নিয়মানুবর্তিতা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখো: যেন চার পাতার কম না হয়। খাতা খুলে, কলম হাতে করে তাঁর নাম স্মরণ করো: কে না জানে যে নিয়মানুবর্তিতা খুব ভালো কথা, এতে মানব জীবনে সংযম আসে: সকলে তাকে মান্য করে, তার কাজকারবারে উন্নতি হয়। কিন্তু এইসব জানা কথা চারপাতা জুড়ে লিখতে হবে। একবাক্যে যা বলা যায় চারপাতা জুড়ে তা লেখা দারুণ সন্তানের কথা বলে আমি মনে করি। এতে সময়ের মিতব্যয় নয় বরং দুর্ব্যবহার যে ফালতু এত কথা লিখতে হবে। আমি বলি কি কাউকে যা কিছু বলার দরকার চটপট বলে নিজের রাস্তা দেখ: শুধু তাই নয় আমার এই চারপাতার রচনা আপনাকে পড়তে হবে: আর পাতাগুলো তো শুধু ফুলস্কেপ সাইজে: এটা ছাত্রদের ওপর অত্যাচার নয়তো কি? অনর্থটা কি বলো তো সংক্ষেপে লেখা: নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে সংক্ষেপে একটি প্রবন্ধ লেখো যা চার পাতার কম না হয়। সংক্ষেপে যদি চারপাতা হয় তো—আসলে একশো-দুশো পাতা লিখতে হোত। তেজের সাথে দৌড়ও কিন্তু ধীরে ধীরে। এটা কি উলটো কথা হ'ল না? বালকেরা অনেক কথাই বুঝতে পারে, কিন্তু পরীক্ষকদের এই বিজ্ঞতাকে মোটেই নয়। তাদের স্বত্ব কি না তারা অধ্যাপক। আমার ক্লাসে আগে ওঠ মশাই, তখন এইসব পাঁপড় বলতে হবে আর তখন কত ধানে কত চাল বুঝবে। এই ক্লাসে প্রথম হয়েছো বলে যে মাটিতে পা পড়ছে না, তাই এত কথা বলছি। লাখবার ফেল করেছি কিন্তু তোমার চেয়ে আমি বড়, সংসার সম্বন্ধে তোমার চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা বেশী। যা বলছি সেইটে ধ্রুব সত্য মনে করো নইলে পস্তাবে।"

স্কুলের সময় হয়ে গিয়েছিল, না হলে ভগবানই জানতেন কবে এই উপদেশ মালা শেষ হত। খাবার বিস্বাদ লাগল। পাস করে যদি এই তিরস্কার মেলে, তবে ফেল করলে না জানি প্রাণই নিয়ে নিত। দাদা তার ক্লাসের পাঠ্য বিষয়ের যে ভয়াবহ চিত্র মেলে ধরলো তাতে দারুণ ভয় পেয়ে গেলাম। তাজ্জবের ব্যাপার যে স্কুল ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে যাইনি। কিন্তু এত তিরস্কার বই-এর প্রতি আমার অরুচি যেমন ছিল তেমনি রেখে দিল। পড়ছি বটে, কিন্তু বড্ড কম। শুধু ক্লাসের টাস্ক টুকু করি যাতে না লজ্জিত হতে হয়। নিজের ওপর যে বিশ্বাস জন্মেছিল তা মুছে গেল। আবার চোরের মত জীবন কাটাতে লাগলুম।

আবার বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে গেল, আর আমি আবার পাস করে গেলাম, দাদা ফেল করে গেল। আমি খুব বেশী পরিশ্রম করিনি কিন্তু জানি না কেমন করে প্রথম হয়ে গেলাম। খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দাদা প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিল। দশটা থেকে সারারাত, ভোর চারটে থেকে, আবার স্কুল যাবার আগে ছ'টা থেকে ন'টা পর্যন্ত। মুখ চোখ কান্তিহীন হয়ে পড়েছে তবু বেচারী ফেল করে গেল। তার ওপর আমার বড় দয়া হ'ল। ফল শুনে সে যখন কাঁদছিল আমিও কেঁদে ফেললাম। নিজের পাস করার আনন্দ অর্ধেক হয়ে গেল। আমি ফেল করলে হয়তো তার এত দুঃখ হ'ত না কিন্তু বিধির বিধান কে পালটায়।

আমার আর দাদার মধ্যে আর মাত্র একটি ক্লাসের তফাত রইল। আমার মনে আবার কুটিল চিন্তা দেখা দিল যে, পরের বছরও যদি দাদা ফেল করে, তা হলে আমরা দুজনে এক ক্লাসে পড়ব, তাহলে কিকরে দাদা আমাকে উপদেশ দিতে আসবে। কিন্তু মন থেকে জোর করে সেই সব নীচ চিন্তা দূর করে ফেল্লাম। সে তো আমার উন্নতির জন্যেই উপদেশ দেয়। কিন্তু সবচেয়ে অপ্রিয় লাগে তার উপদেশ বলেই যেন আমি চটপট পরীক্ষায় এত ভালো নম্বর পেয়ে পাস করে যাচ্ছি।

এখন দাদা একটু নরম হয়ে পড়েছে। বেশ কয়েকবার আমাকে তিরস্কারের সুযোগ পেয়েও সে ধৈর্য ধরেছে। হয়তো সে অনুমান করেছে যে আমাকে তিরস্কারের অধিকার তার নেই, থাকলে তা কমে গেছে। তার এই সহিষ্ণুতায় আমি সচ্ছন্দ ভাবে কাজকর্ম করে যেতে লাগলুম। পড়ি কি না পড়ি, আমার বুদ্ধির বেশ জোর আছে। এই ধারণাই আমার হয়ে গেল, আর তারফলে দাদার ভয়ে যেটুকুও পড়াশুনা করছিলাম তাও বন্ধ হয়ে গেল। এখন সারা সময় ঘুড়ি উড়িয়েই কাটানো যাচ্ছে। তবুও আমি দাদার চোখ বাঁচিয়ে চলতে লাগলাম।

ঘুড়ির টুর্নামেন্ট সবকিছু চুপিসারে চলতে লাগলো। আমি দাদার মধ্যে এই সন্দেহ জাগাতে চাইলাম না, যে তার প্রতি আমার ভয়-ভক্তি কমে গেছে।

একদিন সন্ধ্যায় হোস্টেলের কিছু দূর দিয়ে একটা কাটা ঘুড়ি বেশ জোরে উড়ে যাচ্ছিল। চোখ দুটো আকাশেই ছিল, আর মন ছিল ঘুড়ির দিকেই, সেটা ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে আসছে, মনে হচ্ছে যেন কোন আত্মা স্বর্গ থেকে বেরিয়ে বিরক্ত মনে নবসংস্কার গ্রহণ করতে নীচে নেমে আসছে। এক দঙ্গল ছেলে লগা আর ঝাঁকড়া বাঁশ নিয়ে তাকে স্বাগত জানাতে দৌড়চ্ছে। কারুরই সামনে পেছনে নজর ছিল না, সকলেই যেন ঘুড়ির সাথে সাথে আকাশে উড়ছিল। যেখানে সবকিছু সমতল, কোন ট্রাম, মোটর গাড়ির বালাই নেই।

হঠাৎ আমি দাদার মুখোমুখি হয়ে পড়লাম, সে তখনই বাজার থেকে ফিরছিল আমার হাত চেপে ধরে উগ্র কণ্ঠে সে বলে উঠল—"এই বাজারের ছেলেগুলোর সাথে সামান্য ঘুড়ির জন্য দৌড়াতে তোমার লজ্জা করে না? তোমার কি এই ধারণাও হয়নি যে আজ আর তুমি নিচু ক্লাসে পড়না বরং অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছ, আমার চেয়ে মাত্র এক ক্লাস নীচে। মানুষের তো নিজের পজিশন সম্বন্ধে খেয়াল রাখা উচিত। একটা সময় ছিল যখন লোকে অষ্টম শ্রেণী পাস করলেই নায়েব কিংবা

তহসিলদার হয়ে যেত। আমি এমন কিছু লোককে জানি যারা সপ্তম শ্রেণী পাস করেই প্রথম শ্রেণীর জেলাশাসক বা সুপারিন্টেডেন্ট হয়েছে। আজকে যারা আমাদের নেতা কিংবা সমাচার পত্রের সম্পাদক তারা অনেকেই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে। বড় বড় বিদ্বান ব্যক্তিও তাদের কথামত কাজ করে, আর তুমি আজ অষ্টম শ্রেণীতে পড়েও বাজারের ওই ছোক্‌রাগুলোর সাথে ঘুড়ির পেছনে দৌড়াচ্ছ। তোমার এই মূর্খতা দেখে ভীষণ দুঃখ হচ্ছে। তুমি বুদ্ধিমান হও, কোন দুঃখ নেই, কিন্তু এটা কি ধরনের বুদ্ধির পরিচয় যা আমাদের আত্মগৌরবের হত্যাকারী। আজ তুমি মনে করছো যে তুমি আমার চেয়ে তো আর এক্লাস নীচে পড়ছো এখন আর দাদার কথা শোনার দরকার কি। কিন্তু আমি তোমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। আজ তুমি আমার ক্লাসে পড়না কেন, কিংবা, এই যদি পরীক্ষা রীতি হয়, পরের বছর তুমি আমার চেয়ে এক শ্রেণী উঁচুতেই পড়বে—কিন্তু আমাতে তোমাতে যে পাঁচ বছরের তফাত রয়েছে, তা তুমি কেন স্বয়ং ভগবানও দূর করতে পারবেন না। তোমার চেয়ে আমি পাঁচ বছরের বড় আর চিরকাল তাই থাকবো। দুনিয়া আর জীবন সম্পর্কে আমার যতখানি অভিজ্ঞতা তোমার তা কোন দিনই হবে না, তা তুমি এম, এ, ডি লিট. কি ডি ফিল. যাই হও না কেন। বই পড়ে অনুভব জন্মায় না, জগৎকে দেখতে হয়। আমাদের মা একটি ক্লাসও পড়েনি, দাদা পঞ্চম শ্রেণী কি ষষ্ঠ পর্যন্ত পড়েছেন, কিন্তু আমরা যত শিক্ষিতই হই না কেন আমাদের শাসন করবার অধিকার তাঁদের চিরকাল থাকবে। কেবল এই নয় যে তাঁরা আমাদের জন্মদাতা, তাঁরা জগৎ সম্পর্কে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী অভিজ্ঞ এবং তাই চিরস্থায়ী থাকবেন। আমেরিকাতে কি ধরনের শাসন ব্যবস্থা চলছে, অষ্টম হেনরী ক'টি বিবাহ করেছিলেন, কিংবা আকাশে কয়টি নক্ষত্র আছে এসব তাঁর অজানা থাকতে পারে, কিন্তু এমন হাজার কথা তাঁর জানা আছে যা তোমার আমার চেয়ে অনেক বেশী।

বিশেষ কিছু নয়; আজ যদি হঠাৎ আমার অসুখ করে, তোমার

তো হাত পা অবশ হয়ে যাবে। দাদাকে টেলিগ্রাম করা ছাড়া আর কিছু তোমার মাথায় আসবে না। কিন্তু তোমার জায়গায় দাদা থাকলে কি করতো বলতো ? না-ঘাবড়িয়ে প্রথমে সেবা করতো, তাতে সফল না হলে ডাক্তার ডাকাতো। অসুখ তো একটা সাধারণ ব্যাপার হলো। আমি তুমি তো চিন্তাই করতে পারি না তাঁর মাসিক উপার্জনে সারা মাসটি কিভাবে চলে। দাদা যা কিছু পাঠায় তাতে বিশ-বাইশ দিন পর্যন্ত চলে আর তারপর থেকেই পয়সা পয়সা করে চেঁচাই। খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। ধোপা আর নাপিতের কাছ থেকে মুখ শুনতে হবে। আজ তুমি আর আমি মিলে যে টাকা খরচ করছি তার অর্ধেক অর্থে দাদা তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় সম্মান ও গৌরবের সাথে অতিবাহিত করেছেন এবং নয়জনের পরিবার প্রতি-পালন করেছেন। আমাদের প্রধান শিক্ষককে দেখো। এম. এ. তাও এখানকার নন, অক্সফোর্ডের এম. এ.। এক হাজার টাকা মাসিক আয়। কিন্তু সংসারী ব্যবস্থাপনা করেন কে ? তাঁর বুড়ি মা। এখানে প্রধান শিক্ষকের ডিগ্রী নিষ্ফল! প্রথমে নিজেই বন্দোবস্ত করতেন। খরচে কুলোতো না ঋণ করতে হোত। যখন থেকে মা সংসারের দায়িত্ব নিলেন তখন থেকে ঘরে যেন লক্ষ্মী এল। তাহলে ভাই, তুমি-ই ভেবে দেখো যে তুমি আমার এখানে এসেছো এবং এখন স্বাধীন হয়েছো। আমার সামনে তুমি বিপথে যেতে পারবে না। আর যদি আমার কথা না শোনো তো (থাপ্পড় দেখিয়ে) আমি তোমাকে মজা দেখাবো। জানি আমার কথাগুলো তোমার কাছে বিষের মত লাগছে।"

তার এই নতুন যুক্তিতে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। আজই নিজের নীচ মনোভাবের প্রতি আমার নতুন করে উপলব্ধি হল এবং দাদার প্রতি মনে শ্রদ্ধা জাগল। আমি সজল চোখে বললাম "কদাপি নয়। আপনার হুকুমগুলো সবই খাঁটি আর আপনার হুকুম করার অধিকার অবশ্যই আছে।"

দাদা আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো—"আমি ঘুড়ি ওড়াতে নিষেধ করি না। আমারও ইচ্ছে করে, কিন্তু কি করবো, নিজেই যদি বিপথে চলি তো তোমাকে কি ভাবে রক্ষা করবো। এটা তো আমারই কর্তব্য।"

এই সময় মাথার ওপর দিয়ে একটা ঘুড়ি উড়ে যাচ্ছিল। তার সুতো হাওয়ায় ঝুলছিল। এক দঙ্গল ছেলে ঘুড়ির পেছনে দৌড়ে আসছিল। দাদা ছিল সবার লম্বা। লাফিয়ে উঠে সুতোটা চেপে ধরে হোস্টেলের দিকে দৌড় দিল। আমিও তাঁর পেছনে পেছনে দৌড়তে লাগলাম।

বুঢ়ী কাকী

বুড়ী কাকী

বৃদ্ধ বয়সে প্রায় সকলেরই যেন শৈশবকালের আগমন ঘটে। জীবনের শেষ বয়সে জিভের লোলুপতা ছাড়া বুড়ী কাকীর অন্য কাজ ছিল না, নিজের দুঃখ কষ্টের কথা পাড়া-পড়শীকে জানানোর একমাত্র মোক্ষম অস্ত্র ছিল কান্নাকাটি। উপায় কি, দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়, চোখ, কান, হাত, পা অবসর গ্রহণ করেছে। রাতদিন মাটিতেই পড়ে থাকত। আর বাড়ির কেউ তার মতের বিরুদ্ধে গেলে কিম্বা খাবার সময় উৎরে গেলে অথবা বাজার থেকে ভালমন্দ খাবার এলে ওর কপালে না জুটলে—কেঁদে ভাসানো ছাড়া উপায়টাই বা কী। আর তার কান্নাকাটিও খুব মামুলি ধরনের নাকে কান্না নয়। রীতি-মত কপাল চাপড়ে গলা ফাটিয়ে পাড়া-জাগানো কান্না।

তার স্বামীদেবতাও অনেককাল আগেই গত হয়েছে। ভরা বয়সের ছেলেটাও হঠাৎ মরে গেল। এখন এক ভাসুরপো ছাড়া তার কেউ নেই। সেই ভাসুরপোর নামেই সব সম্পত্তি লিখে দিয়েছে। সম্পত্তি লেখানোর সময় সে অনেক প্রতিজ্ঞা করেছিল। অবশ্য ও ধরনের অনেক বড় বড় আশা আড়কাটির দালালরাও কুলিদের দিয়ে থাকে। অবশ্য সবই স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। আজ পর্যন্ত সেই সম্পত্তি থেকে বছরে কম করেও দেড় দুশো টাকা আয় হয়, তা সত্বেও বুড়ীর ভরপেট খাওয়াও দুষ্কর। এই অবহেলার জন্য বুড়ীর ভাসুরপো পণ্ডিত বুদ্ধিরামই দায়ী না তার গিন্নী শ্রীমতী রূপার দোষ তা নিরূপণ করা সহজসাধ্য নয়। অবশ্য বুদ্ধিরাম মানুষ হিসাবে চলনসই তবে লেজে পা পড়লে ছেড়ে কথা কইবার পাত্র নয়, শ্রীমতী রূপারাণীর

মেজাজ তীক্ষ্ণ হলেও ধর্মভীরু। সুতরাং রূপার কাটখোট্টা মেজাজের চাইতে ভাসুরপোর ভালমানুষিপনা অনেক বেশী পীড়াদায়ক।

এই রকম অত্যাচারের জন্য মাঝে মধ্যেই বুদ্ধিরাম অনুশোচনা করত। চিন্তা করত—বেচারীর এই সম্পত্তির দৌলতেই আমি গণ্য-মান্য হয়েছি। মৌখিক সৌজন্যতা প্রকাশ করা, স্তোক দেওয়া কিংবা মন ভুলানো এসবে তার আপত্তি ছিল না, কিন্তু পয়সা খরচ হবার ভয়ে তার সমস্ত শুভ প্রচেষ্টাই মাঠে মারা যেত। এমনি কি ঘরে কোন অভ্যাগত এলে বুড়ী তার সামনেই তার রাগ-রাগিণীর আলাপ জুড়ে আলাপ শুরু করে দিত, বুদ্ধিরামের তখন বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পেয়ে যেত। রাগে বুড়ীকে বেশ করে ধমকে দিত। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের উপর এক প্রকার জাত-আক্রোশ ছেলেবেলায় সকলেরই থাকে। তার উপর আবার বাপ মায়ের এরূপ কাণ্ডকারখানা দেখে অধিক প্রশ্রয়ের প্রভাবে বুড়ীকে জ্বালিয়ে মারে। কেউ চিমটি কেটে পালায় কেউ কুলকুচি জল বুড়ীর গায় ছিটিয়ে দেয়। বুড়ী চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, কিন্তু সকলে ভাবে বুড়ী কেবল খাবার জন্যই কেঁদে মরে।

সুতরাং তার এই প্রকার বিলাপ অরণ্যে রোদনেরই সামিল। তবে হ্যাঁ বুড়ী রেগে গিয়ে যখন কখনো সখনো বাচ্চাগুলিকে গালা-গাল দিতে থাকে, তখন অবশ্য গৃহকর্ত্রী রূপাদেবী ঘটনাস্থলে হাজির হয়। সেই ভয়েই বুড়ী তার জিভের রাশ খুব একটা আলগা হতে দেয় না—যদিও উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত কান্নার চাইতে ছিল এটাই সার্থক উপায়।

গোটা পরিবারের মধ্যে কেবল মাত্র একটি প্রাণীরই বুড়ীর উপর আন্তরিক ভালবাসা ছিল, সে হচ্ছে বুদ্ধিরামের ছোট মেয়ে লাড়লী। দুই ভাইয়ের ভয়ে লাড়লী নিজের ভাগের মিষ্টি, চানাচুর, ভাজাভুজি কাকীর ঘরে বসেই খেত। এটাই তার একমাত্র নিরাপদ স্থান। যদিও বুড়ীর লোলুপ দৃষ্টির কোপে পড়ে ভাগের কিছু দিতে হোত,

তাহলেও তা ভাইগুলোর মত অন্যায় জুলুম নয়। তাই নিজেদের আত্মরক্ষা ও স্বার্থরক্ষার অনুকূলে উভয়ের মধ্যে একটা নির্ভেজাল সহানুভূতি ও প্রেমের সঞ্চার হয়েছিল।

রাত্রিবেলা বুদ্ধিরামের বাড়িতে উৎসবের শানাই বাজছে। গ্রামের ছেলের দল অবাক হয়ে গান শুনছে। অতিথি অভ্যাগতরা খাটিয়ায় শুয়ে বিশ্রাম করছে, নাপিতরা দলাই মালাই করে দিচ্ছে। তাদের কাছে দাঁড়িয়ে ভাটেরা পদাবলী শোনাচ্ছে। সমঝদার অতিথিদের 'বাঃ বাঃ' শুনে ভাট খুশীতে ডগমগ, মনে হচ্ছে এই তারিফের প্রকৃত অধিকারী সেই। দু-একজন ইংরেজী পড়া যুবক রয়েছে, তারা এই ব্যাপারে একদম উদাসীন। এইরূপ গেঁয়ো কাণ্ডকারখানার মধ্যে থাকা বা কোন প্রকার কথা বলা তাদের প্রেস্‌টিজের প্রতিকূল বলেই মনে করে।

আজ বুদ্ধিরামের বড় ছেলে সুখরামের তিলক উৎসব। অন্দরে মেয়েরা গান গাইছে। অন্যদিকে রূপা অতিথি অভ্যাগতদের জন্য রান্নায় ব্যস্ত। ভিয়েন বসেছে। একটাতে পুরি-কচুরি ভাজা হচ্ছে। অপরটিতে মেঠাই তৈরী হচ্ছে; কোথাও এক পেল্লাই হাঁড়িতে মশলাদার তরকারি রান্না হচ্ছে। ঘি-মশলার আণে চতুর্দিক ম' ম' করছে। এতে সকলেরই ক্ষিদে বর্ধিত হচ্ছে।

বুড়ী কাকী শোক-তাপের জ্বালায় নিঃসঙ্গ হয়ে তার কুঠরির এক কোণে পড়ে আছে। রান্নার সুস্বাদু সুবাস তাকে উতলা করে দিচ্ছে। মনে মনে ভাবছে, পুরি-কচুরি কি আর ওরা আমায় দেবে? এতখানি রাত হোল, কই কেউ তো খাবার নিয়ে এলো না! মনে হচ্ছে সকলেরই খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেছে। আমার জন্য কিছু পড়ে নেই হয়তো। একথা চিন্তা করেই বুড়ীর কান্না পেল। কিন্তু অকল্যাণের ভয়ে কাঁদতে পারছে না।

"ইস! কী দারুণ গন্ধ। আর আমার কথা কেই বা মনে রাখে। শুকনো রুটি তাই সময় মত পাতে পড়ে না। তাতে আবার লুচি

পুরি জুটবে সে ভাগ্য কি আমার !" এই কথা ভেবেই বুড়ীর কান্নায় বুক ফেটে যায়। মনে হয় কলজেটা বুঝি ফেটে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু রূপার ভয়ে মুখ বুজে পড়ে থাকে।

বুড়ী কাকী অনেকক্ষণ ধরে তার ভাগ্যের বিড়ম্বনার কথা চুপ করে বসে ভাবে। আর ওদিকে ঘি মশলার, রসের লোভনীয় গন্ধ মনকে আর স্থির থাকতে দেয় না। থেকে থেকে জিভে জল আসে। লুচি-পুরির আস্বাদ মনে এলেই অন্তরে কেমন সুখের সুড়সুড়ি অনুভূত হয়। কাকে ডাকা যায়। লাড়লীরও আজ পাত্তা নেই। ছোকরা ছুটো রোজ জ্বালিয়ে মারে, আজ তাদেরও টিকির দর্শন মিলছে না। সব গেল কোন চুলোয়? মনে হচ্ছে বাড়িতে একটা কিছু হচ্ছে।

বুড়ীর কল্পনায় পুরির ছবি নাচতে লাগলো। লাল লাল, নরম ফুলকো। রূপা দেখছি ভালই আয়োজন করেছে। কচুরির ময়দায় জোয়ান আর এলাচের ময়ান পড়েছে। নিদেন পক্ষে একখানা পেলেও হাতে নিয়ে সুখ করতাম। একবার গিয়ে দেখব নাকি। সামনে বসে দেখা—তার মজাই আলাদা। ছ্যাক ছোঁক করে ভাজা হচ্ছে। ফুল-দানির ফুল আমরা ঘরে বসেই দেখি, কিন্তু সাজানো বাগানের ফুল, তার তুলনা মেলা ভার। দুয়ের মধ্যে ফারাক কত?

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে বুড়ী উবু হয়ে বসে হাতে ভর দিয়ে অতি কষ্টে চৌকাঠ পেরিয়ে ধীরে ধীরে হামাগুড়ির মত করে এগিয়ে ভিয়েনের কড়াইয়ের পাশে গিয়ে বসল। ক্ষুধার্ত কুকুর যেমন মানুষের খাওয়ার সময় মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বুড়ী ঠিক তেমনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে।

রূপার আজ কাজের অন্ত নেই। কখনো এঘর থেকে সে ঘরে যাচ্ছে, রান্নার কাছে যাচ্ছে কখনও আবার ভাঁড়ার সামালাতে ব্যস্ত। কেউ হয়তো এসে বলছে—'মহারাজ ঠাণ্ডাই চাইছে' তাকে তক্ষুনি ঠাণ্ডাই বার করে দিচ্ছে। এরি মধ্যে একজন এসে বলছে—'ভাট

এসে দাঁড়িয়ে আছে'—তাটকে সিধে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আর একজন এসে হাজির, কি না—'রান্নার তো এখনও ঢের দেরি, ঢোল, মন্দিরাটা দাও না একটু বাজাই।' বেচারী একলা মেয়ে মানুষ হয়েও একহাতে সব কিছুই তদারক করছে, হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। এই অস্থিরতায় উত্তপ্ত হয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। রাগ করবে কখন মরবার ফুরসতও নেই। রাগারাগি করাটাও শোভনীয় নয়। পড়শীরা ভাববে বাড়িতে কাজ হচ্ছে তাতে একটু গায় গতরে খাটতে হচ্ছে কিনা তাই রেগেই আগুন। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, গরমে অস্থির—তা একটু অবসর পাচ্ছে না যে একটু জল গলায় ঢালবে বা পাখাটা নিয়ে বসবে। আবার এ ভয়ও আছে, চোখের আড়াল হলেই জিনিসপত্র নয়-ছয় হয়ে যায়। এ অবস্থায় নজরে পড়ল বুড়ী খুড়-শাশুড়ি ভিয়েনের কড়াইয়ের পাশে এসে বসেছে। রাগে গা জ্বলতে লাগল। লাগবারই কথা। একটু আক্কেল-বিবেচনা বলে কিছু নেই। পাড়া-পড়শীতে বাড়ি ভরে গেছে। কি ভাববেই বা তারা। নিন্দে করলে করবেটা কার শুনি? ব্যাঙের কেঁচো ধরার মত করে রূপা বুড়ীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুহাতে ঝাকুনি দিয়ে বলে—পেটে আগুন লেগে গেছে না কি। উঃ বাপরে বাপ, পেট না রাবণের চিতা? কতবার বলেছি ঘর ছেড়ে বেরোবে না। ঘরে দম বন্ধ হয়ে মরছ না কি? এখনও অতিথি অভ্যাগতদের খাওয়া হলো না, ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হয় নি। এরই মধ্যে তোমার পেট জ্বলছে, জিভ দিয়ে লাল ঝরছে। অমন জিভ আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে হয়। সারাদিন না খেতে পেলে না জানি কার হাঁড়িতে গিয়ে মুখ দেবে। পাড়ার লোক দেখলে বলবে যে না খেতে পেয়েই বুড়োটা এমন খাবার জন্য ছোঁক ছোঁক করে। ডাইনি মরেও না, মাচাও ছাড়ে না। গুষ্টির নাম ডোবাবে, পাড়াসুদ্ধ লোকের সামনে নাক কান কাটবে, তবে চিতায় উঠবে। দিন রাত যে গেলো, যায় কোথায় সব। শোন ভাল চাও তো চুপ করে ঘরে বসে থাকো। বাড়ির সবাই যখন খেতে বসবে, তুমি পাবে তখন।

তুমি এমন কিছু ঠাকরুণ নও যে কেউ মুখে জল দিক আর না দিক তোমার পুজো আগে সারতে হবে।

বুড়ীর মুখে কোন রা নেই, কাঁদলও না একটু। ঘাড় হেঁট করেই রইল। চুপচাপ হামা টেনে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। আঘাত কঠোর এবং এমন রুক্ষ ধরনের ছিল যে সেই কর্কশ ভাষণের চুম্বক শক্তি বুড়ীর সমগ্র প্রতিরোধ শক্তি নিমেষেই গ্রাস করে ফেললো। নদীতে ধস নামলে, তীরের বড়ো পাথরের চাই যখন ঝপাং করে জলে পড়ে তখন সব জল সেই জায়গায় দৌড়ায়। বুড়ীর সারা মগজ জুড়ে এখন বউ এর বকুনির শব্দ।

খাবার তৈরী। পরিবেশনের প্রস্তুতির পর্ব চলছে। সারা উঠোনে পাতা পড়েছে। অতিথি অভ্যাগতরা খেতে বসে পড়লেন মেয়েরা সব 'জেওনার গীত' গাইতে শুরু করে দিয়েছে। মেহমানদের সাথে যে সব নাপিত-কাহার চাকর বাকর এসেছিল তারাও বসেছে—একটু দূরে। কিন্তু একই পঙ্‌ক্তি। কাজেই আগে উঠতে পারবে না। এটাই শিষ্টাচার। অতিথিদের মধ্যে যারা একটু শিক্ষিত তারা লোকজনদের বিলম্বে ভোজন নিয়ে একটু বিরূপতা প্রকাশ করছেন, 'একসঙ্গে উঠব' বলে এই যে অহেতুক অপেক্ষা করার সাবেক প্রথার কোন মাথামুণ্ডু খুঁজে পাচ্ছে না।

ঘরে ঢুকে কাকী বুড়ীর মন ঘেন্নায় ভরে গেল। ভাবতে লাগল— ছিঃ ছিঃ আমি কোথা থেকে কোথায় নেমেছি। রূপার উপর একটুও রাগ হোল না। নিজের অধৈর্যের কথা চিন্তা করে লজ্জিত হোল। সত্যিই তো অতিথি অভ্যাগতদের এখনও খাওয়া হয় নি। বাড়ির লোক খায় কি করে। আমার এতটকুও তর সইল না। লোক হাসাতে গেলুম। কি ঘেন্নার কথা? আর নড়ছি না। কেউ ডাকতে না এলে আর যাব না।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বুড়ী বসে রইল। কখন তার ডাক আসবে, তারই ভেতরে ভেতরে প্রতীক্ষায় আকুল হয়ে উঠছে। বিয়ের

সুস্বাদু গন্ধে মন আর বাগ মানে না। যতই মনকে বোঝায় ততই অধীর হয়ে ওঠে। প্রতি মুহূর্ত যেন এক যুগের মত দীর্ঘ হয়ে যায়। এতক্ষণে নিশ্চয়ই পাত পড়ে গেছে। কুটুম্বরা সব এসে গেছে। নাপিত সকলকে হাত-পা ধোবার জল দিচ্ছে। এবার মনে হয় সকলে খেতে বসেছে। "জেওনার" গান শুরু হয়ে গেছে। ভাবতে ভাবতে বুড়ো মনকে ভোলানের জন্য একটু শুয়ে পড়ে, গুনগুন করে গান গাইতে থাকে। আবার ভাবে, গাইতে গাইতে বুঝি দেরী হয়ে যাচ্ছে। কই কারো সাড়া পাচ্চি না তো। এতক্ষণ কি আর কারো খেতে লাগে। তাহলে বোধ হয় সবার খাওয়া হয়ে গেছে। কই কেউ তো ডাকতে এল না। কে জানে ডাকবে কিনা। রূপা রেগে আছে। হয়তো ভাবছে ডাকতে হবে কেন, কুটুম নাকি, ঘরের লোক, খিদে পেলে নিজেই আসবে। বুড়ী যাবার জন্য উঠে বসে। মনে মনে কল্পনা করে—আর কি এক মিনিটের মধ্যেই লুচি পুরি, মশলাদার তরকারি পাতে পড়বে। জিভে জল ভরে আসে। মনে মনে নানান ভাবে আস্বাদ নেয়—আগে তরকারি দিয়ে পুরি খাব, তারপর দই মিষ্টি দিয়ে। রায়তার সঙ্গে কচুরিটা জমবে ভাল। যে যাই বলুক আমি কিন্তু বাপু চেয়ে চেয়ে খাব। লোকে বলবে বুড়ী বুদ্ধি বিবেচনার মাথা খেয়েছেন। জিভ সামলাতে পারে না—তাই বললেই বা কি—অ্যাদ্দিন বাদে লুচি জুটেছে, মুখে ঠেকিয়েই কি উঠে আসব নাকি!

উবু হয়ে হাতের তেলোয় ভর করে থপথপ করে উঠে চলে আসে। হায় ভগবান! পোড়া লোভ আবার চাঙা হয়ে উঠল। অতিথিদের খাওয়া হয়নি, এক-আধ জনের হয়েছে। তারা কেউ আঙুল চাটছে, কেউ বাঁকা চোখে অন্যের পাত খালি হয়েছে কিনা দেখছে, কেউ ভাবছে পাতার ছুটো কচুরিকে কি করে ভেতরে চালান দেওয়া যায়। দই খেয়ে জিভ দিয়ে চক্ চক্ শব্দ করছে—আর একবার চাইতে নোনামোনা করছে—ঠিক এমনি সময় বুড়ী কাকী উঠোনে গিয়ে হাজির। একেবারে কজনের মাঝখানে। তারা চমকে পাত ছেড়ে

উঠে দাঁড়ায়। সোরগোল করে ওঠে—আরে বাবা, এ বুড়োটা কেরে। এলো কোত্থেকে। দেখো কাউকে না ছুঁয়ে দেয়।

কাকীকে দেখে বুদ্ধিরামের মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। পুরির থালা নিয়ে পরিবেশন করতে যাচ্ছিল। থালাখানা সেইখানে রেখে দিয়ে রক্তখেকো মহাজন তার গা-ঢাকা জোচ্চর খাতক দেখলে যেমন ক্যাঁক করে টুঁটি টিপে ধরে হুবহু তেমনি করে লাফ দিয়ে এসে সে বুড়ী কাকীর দুই হাত ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে গিয়ে অন্ধকার ঘরের ভেতর আছাড় মেরে ফেলে দেয়। বুড়ীর আশায়-সাজানো বাগান ঝড়ে তছনছ হয়ে গেল।

অতিথিদের খাওয়া দাওয়া শেষ হলো, তারাও একে একে বিদায় নিল। বাড়ির সকলের খাওয়ার পর্ব সমাপ্ত হোল, বাজনাদার, ধোপা, মুচিদের খাওয়া শেষ। কিন্তু হতভাগ্য বুড়ীকে কেউ ডাকতে এলো না। বুদ্ধিরাম এবং রূপা দুজনেই স্থির করেছিল যে বুড়ীর নির্লজ্জতার শাস্তি হওয়া দরকার। তার বৃদ্ধ বয়সে অথর্বদশা এবং বুদ্ধিভ্রষ্টতার কথা চিন্তা করে মনে কোন অনুকম্পা জাগল না। ছোট্ট মেয়ে লাড়লীর বুকের মধ্যে বুড়ীর জন্য মুচড়ে একটা অব্যক্ত ব্যথা হতে লাগল।

বেচারী লাড়লীর বুড়ীর ওপর একটা আন্তরিক টান ছিল। ওর মনটা ভারি নরম। বালিকাসুলভ কোন চপলতার চিহ্ন তার মধ্যে ছিল না। আজ এই আনন্দের দিনে তার বাবা মা দু' দুবার যেভাবে বুড়ীকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেলো তাতে তার কচি মনে বড্ড লেগেছে। এই নির্দয়তার জন্ত মা-বাবার প্রতি মনটা অত্যন্ত বিরূপ ছিল। কি হোত কটা পুরি কাকীকে দিলে? নেমন্তন্নের লোকেরা কি সবগুলোই খাবে। আর তাদের আগে বুড়ী মানুষকে দুটো দিলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত। ভেবেছিল কাকীর কাছে গিয়ে একটু আদর করবে প্রবোধ দেবে কিন্তু মায়ের ভয়ে তা পারে নি। সে তার ভাগের পুরি সবকটা না খেয়ে পুতুলের বাক্সে রেখে দিল কাকীকে দেবে বলে। মনে মনে সে অধীর হয়ে ওঠে। বুড়ী

কাকীকে আমি ডাকলেই উঠে বসবে। তারপর পুরি দেখে বুড়ীর কি আনন্দই না হবে। আমায় কত আদর করবে।

রাত এগারটা। রূপা উঠানে শুয়েই ঘুমিয়ে আছে। লাড়লীর চোখে ঘুম নেই। কাকীকে পুরি খাওয়াবে সে আনন্দেই পুতুলের বাক্স নিয়ে শুয়ে আছে। মা নিঃসন্দেহে ঘুমিয়ে আছে তাই সে নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। উঠে তো পড়ল। এবার চিন্তা যাবে কি করে? সারা বাড়ি অন্ধকার। কেবল উনুন গুলোতে একটু আংরা পড়ে রয়েছে, তারই একটু মিটমিটে আলো দেখা যাচ্ছে। উনুনের পাশে একটা কুকুর শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। উঠোনের ওপাশে নিম গাছের দিকে লাড়লীর চোখে পড়ল। মনে হোল গাছের উপর হনুমানজী বসে আছেন। সেই লেজ, গদা পষ্ট দেখতে পাচ্ছে; ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেলে। এর মধ্যে কুকুরটা জেগে উঠে ঘেউ ঘেউ করে। লাড়লী সাহস পায়। কয়েকটা ঘুমন্ত মানুষের বদলে একটা জাগা কুকুর ওর কাছে অনেক বেশী ভরসার স্থল। পুতুলের বাক্সটা নিয়ে সে বুড়ী কাকীর ঘরের দিকে যায়।

বুড়ী অনেকক্ষণ ধরে ঘরের মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে শুয়ে ছিল। ধীরে ধীরে জ্ঞান আসতেই তার সব কথা একটু একটু করে মনে পড়তে লাগল। তার হাত দুটো খুব জোরে চেপে ধরে তারপর···পাহাড়ের উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল, পাথরের উপর বারবার তার হাতপা ঠুকে যাচ্ছিল—তারপর কে যেন তাকে পাহাড়ের উপর থেকে আছাড় দিল। আর কিছুই তার মনে নেই।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন কারো কোন শব্দ শুনতে না পেয়ে ভাবলো সকলে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। রাতটা যে কী করে কাটবে। ভগবান! পেটে যে চিতে জ্বলছে। কী খাই। হায়রে কপাল ওদের একটুও দয়া হল না। পেটে দেওয়া ছাড়া আর তো কিছুই চাই না তোদের কাছে। একটু মায়া হোল না যে বুড়ীটা কবে না কবে মরে যাবে—তার মনে কষ্ট দিয়ে লাভটা কী।

এই খাওয়ার জন্য তোরা আমার এই দুর্দশা করলি। আমি অথর্ব, কানা-কালা, চোখে দেখি না কানে শুনি না। না বুঝে যদি খাবার জায়গায় গিয়ে পড়ে থাকি তাতে বুদ্ধিরাম তো বললেই পারত যে কাকী এখন ঘরে যাও, পরে এসো। তা নয় সকলের সামনে হিঁচড়ে নিয়ে এল আর এমন করে আছাড় মারল। দুখানা লুচির জন্য রূপা সবার সামনে অপমান করল! পুরির জন্য এত দুর্গতি করেও ওদের পাষাণ প্রাণ গলল না। বাড়ির সকলের খাওয়া হয়ে গেছে, কুকুর বেড়ালটা পর্যন্ত খেয়েছে। শুধু আমাকেই সারা রাত না খেতে দিয়ে ফেলে রেখেছে। এত রাতে নিশ্চই কিছু বাঁচে নি, বাঁচলেই বা কে আর দিতে আসছে।

এই কথা চিন্তা করে কাকী হতাশ হয়ে শুয়ে পড়ল। কান্নায় গলা বুজে এল। কিন্তু অতিথি কুটুমের ভয়ে কাঁদল না। হঠাৎ তার কানে এল—"কাকী ওঠো, আমি তোমার জন্য পুরি এনেছি!"

লাড়লীর গলা চিনতে পেরে কাকী উঠে বসল। দুই হাতে জড়িয়ে ধরে তাকে কোলে বসাল।

লাড়লী পুরি বার করে বুড়ীর হাতে দিল। জিজ্ঞেস করল—"তোর মা দিল বুঝি?" লাড়লী বলে—"না আমি আমার ভাগ থেকে নিয়ে এসেছি।" কাকী পুরির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুরি শেষ। লাড়লী জিজ্ঞেস করে—"কাকী পেট ভরেছে?" প্রচণ্ড গ্রীষ্মে দুফোঁটা বৃষ্টিতে যেমন গরম আরো বাড়িয়ে দেয়, বুড়ীর ঠিক সেই অবস্থা। বলে—"নারে বেটি, তোর মার কাছ থেকে আরও কয়েকটা চেয়ে আন।"

লাড়লী বলে—"মা ঘুমোচ্ছে, জাগালে মারবে।"

কাকী বাক্সটাকে ঝেড়ে ঝুড়ে টিপে টুপে দেখে, ঝুরো গুড়ো যা লেগে ছিল চেটে চেটে খায়। ঠোঁট দিয়ে জিভ চাটে, চুক চুক শব্দ করে।

বুড়ীর মন আরো কিছু পুরির জন্য অধীর হয়ে ওঠে। সংযমের

বাঁধন ভেঙে পড়েছে। দুখানা লুচি যেন তপ্ত বালির কড়ায় ছুঁড়ে ফোঁটা জলের মত। মাতালের যেমন মদের চিন্তায় আতুর হয়ে হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায় বুড়ীরও এখন ঠিক সেই অবস্থা। কিছুক্ষণ চরম ইচ্ছাকে রোধ করতে ব্যর্থ হয়ে হঠাৎ লাড়লীকে বলল—তুই একবার আমায় নিয়ে চল তো মা উঠোনে, যেখানে সকলের পাত পড়েছিল।

লাড়লী বুড়ীর মতলব অতটা ঠাহর করতে পারে না। বুড়ীকে ধরে উঠোন পার করে সেই এঁটো রাশীকৃত পাতার পাশে বসিয়ে দিল! কাণ্ডজ্ঞানহীন, ক্ষুধার্থ বৃদ্ধা রাশীকৃত এঁটো পাতা ঘেঁটে খাবারের টুকরো-টাকরা অম্লান বদনে মুখে দেয়। আহা কী স্বাদ। দইটা এত স্বাদের, কচুরি খেতে কী চমৎকার, খাস্তার মত মোলায়েম আর কিছুই হয় না। বুড়ীর ভিমরতি ধরলেও এ বোধটা আছে যে যে-কাজটা করছে তা ঘোরতর অন্যায়। আমি অন্যের এঁটো পাতা চাটছি। কিন্তু বার্ধক্যই হচ্ছে অন্তিম লালসার কাল। সকল প্রকার অভিলাষ একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়। কাকী বুড়ীরও সমগ্র বাসনা জিভে এসে আশ্রয় নিয়েছে। নিরুপায় হয়ে বৃদ্ধা সেই ঘৃণিত কর্মে লিপ্ত হয়েছে।

ঠিক এই সময়ে রূপা চোখ মেলে তাকায়। তার খেয়াল হয় যে লাড়লী তার পাশে নেই। চমকে উঠে চারপাইয়ের এদিক সেদিক, নীচে উঁকি মেরে দেখে যদি পড়ে গিয়ে থাকে। খুঁজে না পেয়ে উঠে বসে। এদিক সেদিক দেখতে গিয়ে নজরে আসে লাড়লী রাশীকৃত এঁটো পাতার পাশে চুপচাপ অবাক দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে আর বুড়ী কাকী পাতা ঘেঁটে খাবারের উচ্ছিষ্ট খুঁটে খাচ্ছে। রূপার অন্তর একটা অব্যক্ত ব্যাথায় মোচড় দিয়ে ওঠে। মনে হচ্ছে কেউ ওর চোখের সামনে গরু জবাই করছে আর ও দাঁড়িয়ে দেখছে। এক ব্রাহ্মণ কন্যা, ব্রাহ্মণের বিধবা স্ত্রী অপরের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট খাবার খাচ্ছে—সে নারী ওর শাশুড়ি, এর চাইতে শোকের ব্যাপার আর কি হতে পারে। সামান্য পুরি খাবার জন্য তার একান্ত আপন জন খুড়শাশুড়ি

এ ধরনের নিকৃষ্ট কার্য—আঁস্তাকুড় থেকে এঁটো কাঁটা তুলে খাওয়া—ভাবতেই তার সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে, পায়ের নীচের মাটি সরে যাচ্ছে বলে মনে হয়। এ দৃশ্য যে দেখবে সেই থরথরিয়ে কাঁপবে। প্রলয়ের আশঙ্কায় তার কাছে সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে গেছে বলে মনে হলো। আকাশটাও বুঝি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। সব কিছু ছারখার হয়ে যাবে। রাগে বা বিস্ময়ে নয়—শোকে, অনুতাপের প্রচণ্ড দাবদাহে এবং আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় রূপা পাথর হয়ে গেল। ভয়ে, অনু-শোচনায় তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। এই অধর্মের ভাগী আমি ছাড়া আর কে? তারায় ভরা অনন্ত অপার মহিমাময় আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে—"দয়াময়, সর্বশক্তিমান, আমি মহাপাপী, আমাকে ক্ষমা কর, আমার অধর্মের জন্য আমার সন্তানদের শাস্তি দিও না প্রভু। তুমি প্রসন্ন হও, এই সর্বনাশের আশঙ্কা থেকে আমাকে উদ্ধার কর।"

রূপা নিজের এইরূপ স্বার্থপরতা ও হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দেখে আঁতকে উঠল। নিজেকে নিজে ধিক্কার দেয়, বলে—হায়—এ আমি কি করলাম, এত নিষ্ঠুর আমি। যার সম্পত্তির আয় বার্ষিক দু'শ টাকা, যার টাকায় সংসারের সুখ সমৃদ্ধি তারই এই দুর্গতি। যত নষ্টের মূল আমি। হে ভগবান আমি অন্ধের মত চিন্তা না করে এরূপ দুর্মতি প্রকাশ করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও। আজ আমার ছেলের তিলক উৎসব। শত শত লোকের পাত পড়েছে। আমি তাদের সেবা-দাসীর মত হুকুম পালন করেছি। নিজে খ্যাতির শীর্ষে ওঠার জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিনি। কিন্তু যার দৌলতে আজ এই ঐশ্বর্য এই সংসার এমনকি উৎসব তাকেই আজ উৎসব শেষে অভুক্ত রাখতে কসুর করলাম না। কেবলমাত্র একটি কারণেই আজ তার এত কঠিন শাস্তি—সে অসহায় বৃদ্ধা যে দণ্ডের পরিণামে এক ব্রাহ্মণ বিধবা মহিলা জীবনের সায়াহ্নে এসে অতিথি অভ্যাগতদের এঁটো পাতা খুটে খায়। এ অপরাধের শাস্তি কী হতে পারে।

রূপা উঠে প্রদীপ জ্বালায়। ভাঁড়ার ঘরের দরজা খুলে সমগ্র খাদ্য সামগ্রী একটা থালায় সাজিয়ে বুড়ী কাকীর কাছে গেল।

মধ্যরাত প্রায় শেষ, আকাশে তারার প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবতারা হয়তো স্বর্গীয় উৎসবে মত্ত। বুড়ী কাকী নিজের চোখের সামনে সাজানো থালা দেখে যেরূপ অনাবিল আনন্দে হাসি হাসল সে হাসির কাছে দেবতাদের অনাবিল আনন্দও ম্লান হয়ে যায়। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে রূপা বলল—কাকী ওঠ, খেয়ে নাও। আজ আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে। তার জন্য মনে কোন দুঃখ রেখো না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন।

নিষ্পাপ শিশুরা যেমন মিঠাইমণ্ডা পেলে মায়ের সব তিরস্কার ভুলে আনন্দিত হয় তেমন বুড়ী কাকীও সব অনাদর, অবহেলা নিমেষে ভুলে গিয়ে খাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার প্রতি রোমকূপ যেন হর্ষোচ্ছ্বাসে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। চোখমুখ একটা অকৃত্রিম কল্যাণ কামনার আলোক-ছটায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রূপা এই স্বর্গীয় সুষমা দুচোখ ভরে পান করে।

নরক কা মার্গ

নরকের পথ

রাত্রিতে 'ভক্তমাল' পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছি সে কথা মনে নেই। এই সংসারে কিছু মহাপুরুষ আছেন যাঁদের কাছে ঈশ্বর একমাত্র কাম্য, তাতেই তাঁরা মগ্ন হয়ে থাকেন। মাতাল যেমন মদের নেশায় মাতাল হয় ঠিক তেমনি করে ভগবানের আরাধনায় নিজেকে তাঁরা মগ্ন রাখেন। এই ধরনের ভক্তি অত্যন্ত কৃচ্ছ্র সাধনারই ফল। কঠোর তপস্যা ছাড়া এই প্রেমে সিক্ত হওয়া কঠিন। মানব জীবনে এ ছাড়া আর পরম সুখ কিসেই বা আছে? আমি কি পারি না সেই সাধনায় ব্রতী হয়ে দুর্লভ তপস্যা করে ভগবৎ প্রেম লাভ করতে? বহুমূল্য রত্নভূষণের প্রতি যে একান্ত আসক্ত সে যদি এখানে সেই প্রেমময় মূর্তি দেখে তবে তার চোখে দেখা যাবে অসন্তোষের রোষ, আর ধনসম্পত্তি যার কাছে ইহকাল-পরকাল তারতো সেই সুমধুর নামের প্রকোপে জ্বরই দেখা দেবে। সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যে নিকৃষ্টতম ঘৃণিত কর্মে লিপ্ত তার কাছে তো এই নাম কুইনিন গেলারই সামিল। কাল সুশীলা পাগলাকে আমি কত নিষেধ করলাম তা সত্ত্বেও সে আমাকে রঙ্গ ভরে সাজিয়ে দিল, কতনা আদরে আমার খোঁপায় ফুল গুজে দিল! যে ভয়টা করছিলাম, হোল ঠিক তাই। তার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে হাসি-ঠাট্টা চলেছে, কিন্তু কেঁদেছি তার দ্বিগুণ। স্ত্রীর সজ্জিত তনু প্রত্যেক স্বামীর নিকট আদরণীয়, এইরূপ স্বামীর সংখ্যা বিরল যে তার স্ত্রীর অঙ্গরাগে বিরক্তি প্রকাশ করে, সমস্ত দেহ ক্রোধে জ্বলে ওঠে। এমন কোন অভাগিনী স্ত্রী আছে যে তার স্বামীর মুখ থেকে শোনে—তুমিই আমার ইহকাল

পরকালের সমস্ত পুণ্য কাজের বাধা, যত নষ্টের মূল, একটা বোঝা ছাড়া জীবনে আর কিছুই নও। তোমরা অত সাজ সজ্জার ঘটাই বা কিসের, তোমার লাজ শরমহীনতার পরিচয় পেয়ে রাগে আমার গা রী-রী করছে। এ কথার চাইতে বিষপানও বোধ হয় ওর কাছে সহজ হওয়া উচিত ছিল। ভগবান! তোমার জগতে এরকম মানুষও আছে। অতঃপর নীচে চলে যাওয়া শ্রেয় মনে করে "ভক্তমাল" নিয়ে পড়তে লাগলাম। আজ থেকে বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণই আমার উপাস্য। তাঁরই সেবাদাসী হয়ে চিরদিন থাকব। তাঁকে মুগ্ধ করার জন্যই সযত্নে সাজাব আমার দেহলতা। তিনি অন্তর্যামী, আমার মনের মণিকোটার সকল কথা তাঁর অজ্ঞাত নয়। তিনি আমাকে দেখে কখনও অপ্রসন্ন হবেন না।

আমি আর ধৈর্য করতে পারছি না! হায় ভগবান! তুমি অন্তর্যামী, কিছুই তোমার অজ্ঞাত নয়! আমার মনের কোন কথাই তোমার অগোচরে নয়। অন্যান্য বিবাহিতা নারীর মত আমিও আমার স্বামীকে ইহকাল পরকাল ভেবে একমাত্র আরাধ্য ইষ্টদেব রূপেই গ্রহণ করেছি, একান্ত অনুগত ভক্তের ন্যায় তাঁর চরণ সেবাই ছিল একান্ত কর্তব্য। আমার কোন প্রকার ব্যবহারই যেন তাঁর দুঃখের কারণ না হয় তার প্রতি আমার সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাঁর প্রিয় পাত্রী হওয়ার জন্য মন-প্রাণ সমর্পণ করেছি। কিন্তু সবই আমার পোড়া কপালের ফল। উনি নির্দোষ। আমার বাপ-মাও আমাকে সুখী করার জন্য যথাসাধ্য করেছেন। আমার অদৃষ্টই মন্দ। তা সত্ত্বেও তাঁকে বাইরে থেকে ঘরে ফিরতে দেখলেই পেট কামড়াতে শুরু করতো, বুকের মধ্যে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যেতাম। সারা মুখের উপর কে যেন একরাশ মসী ঢেলে দিয়েছে, মাথা ধরে যেত। তাঁর সাথে কথা বলাতো দূরের কথা মুখ পর্যন্ত দেখতে ইচ্ছে করতো না। ওঁর আসার সময় হলেই বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে যেত। শত্রুকে দেখলেও লোকের মন এত উত্তাল হয় না। কয়েক দিনের জন্য কোথাও গেলে

আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচতাম। মনে হতো যেন বুকের উপর চেপে থাকা পাষাণটা সরে গেছে। জীবনে আনন্দের সঞ্চার হোত। হাসতাম, গুন, গুন করে গান গাইতাম, কথাও বলতাম সকলের সঙ্গে—কিন্তু তাঁর আগমনের সংবাদ শুনলেই যেন মাথা চরকির মত চক্কর খেতে থাকে, চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে আসে একটা অজানা আশঙ্কায়।

আমার ভ্রান্তিকর মনের সুনিশ্চিত জবাব নিজেরই অজানা। প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? পূর্ব জন্মে আমারা দুজনেই বোধ হয় একে অন্যের শত্রু ছিলাম। সেই বৈরীভাব এখনো সমানে চলেছে। পুরোনো শত্রুতার বদলা নেবার জন্যই উনি আমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছেন। পরিণয় মানুষকে সুন্দর করে, সুখ প্রদান করে। কিন্তু আমাদের কেন এমন মতানৈক্য। তবে কি প্রাচীন সংস্কার আমাদের মনের মাঝে শক্ত বনিয়াদ সৃষ্টি করে বিভেদ তৈরি করছে? তা নইলে আমিই বা কেন আমার স্বামীকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে থাকি আর তিনি আমাকে দেখে সব সময় রেগে আগুন। এতো বিয়ের যথার্থ প্রতিশ্রুতি নয়।

আমি তো একদিন সুখী ছিলাম। সারা জীবন নিজের সুখের নীড়ে আনন্দের বন্যার স্রোতে সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু এই সামাজিক প্রথার কবলে পড়ে পিতামাতারা তাঁদের দুহিতাদের যে-কোন এক পুরুষের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়াটাই একমাত্র করণীয় বলে বিবেচনা করেন। মনের খবর জানার চেষ্টা করেন না। হতভাগিনী-দের অন্তর গুমরে গুমরে কাঁদে। কত তরুণী তার আরাধ্য পুরুষকে স্মরণ করে চোখের জলের অর্ঘ্যে পূজা সমাপন করে। যুবতী তার যৌবনের প্লাবনে উচ্ছল হয়ে ঊর্মীর মত বন্ধন হীন ছন্দের দোলায় জীবনের যাবতীয় সমর্পণ করে সেই চরণে। কিন্তু সেই সজীবতার অঙ্কুরেই বিনাশ ঘটে। সেই পুরুষেরা অনাঘ্রাত পুষ্পকে নির্দয়ভাবে পদদলিত করে ছুড়ে ফেলে দেয়। আর প্রতি যুবতীই নিজের ভবিষ্যতের ভাবী বরের কথা কল্পনা করে অন্তরে এক অজানা পুলকে আপ্লুত হয়ে ভেসে যায় কল্পনার স্রোতে। কল্পনাবশে নারী এক সুদর্শন পুরুষ-

শ্রেষ্ঠের সজীব প্রতিমূর্তিকে চোখের সামনে দেখতে পায়, যে-পুরুষ তার বহু বাঞ্ছিত কামনার ধন। কিন্তু আমি এক ভাগ্যহীনা নারী। আমার কাছে আপন পুরুষের আবির্ভাব দুর্ঘটনার সামিল। "স্বামী" শব্দটি আমার কাছে হৃদয়ের কাঁটা যা হামেশাই কলজেটাকে ছিন্ন ভিন্ন করেছে, চোখের বালি স্বরূপ, অন্তরে সবসময় আমার স্বামীর নাম ব্যঙ্গবাণের মত বিঁধছে।

সুশীলার মুখে হাসি লেগেই আছে। গহনা নেই, কাপড় তাও একটা বৈ আর নেই, সেটাও আবার ত্যানার মত। "খেলার ঘরে সুখের নীড়। ঘর গৃহস্থালীর কাজ এক হাতে করে, কিন্তু ওকে কাঁদতে কেউ দেখেনি।

বড় সাধ জাগে ওর দারিদ্র্যের সঙ্গে আমার ধনাতিশয্য বদল করতে। কি-সে পরমধন যার জন্য সুশীলা এত সুখী! নিজের স্বামীকে যখন স্মিত হাসিতে ঘরে ফিরতে দেখে তখন নিমেষে সমস্ত দুঃখ কষ্টের কথা ভুলে গিয়ে ওর বুক স্বামী গর্বে ফুলে ওঠে। সেই প্রেমালিঙ্গনের সুখের কাছে ত্রিলোকের সমগ্র ধন সম্পত্তি মুহূর্তে সমর্পণ করে দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। সে সুখই অনিন্দ্য সুন্দর স্বর্গসুখ।

আজ আমার সব ধৈর্যের বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। আমি তাকে জিগ্যেস করলাম তুমি আমাকে বিয়ে করেছ কি জন্যে? মাসের পর মাস আমার মন তোমার ব্যবহারে ভেঙ্গে চুরমার। কিন্তু নিজেকে সংযত রেখেছি, আর না, আজ আমার সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। এর উত্তর আমার আজ চাই-ই। আমার প্রশ্ন তাকে উন্মাদের মত করে দিল। ছুটে এসে আমাকে ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে রাগে গরগর করতে করতে বললেন, তোমাকে নিয়ে কেবল সোহাগ করি, কেমন, শয়তান মেয়েমানুষ, তুমি আমার ভোগ বিলাসের মাল হয়ে থাকতে পারো। ঘর সাজানোর জন্য, গৃহস্থালীর কাজ করার জন্য তোমাকে আনা হয়েছে, বুঝেছ।

শিশু-যেমন মাতৃক্রোড় আলো করে মায়ের মুখে হাসি ফোটায়

তেমনি গৃহিণীই গৃহের আলোক স্বরূপ। গৃহিণী ভিন্ন গৃহ চির অন্ধকার-ময়। তার কোন আকর্ষণ নেই। চাকর-বাকর ইত্যাদি বার ভূতেই সব ধন-সম্পত্তি লুটপাট করে। সংসারের সর্বত্রই রমণীর স্পর্শের অভাব। সব কিছু ছন্নছাড়া, অগোছাল। মাতৃহীন শিশুর মত।

এতদিনে আমি বুঝতে পারলাম এই সংসারে অতন্দ্র প্রহরী হয়েই আমি এসেছি, এছাড়া আর কিছু দাবী আমার নেই। স্বামীসুখে বঞ্চিতা। কেবলমাত্র এই ঘর-সংসার-ধন সম্পত্তির অধিকারিণী ভেবে নিজেকে ধন্য মনে করে এসব রক্ষা করতে হবে। এ অসম্ভব। সম্পত্তিই একমাত্র কাম্য, আমি কেবলমাত্র রক্ষাকারিণী, আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাক্ এ সংসার। এতদিন তবে এক অপরিচিতের ঘরই আমি পাহারা দিয়েছি। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আমার বুদ্ধিমত সব কিছুই করতে চেষ্টা করেছি। এবং সাধ্যমত করেছি। ভগবানের নামে শপথ নিলাম আজ থেকে এ সংসারে কোন জিনিসে আর হাত দেবো ন এতদিন ধরে এ কথাই জেনেছিলাম যে পুরুষ কেবলমাত্র সংসার পাহারা দেবার জন্যই বিয়ে করে না, দুজনে মিলে এক সুখের নীড় বাঁধে। কিন্তু ভদ্রলোক চিৎকার করে আমাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে সংসার পাহারা ছাড়া অন্য কিছু কাজের জন্য আমি তার স্ত্রী হয়ে আসি নি। হায় রে হতভাগিনী নারী ভাগ্য। কিন্তু সুশীলা অন্য কথা বলে, স্ত্রী বিনা স্বামীর সুখ নাই, শূন্য গৃহ যেন এক অভিশাপ নিয়ে আনে। পক্ষীশূন্য খাঁচার মত গৃহিণীহীন গৃহের রূপ অনুভূত হয়।

আমার প্রতি তার সন্দেহের কোন হেতু খুঁজে পেলাম না। যেদিন থেকে আমি এই ঘরে এসেছি সেদিন থেকেই তাঁর আমার প্রতি সন্দেহময় কটাক্ষ উপলব্ধি করতে পারছি। চুলগুলোকে একটু বাগে এনে রাগে ঠোঁট চিবোতে চিবোতে এর কারণ চিন্তা করতে লাগলাম। কোথাও যাওয়া-আসা অনেকদিনই বন্ধ করেছি। লোকের সঙ্গে মেলামেশারও ধার ধারি না—কথা বলাটুকুও বন্ধ করেছি। এই

ধরনের অমূলক সন্দেহের কারণ খুঁজে পাই না। আমার লজ্জা-শরম কি আমার কাম্য নয়। কোন সধবা নারীই কি তার একান্ত নিজের আব্রু বিসর্জন দিতে পারে? এ অপমানের জ্বালা আমার কাছে অসহ্য। আমি কি এতই নীচ। সন্দেহ করতে কি বিন্দুমাত্র লজ্জাও হলো না। কানা যখন কাউকে হাসতে শোনে, ধরে নেয় তাকে নিয়েই হাসির উৎস। তাঁরও ঠিক ভ্রান্ত ধারণা যে আমি তাকে ঘৃণা করি। নিজের অধিকার বহির্ভূত কোন কর্মে লিপ্ত হলে আমাদের সকলের মনেই এই সন্দেহ প্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটে। ভিক্ষুক যদি রাজা হয় তবে সে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে না, চতুর্দিকে নিজেকে শত্রু পরিবেষ্টিত দেখে। এ সবই তার এক ধরনের বাতিক। আমারও ঠিক সেই অবস্থা। সব বিবাহিত ব্যক্তিই আমার কাছে এক, বিশেষ করে এই বয়স্করা।

সুশীলার কথায় আজ কিছুক্ষণের জন্য দেবতা দর্শন করতে যাচ্ছিলাম। এ কথা অতি নির্বোধ বুঝতে পারে যে গৃহবধূর পক্ষে কটকে যাওয়া অতি লজ্জার কথা, লোক হাসানো ছাড়া আর কিছুই নয়। সব দিক সামলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। কিন্তু উনি কি করে যেন সে সময় দেখে ফেললেন আর তিরস্কার ভরা চোখে আমাকে দেখে বললেন—এত সাজসজ্জা করে যাওয়া হচ্ছে কোথায়—

আমি সলজ্জ ভঙ্গীতে জবাব দিলাম। ঠাকুর দর্শন করে আসি, যাবো আর আসবো। এই কথার উত্তরে গলায় সপ্তম স্বর চড়িয়ে বললেন—তোমার মত মেয়ের দেবতা দর্শনের কোন প্রয়োজন নেই। যে স্ত্রী নিজের স্বামীর সেবায় বিমুখ, দেবতা দর্শনের পুণ্যের বদলে তার পাপই সঞ্চার হয়। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যাওয়া হচ্ছে। আমাকে কোন পরোয়াই নেই। মেয়েমানুষ জাতটাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি, এর মত বজ্জাত আর একটাও নেই।

ক্রোধে আমার বাক্ রুদ্ধ হয়ে গেল। সব ভাষা গেল হারিয়ে। সেই মুহূর্তে কাপড় পালটে নিলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম আর কোন

দিনও দেবমূর্ত্তি দর্শনে যাব না। অবিশ্বাসের কোন কূল কিনারা নেই। তাঁর জবাব আমিও দিতে পারতাম। সে মুহূর্তেই ঘর ছেড়ে চলে যাওয়াই উচিত ছিল। দেখতাম তাঁর দৌড় কতদূর। সাতপাঁচ ভেবে নিজের ক্রোধকেই দমন করলাম। আমাকে উদাস, আনমনা দেখে তাঁর আশ্চর্য হবার কথা। তাঁর মনে আমার স্থান অতি বড় কৃতঘ্ন হিসাবেই। তিনি ভাবছেন তাঁর সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় আমি ধন্য হয়ে গেছি। তিনি আমাকে উদ্ধার করে যেন একটা দারুণ কৃতজ্ঞতার বাঁধনে বেঁধেছেন। স্থাবর অস্থাবর সহ এই বিশাল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী হয়ে আমার অত্যন্ত গর্বিত হওয়া উচিৎ,—অষ্টপ্রহর তাঁর যশকীর্তন করা একান্ত কর্তব্য, আর আমি কিনা সেসব কিছু না করে বেইমানের মত মুখ ঘুরিয়ে থাকি। কখন কখন ওঁকে দেখে আমার বড্ড মায়া হয়। কিন্তু একটা অতি সাধারণ সত্য কথা, তাঁকে বোঝাতে পারি না যে নারী জীবনে ধন-সম্পত্তিটাই সব নয়, এমন একটি কামনার ধন আছে যা হারিয়ে স্বর্গসুখও তার কাছে নরকের মত মনে হয়।

আজ তিনদিন ধরে শয্যাশায়ী। নিউমোনিয়া হয়েছে, ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে। বাঁচার কোন আশা নেই। কিন্তু আমি নিজেই জানি না আমার হৃদয় কেন এমন বজ্রতুল্য হয়ে গেল, মনের সব কোমলতা দূর হয়ে গেছে। এত নিষ্ঠুর আমি। নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। কারো অসুস্থ দেহ দেখলে আমার হৃদয় ব্যথায় কাতর হয়ে উঠত, কারো কান্না সহ্য করতে পারতাম না। ফুলের মত কোমল হৃদয় কি করে কাঁটার আঘাত সহ্য করছে। আজ তিনদিন ধরে আমার পাশের ঘরে শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কাতরাচ্ছেন। একবারের জন্যেও তাঁকে দেখতে যাইনি। চোখও কি একেবারে মরুভূমি হয়ে গেছে? একান্ত প্রিয়জনের রোগাক্রান্ত দেহের কথা কি মানুষ এত নির্দয় ভাবে ভুলে থাকতে পারে। তাঁর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তা আমি ভুলে গেছি। কোন দিন যে সম্পর্ক ছিল একথা ভাবতেই পারছি না। আপনারা আমাকে পিশাচিনীই

বলুন আর ভুলটাই বলুন তাতে আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। তাঁর রোগের যন্ত্রণায় আমি অন্তরে এক ধরনের ঈর্ষাময় আনন্দ উপলব্ধি করছি।

আমার এই পরাধীন জীবনের জন্যে দায়ী কে? ওর জন্যেই আমার এই কারাবাস। শৃঙ্খলিত জীবনের নিরানন্দময়তা আমাকে দুঃসাহসী করেছে। কয়েদখানা ছাড়া এ আর কিইবা হতে পারে। আমাদের দুজনের সম্পর্কের রূপ এটাই। বিবাহের পবিত্র মধুর মিলন এখানে কোথায়? আমি এত উদার নই যে, আমাকে যে কারাবাসে বন্দিনী করে রাখে তাঁকেই পূজো করে অন্তরের আসনে অধিষ্ঠিত করবো। লাথির বদলে পদচুম্বন—এ আমার পক্ষে অসম্ভব। ঢিলের বদলে পাটকেল খেতেই হবে। এ হতেই হবে। ভগবান যদি থেকে থাকেন তবে এতদিনে আমার ডাক শুনতে পেয়ে মুখ তুলে চেয়েছেন। তিনি এ পাপের দণ্ড দিয়েছেন। নিঃসংকোচে মন থেকে আমি বলছি তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। কোন নারীকে পুরুষের গলায় ঝুলিয়ে দিলেই বিয়ে হয়ে যায় না। জীবনে অন্তত একবারও হৃদয় প্রেমাবেশে পুলকিত হবার নাম বিবাহ, দুটি হাত দুটি মন এক হলে তবে সে মিলন বিবাহ নামে অভিষিক্ত হবার যোগ্য। শুনতে পাচ্ছি ও ঘরে আমার পতিদেবতা বিছানায় ছটফট করতে করতে আমাকে শাপ শাপান্ত করছেন। চমৎকার। এতেও যদি ওঁর আত্মা শান্তি পায়—এত দুঃখ ভোগের জন্য আমিই নাকি দায়ী। হৃদয় পাষাণ হয়ে গেছে। যে ভালো বাসবে না তাকে ভালবাসায় কে? এ বালি ভরা নীরস সাহারায় ভালবাসা নেই। কোন কিছুতে আর আমি ভুলছি না। যার ইচ্ছে এ ভূসম্পত্তি নিয়ে যাক, আমার কোন প্রয়োজন নাই।

তিন মাস গত হয়েছে, আমি বিধবা হয়েছি, অন্তত লোকের সেই ধারণা। যার যা প্রাণ চায় বলুক? লোকের বলায় আমার কি আসে যায়। আমি আগেও যা ছিলাম এখনও ঠিক সেই আছি। হাতে চুড়ি? কেন ভাঙবো শুনি। সিঁথিতে আগেও সিঁদুর পরতাম না,

এখনও ঠিক তাই আছে। বুড়ো বাপের শ্রাদ্ধ শান্তি তাঁর সুযোগ্য পুত্রই করেছে। আমি ধারে কাছেও যাইনি। আমাকে নিয়ে নানা রকম আলোচনা কানে আসে, কেউ আমার চুলের বেণী দেখে ঘৃণায় নাক সিটকায়, আমার গায়ে গহনা দেখে কেউ বা চোখ টিপে হাসে তাতে আমার কি এসে যায়? এদের বিরক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত আমিও রং-বেরং শাড়ী পরতে শুরু করেছি। নতুন কনের মত নিজেকে সাজাই। আমার মনে দুঃখের লেশ মাত্র নেই। আজ আমি মুক্ত। মুক্ত আকাশে মুক্ত পাখীর মত আজ আমি সহজ, সাবলীল গতিতে মনের আকাশে বিচরণ করছি। বন্দিনী সেই মানবী আজ অফুরন্ত মুক্তির স্বাদে ভরপুর।

কিছুদিন পর একদিন সুশীলার ডেরায় গেলাম। পায়রার খোপের মত ঘর। ঘর সাজাবার মত কোন জিনিসই চোখে পড়ল না, একটা চারপেয়ে পর্যন্ত নয়। কিন্তু তবুও সুশীলার আনন্দের সীমা নেই। তাঁকে হর্ষোজ্জ্বল দেখে আমার হৃদয়ে কতনা কল্পনা চিন্তার স্রোতে ভেসে ওঠে। তাকে কুৎসিৎ বলতে আমার মন সায় দেয় না, তার জীবনে আছে উৎসাহের সমারোহ। মনের হাসি চোখে লেগেই আছে, ঠোঁটদুটি সেই মধুর হাসিতে সর্বদাই রঞ্জিত। কথা শুনলে হৃদয়ের সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়। বাঁশীর সুরের মত সুমিষ্ট প্রেমময়। কথামালার স্রোতে প্রবাহিত হয়ে যায়। এ আনন্দ ক্ষণিকের তরে হলেও জীবনের স্মৃতি পটে অক্ষয় হয়ে থাকে, পরিপূর্ণতার স্বাদ আনে। এ স্মৃতির আখের জীবন পথের পাথেয় হিসাবে যথেষ্ট। এই মিজরাবের আঘাতে হৃদয়-তন্ত্রীতে অনন্তকাল ধরে এক মধুর সুর কম্পিত হতে থাকে। অন্তরের ক্লান্তি নিবারণে সহায়ক হয়ে ওঠে।

একদিন আমি সুশীলাকে জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা ধর্ তোর স্বামী মহাশয় বিদেশে চলে গেল, তুই তো তাহলে কেঁদে কেঁদে মরেই যাবি, কিরে ঠিক বলছি কিনা?

সুশীলা মমতামাখানো সুগম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয়—না বোন, মরবো

কেন ? ওর বিরহে ওর ভালবাসার কথা স্মরণ করে অন্তরের গভীরে এক ধরনের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে থাকব। বছরের পর বছর যদি বিদেশে থাকে তবুও সেই স্মৃতি হবে আমার বেঁচে থাকার সম্বল।

আমার হৃদয় ঠিক এই ধরনের প্রেম পিয়াসী। সুশীলার মত বিরহ জ্বালা ভোগ করার জন্যে আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে· ক্ষণিক হলেও আমি আমার কল্পলোকের স্বর্গের জন্যে তৃষ্ণাতুর। বিরহিণী মানস পটে হৃদয় নাথের স্মৃতি যদি সকল সময়ের জন্য ভেসে উঠত। সেই নেশায় মত্ত হবার বাসনা আমার চিরদিনের, বিরহিণীর দিল দরিয়া যদি করুণ রাগের তরঙ্গে দোলায়িত হোত।

আমার অন্তর জগতের আকাশ বাতাস একটা বিপুল রিক্ততায় পরিপূর্ণ পিপাসী হৃদয় সব সংযমের বাঁধন ছিড়ে ফেলে আজ হঠাৎ বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। একরাশ অশ্রু আমার মুখে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একসময় তা থেমেও গেল। এক অনাস্বাদিত ভয় ও বিস্ময়ে গায়ে কাঁটা দিতে শুরু করল। নিজের চোখের সামনে দেখতে পেলাম আমার জীবন যেন একটা অসমতল বিস্তৃত মাঠ। সবুজের নাম গন্ধও নেই, শুধু বালুকা রাশি উড়িয়ে নিয়ে ছুটে গেছে এক বিশাল ঝঞ্ঝা। এই বিশাল অট্টালিকায় এই ঘর যেন আমাকে গিলে খেতে আসছে। আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। মনপ্রাণ এত চঞ্চল হয়ে উঠেছে, ইচ্ছে হয় সব বন্ধনের মায়াজাল ছিন্ন করে উড়ে যাই কোন দূর দেশে। ধর্মগ্রন্থেও আজকাল আর তেমন মন নেই। সেইগুলিও যেন নীতিবাক্যের পরাকাষ্ঠার মত মনে হয়, মনের নিবিড় শান্তি কোথায় গেলে পাই ? ভ্রমণ, তাও বিষাদময় মনে হয়। নিজেই জানিনা আমি কি চাই। কিন্তু আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই ব্যাকুল শিহরণের সঞ্চরণ চলছে, তাকে অস্বীকার করি কি করে ? আমি নিজেই আমার চিন্তার প্রতিমূর্তি। আমার প্রতিঅঙ্গ যে অন্তরের গভীর বেদনায় মুহুর্মুহু কেঁপে উঠছে।

আমার এই চিত্ত-চাঞ্চল্য যে দশায় উপস্থিত হোল, যখন মানুষ

লজ্জা, ঘৃণা এবং ভয় এইগুলোর বশে থাকে না। আমি এখন লজ্জা, ঘৃণা ও ভয় এই তিনেরই অনেক উর্দ্ধে। আমার চিত্ত-চাঞ্চল্য তার অন্তিম দশায় উপস্থিত। সেই লোভী, স্বার্থান্বেষী পিতামাতা, যাঁরা আমাকে এই অন্ধকূপে ফেলে দিয়েছে যেখান থেকে উপরে আলোর মুখ দেখা এ জীবনে বন্ধ, আমার সীমন্তে যে সিঁদুরের সোহাগময় রেখা টেনে দিয়েছে, তাঁদের দেখে ঘৃণায় আমার মন কুঞ্চিত হয়ে আসে। বারবার দেবতার কাছে তাদের অমঙ্গলই আমার কাম্য। আমি প্রতি-হিংসায় জ্বলে উঠে সমাজের কাছে ওঁদের লজ্জিত করতে চাই। এই জীঘাংসাকে চরিতার্থ করবার অদম্য বাসনা আমাকে মণিহারা ফণীর ন্যায় সাঙ্ঘাতিক করে তোলে। আমি নিজেকে কলঙ্কিত করে ওদের মুখ কলঙ্কিত করবো। তাদের প্রাণদণ্ড দেবার জন্য আমি আত্ম-বিসর্জন করবই। এ প্রতিজ্ঞায় আমি অচল। আমার নারীত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে। হৃদয়ের এক প্রচণ্ড জ্বালায় আমি পিশাচিনী, দানবী।

ঘরে সব লোক ঘুমে অচেতন। বন্য জন্তু যেমন গরমে ব্যাকুল হয়ে আস্তানা ছেড়ে কোন মুক্ত জায়গার দিকে ছুটে যায় আমিও সেই রকম চুপিসাড়ে দরজা খুলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে এক মুক্তির স্বাদ পেলাম। ঐ বৃহৎ অট্টালিকায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

নিস্তব্ধ রাস্তায় জনমানবের চিহ্ন নেই। দোকানগুলির ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ এক বৃদ্ধাকে আসতে দেখা গেল। কোন ডাইনী বা প্রেতনী এই ভেবে ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। গলা শুকিয়ে এল। বুড়ি আমার সামনে এসে আপাদমস্তক ভালোভাবে নিরীক্ষণ করতে করতে জিজ্ঞেস করলো—কার অপেক্ষায়?

আমি চিৎকার করে উঠলাম—মরণের।

বৃদ্ধা—তোমার কপালে তো অনেক সৌভাগ্যের লেখা দেখা যাচ্ছে গো। তোমার ভাগ্যের আকাশে এখন আঁধার কেটে গিয়ে তোমার আলো দেখা দিয়েছে।

আমি হেসে বললাম—বাপরে, এত অন্ধকারেও তোমার চোখের কি তেজ, কপালের লেখা পর্যন্ত পড়ে ফেলছ।

বুড়ী—চোখ দিয়ে কি আর সে লেখা পড়া যায় বাছা? পড়েছি জ্ঞানগম্যি দিয়ে। রোদের তাপে তা নষ্ট হয়ে যায় নি বরং উজ্জ্বল হয়েছে। তোমার দিন ফিরছে, সুদিন আসছে। হাসছো? জানো তো একাজ করেই চুল পাকালাম, তা কি মিছিমিছি! যে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরতে যাচ্ছিল, এই বুড়ীর দৌলতেই আজ সে পুষ্প শয্যায় সুখে শুয়ে আছে। বিষের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে যে জীবন ত্যাগ করার পণ করেছে আজ সে দুধ দিয়ে কুলকুচি করছে। একজন্যেই এত রাতে কোন অভাগিনীকে যদি উদ্ধার করতে পারি তাই বেরিয়েছি। কারো কাছে কিছুই চাই না, ভগবানের দয়ায় সবই আছে। কেবল যদি কারো কোনো কাজে লাগি তাই এই বাসনা। ধনরত্ন-টাকাকড়ি, সন্তান যার যা কিছু চাই—ব্যস আর কি বলব—ইচ্ছাময়ীর কৃপায় এমন মন্ত্র জানা আছে, যে যা চাইবে তাই পাবে, কোনো ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকবে না।

আমি বললাম—ধন, সন্তান কিছুই চাই না। আমার মনোবাসনা পুরণের ক্ষমতা তোমার কর্ম নয় বুড়ী মা।

বুড়ী হেসে বলল—দেখ মা, তুমি যা চাও তাও আমার জানা। আমি জানি সংসারে থেকে তুমি স্বর্গসুখের স্বাদ চাও। যা দেবতাদের আশীর্বাদের চাইতেও আনন্দপ্রদ, আকাশ কুসুমের চাইতে দুর্লভ, ডুমুরের ফুলের মত অপ্রাপনীয় এবং অমাবস্যার চাঁদের চাইতেও দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু আমার মন্ত্রের জোরে সব কিছুকেই বশে আনা সম্ভব। এমন যে ভাগ্য, সেও হাতের মুঠোয় এসে যায়। বুঝেছি, তুমি প্রেমের কাঙালিনী। কোন ভয় নেই, তুমি প্রেম নৌকায় সওয়ারী হয়ে প্রেম সাগরে, প্রেমের তরঙ্গে কেলি করে ওপারে পৌঁছে যাবে। সব মন্ত্রই আমার ঝোলায় আছে।

উৎকণ্ঠিত হয়ে বললাম—মা, তুমি থাক কোথায়?

বৃদ্ধা—খুব কাছে। বাছা তুমি যদি যেতে চাও, চুপিসাড়ে তোমাকে আমি নিয়ে যাবো।

মনে হোল নিশ্চয়ই স্বর্গ থেকে কোন দেবী বুড়ীর বেশ ধরে আমার কাছে এসেছে। তাই তাঁকে অনুসরণ করে চলতে লাগলাম।

হায়! সেই বুড়ী—যাকে আমি আকাশের দেবী ভেবেছিলাম, তার আসল পরিচয় নরকের ডাইনীরূপে। আমার সর্বনাশ করে দিয়েছে। অমৃতের সন্ধান করতে এসে চুমুক দিলাম বিষের পেয়ালায়? নির্মল পবিত্র প্রেমে অবগাহন করতে এসে ডুব দিলাম দুর্গন্ধময় কর্দমাক্ত নর্দমায়। সেই প্রেমের সন্ধান আর এ জীবনে পেলাম না কুলটাদের মত বিষয়-বাসনা নয়, সুশীলার মত সুখ চেয়েছিলাম। কিন্তু জীবনে চলার পথ একবার বদলে গেলে সোজা রাস্তায় আসা কঠিন।

আমার অধঃপতনের জন্যে কী আমি দায়ী? এ হতে পারে না। যদি কেউ দায়ী হয় তাহলে সে হোল আমার বাপ-মা আর সেই বুড়ো যে আমার স্বামী হতে চেয়েছিল এসব কথা লিখতাম না, কিন্তু আমি চাই আমার আত্মকথা পড়ে লোকের চোখ খুলে যাক্। আমি আমৃত্যু সেই এক আর্তনাদই করে যাবো, বলবো—তোমরা মেয়েদের বধূজীবনের শ্রেষ্ঠ এবং কাম্য বরই দেখো, শুধুমাত্র ধনসম্পত্তি, জমি-জমা, কুল-কুলীনতা কোন নারীকে জীবনে আনন্দ দিতে পারে না—শান্তির স্বর্গে পৌঁছে দিতে পারে না। সুখের অমৃত লোকে অধিষ্ঠিত করতে যদি তার জন্যে উপযুক্ত বর না পাওয়া যায়, তবে সে চিরকুমারীই থাক্। নয়তো বিষ পান করতে দিয়ে বা গলা টিপে যেন হত্যা করা হয় কিন্তু কোন শুষ্ক হৃদয়, অরসিক বৃদ্ধের সাথে যেন তার বিবাহ না হয়। স্ত্রী সব সহ্য করতে পারে, দারুণতম দুঃখেও সে হাসতে পারে। কঠিনতম সংকটকেও সে বুক পেতে নিতে পারে, কিন্তু একটা অমানুষ স্বামীদেবতা নিয়ে ঘর করার যে দুঃখ সেই দুঃখ তার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। নারীর প্রস্ফুটিত যৌবন কুসুম তাতে দলিত মথিত হয়ে যায়।

আজ এই পর্যন্তই থাক। যে ফুল আবর্জনায় পড়ে তা কখনো দেবতার চরণে নিবেদিত হয় না। আমিও আজ তাই সেই স্বর্গসুখ থেকে বঞ্চিতা, রিক্তা, নিঃস্ব। যা পেছনে ফেলে এসেছি আমি, তা ফিরে পাবার কোন উপায় আজ আর আমার নেই। প্রেমের অমরাবতী রচনা করতে চাওয়া এক হতভাগিনী নারীর গভীর দীর্ঘশ্বাস আজ শুধু আর্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফেলে আসা জীবনের পথে পথে।

পরীক্ষা

দেশীয় রাজ্য দেবগড়ের দেওয়ান সর্দার সুজান সিংহ যখন বুড়ো হলেন তখন তাঁর পরমাত্মার কথা মনে পড়ল। মহারাজের কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানালেন, "দীনবন্ধু, দাস চল্লিশ বছর ধরে শ্রীমানের সেবা করেছে, এখন অবস্থা অস্তগামী প্রায়, রাজকার্য সামলানোর মত শক্তি আর নেই। কোন ভুলচুক হয়ে গেলে এই বুড়ো বয়সে না বদনাম হয়। সারা জীবনের সুনাম মাটিতে মিশে যাবে।"

অনুভবশীল ও নীতিকুশল এই দেওয়ান রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। অনেক বুঝানো সত্বেও দেওয়ানজী রাজী না হওয়ায় রাজা এক শর্তে তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। শর্ত এই—রাজ্যের জন্য নতুন দেওয়ান তাঁকেই খুঁজে দিতে হবে।

পরেরদিন দেবগড়ের জন্য এক যোগ্য দেওয়ানের আবশ্যকতার বিজ্ঞাপন দেশের নামকরা খবরের কাগজগুলোতে প্রকাশিত হল। যিনি নিজেকে এই পদের যোগ্য বলে মনে করেন তিনি যেন দেওয়ান সর্দার সুজান সিংহের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। গ্রাজুয়েট হওয়া আবশ্যিক নয়, তবে স্বাস্থ্যবান হওয়া আবশ্যক। অজীর্ণ পীড়িত ব্যক্তিকে কষ্ট করে এখানে আসবার দরকার নেই। একমাস ধরে প্রার্থীদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করা হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতার চেয়ে কর্তব্যনিষ্ঠাই বেশী করে বিচার করা হবে। এই সমস্ত পরীক্ষায় যিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হবেন, তিনিই ঐ উচ্চপদ অলঙ্কৃত করবেন।

এই বিজ্ঞাপন সারা দেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। এইরকম একটি উচ্চপদ অথচ কোন রকম বন্ধন নেই। কেবল ভাগ্যের খেলা। শত শত লোক নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে রওনা হয়ে পড়ল। দেবগড়ে নতুন এবং নানারকম লোক দেখা গেল। প্রত্যেক রেল-

গাড়ি থেকে মেলার মত নির্বাচন প্রার্থীরা নামতে লাগলেন। কেউ পাঞ্জাব থেকে, কেউ মাদ্রাজ থেকে এসেছেন। কেউ ফ্যাশন প্রেমী, কেউ সাদাসিধা। পণ্ডিতগণ এবং মৌলবীরাও নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষার সুযোগ পেলেন। বেচারারা যে সব প্রমাণপত্র দাখিল করতে লাগলেন—এখানে তার কোন মূল্য ছিল না। রঙীন ইমামী, চাপকান আর নানারকম পোশাক ও টুপিতে সজ্জিত লোকজন দেখা গেল দেবগড়ে। তবে সংখ্যায় বেশী গ্রাজুয়েটরাই, কারণ ডিগ্রী আবশ্যিক না থাকলেও ডিগ্রী দিয়ে দুর্বলতা তো চাপা পড়ে।

সর্দার সুজান সিংহ এই মহানুভব ব্যক্তিদের আদর-আপ্যায়নের খুব ভাল বন্দোবস্তই করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ঘরে রোজা-পালনকারী মুসলমানদের মত দিন গুণতে লাগলেন। প্রত্যেকে নিজ বুদ্ধি অনুসারে নিজ জীবনধারা সবচেয়ে ভালভাবে দেখানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। মিস্টার 'অ' বেলা ন'টা অবধি ঘুমতেন, আজকাল তিনি বাগানে বেড়ানোর জন্য ভোরেই উঠে পড়েন। মিস্টার 'ব' এর হুঁকো টানার অভ্যেস। কিন্তু উনি এখন রাতদুপুরে দরজা বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে বসে সিগারেট ফুঁকছেন। মিস্টার 'দ', 'স' ও 'জ' এর বাড়িতে তাঁদের সেবার জন্য তাঁদের চাকরদের প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়, কিন্তু এখন তাঁরা চাকরের সাথেও 'আপনি', 'জনাব' ছাড়া কথাবার্তাই বলেন না। মিষ্টার 'ক' ছিলেন হাক্সলের শিষ্য পরম নাস্তিক, কিন্তু এখন তাঁর ধর্মনিষ্ঠা দেখে মন্দিরের পূজারী চাকরি যাবার আশঙ্কায় শঙ্কিত। মি 'ল' বইপত্তরকে ঘেন্না করতেন, কিন্তু আজকাল তিনি বড় বড় বই পড়ায় ডুবে থাকেন। মনে হয় সকলেই নম্রতা ও সদাচারের দেবতা। শর্মাজী গভীর রাত পর্যন্ত বেদ মন্ত্র পাঠ করেন, মৌলবীদের তো নমাজ ভিন্ন কোন কাজই নেই। সকলেই ভাবলেন যে একমাসের তো ব্যাপার, কোন রকমে কার্য সিদ্ধ হলে তাঁদের আর পায় কে।

কিন্তু মানুষের সেই পাকা বুড়ো জহুরী সবার আড়াল থেকে

খুঁজে চলেছেন এই বকের দলের মধ্যে হাঁসটি কোথায় লুকিয়ে আছে।

একদিন নতুন ফ্যাশন প্রেমীদের মাথায় ঝোঁক চাপলো আপসে এক হকি খেলা হোক্। এই প্রস্তাবে হকি খেলোয়াড়রা আনন্দিত হলেন। এটাও তো একটা গুণ। এটাকেই বা কেন লুকিয়ে রাখা? হাতের এই কৌশলটাই হয়তো কাজে লেগে যেতে পারে। অবশেষে মাঠ তৈরী হল, খেলাও শুরু হল, আর বলটা যেন কোন দপ্তরের শিক্ষানবীশীর মত ঠোকর খেয়ে খেয়ে ফেরে।

দেশীয় রাজ্য দেবগড়ে এই খেলার কথা এক আশ্চর্যের বিষয়। শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা গাম্ভীর্যপূর্ণ তাস-পাশায় মগ্ন থাকেন। দৌড় ঝাঁপকে শিশুর খেলা মনে করতেন

অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে খেলা শুরু হল। ধাবমান ব্যক্তিরা যখন বল নিয়ে জোরে দৌড়চ্ছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল যেন একটা ঢেউ এগিয়ে চলেছে। অপর পক্ষ লোহার দরজার মত এই দুরন্ত ঢেউ এর পথ রোধ করলেন।

সন্ধ্যে পর্যন্ত খেলা চলল। সকলে ঘেমে চান করে গেলেন। চোখে মুখে রক্তের গরম ফুটে উঠল। বেদম হাঁফাতে লাগলেন, তবুও হারজিতের মীমাংসা হল না।

অন্ধকার হয়ে এল। ময়দানের কিছু দূরে একটা খাল আছে। তার ওপর কোন পুল নেই। পথিকরা সেই খাল হেঁটে অতিক্রম করে। খেলা শেষ হয়ে গেছে, খেলোয়াড়েরা কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নিচ্ছেন। এমন সময়ে একজন চাষী আনাজ ভর্তি গরুর গাড়ি নিয়ে এই খালের মধ্যে দিয়ে আসছিল। কিন্তু একে তো নালাতে কাদা, তার ওপর পাড়ের চড়াই এত খাড়া যে সে কিছুতেই গাড়িটাকে ওপরে ওঠাতে পারছিল না। চাষী কখনো বলদ দুটোকে হাঁকাচ্ছে, কখনো আবার নিজ হাতে চাকা ঠেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু গাড়ির বোঝা বেশ ভারি আর বলদ দুটোও খুব দুর্বল। গাড়ি ওপরে ওঠে না, কিছুটা

উঠলেও আবার গড়িয়ে নীচে চলে আসে। চাষী বার বার চেষ্টা করছে, বলদ গুলোকে ঠেঙাচ্ছে, তবুও গাড়ির ওপরে ওঠবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। হতভাগা চাষী নিরাশ হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল, কিন্তু কোনও সাহায্যকারী চোখে পড়ল না। গাড়ি ছেড়েও সে কোথাও যেতে পারে না। নিজেকে বড় বিপন্ন মনে হচ্ছে। ইতিমধ্যে হকির লাঠি হাতে খেলোয়াড়রা ঘুরতে ঘুরতে সেদিকে চলে এলেন। চাষী তাঁদের দিকে সঙ্কোচের চোখে দেখল কিন্তু তাঁদের কাছে সাহায্য চাইবার সাহস হল না। খেলোয়াড়রা চাষীটিকে দেখলেও তাঁদের চোখে সহানুভূতির চিহ্ন মাত্র ছিল না। তাঁরা স্বার্থ ও অহঙ্কারে মত্ত কিন্তু উদারতা ও বাৎসল্যের প্রতি উদাসীন।

কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন একজন ছিলেন যাঁর হৃদয় দয়া ও সাহসে পরিপূর্ণ। হকি খেলতে খেলতে তাঁর পায়ে চোট লেগেছিল। তিনি একটু দূরে আস্তে আস্তে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছিলেন। হঠাৎ চাষী ও তার গাড়ির দিকে তাঁর নজর গেল। তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। একবার তাকিয়েই চাষীর অবস্থা অনুমান করতে পারলেন। হকির লাঠি একদিকে রেখে, কোট খুলে চাষীর কাছে গিয়ে বললেন, "আমি তোমার গাড়ি উঠিয়ে দেব কি ?"

চাষী তার সামনে সুগঠিত লম্বা মুখযুক্ত এক ব্যক্তিকে দেখতে পেল। নত হয়ে বলল,—"হুজুর ? আপনাকে কি করে বলি ?"

যুবক বললেন,—"মনে হচ্ছে, তুমি অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছ। তুমি ওপরে গিয়ে বলদ গুলোকে হাঁকাও, আমি চাকা ঠেলছি, তাহলেই গাড়ি ওপরে উঠবে।"

চাষী ওপরে গাড়িতে গিয়ে বসল। যুবক অত্যন্ত জোরের সঙ্গে চাকা ঠেললেন। অত্যন্ত কাদায় ভর্তি চাকা দুটো মাটিতে ঢুকেছিল। কিন্তু শক্তি পরাজয় স্বীকার করল না। আবার বলপ্রয়োগ করলেন, ওদিকে চাষীও বলদ দুটোকে হাঁকাতে লাগল। এবার

বলদ দুটোর সাহায্য মিলল। কাঁধ ঝুঁকিয়ে জোরে টানতেই গাড়ি পাড়ের ওপর উঠল।

চাষী যুবকের সামনে হাতজোড় করে বলল, "হুজুর, আপনি আজ আমাকে উদ্ধার করেছেন, না হলে আজ সারারাত আমাকে এখানেই কাটাতে হত।"

যুবক হেসে বললেন, "এখন আমার পুরস্কার কোথায়?" ভক্তি-ভাবে চাষী বলল, "নারায়ণের ইচ্ছায় আপনিই হয়তো দেওয়ানের পদ পাবেন।"

চাষীকে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখলেন যুবক। তাঁর মনে সন্দেহ হল, ইনিই সর্দার সুজান সিংহ নয়তো? গলার স্বরে এবং চেহারায় সেই ভাবই পরিস্ফুট। চাষীও তাঁর দিকে গভীর দৃষ্টিতে দেখল। সম্ভবতঃ তার মনে সন্দেহ বদ্ধমূল হল। স্মিতহাস্যে বলল—"সাগরের গভীরে ডুব দিলে তবেই তো মুক্তো মেলে।"

অবশেষে একমাস পূর্ণ হল। নির্বাচনের দিন এল। নির্বাচন প্রার্থীরা প্রাতঃকালেই স্ব স্ব ভাগ্যের মীমাংসা শুনতে উৎসুক। দিন আর কাটতে চায় না। প্রত্যেকের হৃদয়ই আশা নিরাশায় দোলায়মান। আজ কার ভাগ্য খুলবে কেউ জানে না। লক্ষ্মীর কৃপা দৃষ্টির কথা সকলেরই অজানা।

সন্ধ্যায় রাজার দরবার বসল। শহরের উচ্চপদস্থ, ধনী ব্যক্তিরা, রাজকর্মচারী দরবারী ও দেওয়ানত্ব প্রার্থীরা নানারকম জমকালো পোশাকে সেজেগুজে এলেন। নির্বাচন প্রার্থীদের হৃদকম্প শুরু হল।

তখন সর্দার সুজান সিংহ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, নির্বাচন প্রার্থি-গণ, আমি আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি, এজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। এই পদের জন্য একজন দয়ালু অথচ আত্মবলে বলীয়ান পুরুষের আবশ্যক। সৌভাগ্যবশতঃ উদার হৃদয় এবং আত্মবল ও সাহসের সঙ্গে বিপদের সম্মুখীন হতে পারে এমন একজন পুরুষের

সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সংসারে এই গুণ বিরল হলেও তাঁরা খ্যাতি ও সম্মানের শিখরে আসীন। তাঁরা আমাদের নাগালের বাইরে। এই রাজ্যের পণ্ডিত ব্যক্তি জানকীনাথকে দেওয়ান পদ প্রাপ্তির জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।

রাজ্যের কর্মচারীরা ও জমিদারগণ জানকীনাথের দিকে তাকালেন। কিন্তু তাদের কারো চোখে ছিল শ্রদ্ধা, কারো চোখে ছিল ঈর্ষার আগুন।

সর্দারজী আবার বললেন,—"আপনারা নিশ্চয়ই একথা অস্বীকার করবেন না যে, যে ব্যক্তি নিজে আহত হওয়া সত্ত্বেও এক গরীব চাষীর মাল বোঝাই গাড়ি কাদা থেকে খালের ওপর ওঠাতে সাহায্য করল তাঁর হৃদয়ে রয়েছে সাহস, আত্মবল ও উদারতা।

এমন একজন মানুষ কখনো গরীবদের কষ্ট দেবেন না। এমন মানুষের সঙ্কল্প হয় দৃঢ়, যা তাঁর চিত্তকে রাখবে দৃঢ়। তিনি নিজে প্রতারিত হলেও দয়া ও ধর্ম থেকে কখনো বিচ্যুত হন না।

আমার জন্মভূমি

আজ পুরো ষাট বছর বাদে আমার স্বদেশ, প্রিয় জন্মভূমিতে ফেরবার সৌভাগ্য হল। যে সময় আমি আমার প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বিদায় নিয়েছিলাম এবং ভাগ্য অন্বেষণে পশ্চিম দেশে ছুটেছিলাম, তখন আমি নবযুবক। আমার শিরা-উপশিরায় তখন তাজা রক্ত খেলে বেড়াতো, আনন্দ আর উচ্চাকাঙ্ক্ষায় হৃদয় ছিল ভরপুর। কোন নিষ্ঠুর অত্যাচার বা জবরদস্ত ন্যায়-বিচার আমাকে প্রিয় হিন্দুস্থান থেকে পৃথক করতে পারে নি। উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর বড় বড় পরিকল্পনার আকর্ষণেই আমি দেশত্যাগ করেছিলাম। আমেরিকাতে আমি অনেক ব্যবসা করেছি, অনেক ধন দৌলত করেছি। ভাগ্যক্রমে এমন স্ত্রী পেয়েছি, সৌন্দর্যে যে অদ্বিতীয়া, সারা আমেরিকায় যার রূপের খ্যাতি, সে আমাকে ছাড়া আর কখনো কারো কথা চিন্তা করেনি। আমি মনেপ্রাণে ওকে ভালোবাসতাম আর সেও ছিল আমার সর্বকিছু আমাদের পাঁচটি ছেলে হল,—সুন্দর, হৃষ্টপুষ্ট, উত্তম, তারা সকলেই ব্যবসায় উন্নতি লাভ করলো। আর তাদের সুন্দর বাচ্চাগুলিকে যখন কোলে বসিয়ে আদর করছি, তখনই প্রিয় মাতৃভূমিকে শেষ দেখা দেখবার জন্য প্রস্তুত হলাম। আমার বিশাল সম্পত্তি, কর্তব্যপরায়ণ স্ত্রী, সুযোগ্য পুত্রের মত আমার হৃদয়ের টুকরোগুলো, অসংখ্য অমূল্য নিয়ম কানুন ছেড়ে স্বদেশের পথে পা বাড়ালাম। প্রিয় ভারতমাতাকে শেষ দর্শন করবো। অনেক বুড়ো হয়েছি, আর দশ বছর বাদেই শতবসে পা দেবো; তখন আমার একটিই সাধ আছে—"যেন মাতৃ-ভূমিতেই আমার মৃত্যু হয়।" এই সাধ আজকের নয়, যখন আমার স্ত্রী মিষ্টি কথা আর সুন্দর ব্যবহারে আমাকে তৃপ্ত করতো, তখনো আমার অন্তরে এই সাধ ছিল। যখন আমার জোয়ান ছেলেরা এসে

প্রণাম করতো তখনো আমার মনে একটা কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করতো। সেই কাঁটা এই ছিল যে, 'আমি স্বদেশ থেকে নির্বাসিত'। এই দেশ আমার নয়, আমি এই দেশের কেউ নই। ধন আমার, স্ত্রী আমার, ছেলেরা আমার, ভূ-সম্পত্তি আমার, কিন্তু যখনই সেই ভাঙ্গা-কাটা বাড়ী, চার-ছয় বিঘা পৈতৃক জমিজমা, ছেলেবেলার খেলার সাথীদের কথা মনে পড়ে যায়, তখন সমস্ত ধূমধামের মধ্যেও মনে পড়ে—সে সবই আমার স্বদেশে।

কিন্তু বোম্বাই বন্দরে জাহাজ থেকে নেমে যখন কোট-প্যান্ট পরা নাবিকদের মুখে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরেজী বুলি শুনলাম, ইংরেজী দোকান, ট্রাম মোটর গাড়ী নজরে পড়ল, রবারের চটি পায়ে, মুখে চুরুটওলাদের সঙ্গে ধাকধাক্কি হল আর রেলস্টেশন থেকে রেলগাড়ীতে চড়ে যাবার সময় পাহাড়ের গায়ে সবুজ শ্যামল গ্রামগুলোর বদলে হাজার হাজার খাড়ী হয়েছে দেখলাম তখন আমার চোখ জলে ভরে গেল। অনেক কাঁদলাম, এতো আমার স্বদেশে নয়, এ সেই দেশ নয় যা দেখবার জন্য এতদিন উন্মুখ হয়ে ছিলাম। এ অন্য কোন দেশ। এ আমেরিকা, এ ইংলিশস্থান, কিন্তু প্রিয় ভারতবর্ষ নয়।

জঙ্গল, নদী, পাহাড়, মাঠ-ময়দান পেরিয়ে রেলগাড়ী আমার প্রিয় গ্রামের ধারে এসে পৌঁছল। ফুল-পাতা, নদী-নালার প্রাচুর্যে এক সময় এই স্থান স্বর্গের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতো। গাড়ী থেকে নামতেই আমার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো—কখন আমি নিজের প্রিয় বাসভূমি দেখবো, ছোটবেলার প্রিয় সাথীদের সাথে মিলিত হবো। এখন আমি ভুলেই গেছি যে আমার বয়স নব্বই। যখন গ্রামের মধ্যে এলাম তখন আমার পা যেন আরো দ্রুত চলতে চাইছে, আমার হৃদয়ে তখন এমন এক খুশীর ঢেউ খেলতে লাগলো যা বর্ণনা করা আমার পক্ষে সাধ্যাতীত। সমস্ত কিছুই যেন চোখ দিয়ে গিলতে লাগলাম; আহা! এই তো সেই নালা যেখানে রোজ ঘোড়াকে স্নান করাতাম, নিজেরাও ডুব মারতাম—কিন্তু এখন এর চার পাশে কাঁটা তারের বেড়া, সামনে

এক বাংলো যেখানে দু'তিনজন ইংরেজ বন্দুকধারী টহল দিচ্ছে। নালায় স্নান করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গ্রামে গিয়ে ছেলেবেলার বন্ধুদের খোঁজ করলাম, কিন্তু হায় ভগবান, তারা সকলেই পরপারে চলে গেছে। কেউ আর বেঁচে নেই। সেই ভাঙ্গাচোরা ঝুপরি, যেখানে বছরের পর বছর খেলা করেছি, যা শৈশবের সমস্ত মজা আর আনন্দের আবীর হয়ে আছে, যার স্মৃতি আমার মনে এখনো উজ্জ্বল—সেখানে গিয়ে রাশিকৃত মাটির স্তূপ ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না, স্থানটি এখন আর জনবিরল নেই। চলতে ফিরতে অনেক লোক নজরে পড়ল যারা আদালত, খাজনা, থানাপুলিস নিয়ে কথাবার্তা বলছিল। তাদের চেহারা সব নির্জীব, যেন কোন গভীর চিন্তায় ডুবে আছে—আর দুনিয়া জোড়া হতাশায় যেন ভেঙ্গে পড়েছে। আমার বন্ধুদের মত সুন্দর, হৃষ্টপুষ্ট সতেজ যুবক কাউকে দেখলাম না। যে আঙ্গিনায় আমরা দেহচর্চা করতাম, সেখানে এখন একটা স্কুল হয়েছে, সেখানে রোগক্লিষ্ট শিশু-গুলোর মুখে অনাহারের ছাপ সুস্পষ্ট, তারা ছিন্ন পোশাকে বসে বসে ঢুলছে। না, না, এ আমার দেশ নয়। এই দেশ দেখবার জন্য আমি অতদূর থেকে ছুটে আসিনি। এ অন্য কোন দেশ, আমার প্রিয় মাতৃভূমি নয়।

এদিকে নিরাশ হয়ে আমি ঐ দালানটির দিকে চললাম যেখানে সন্ধ্যাবেলার আমার বাবা ও গ্রামের অন্যান্য বয়োবৃদ্ধরা একসাথে বসে হুঁকো টানতেন আর হাসি মস্করা করতেন। আমরাও সেখানে ডিগবাজী খেতাম। কখনো-কখনো সেখানে পঞ্চায়েতের বৈঠকও বসতো যাতে আমার বাবাই সরপঞ্চ হতেন। এই দালানটির পাশে একটি ঘর ছিল। সেখানে গ্রামের সমস্ত গরু থাকতো। বাছুরগুলোর সাথে আমরা হৈ-চৈ করতাম। হায়রে! এখন আর সেই দালানটির চিহ্ন পাওয়া গেল না। সেখানে এখন গ্রামের লোকদের টিকা দেবার জন্য একটা অফিস আর একটা ডাকঘর খোলা হয়েছে। তখন সেই দালানের লাগোয়া একটা আখপেষাই ঘানি ছিল সেখানে শীতকালে আখপেষাই

হ'ত আর গুড়ের গন্ধে চারিদিক ভরে যেত। আখপেষাইকারী শ্রমিকদের তেজী হাত দু'খানা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতাম আর ঘন্টার পর ঘন্টা আখের রস পাবার আশায় আমি ও আমার সঙ্গীরা সেখানে বসে থাকতাম। কতদিনই না সেখানে কাঁচারস আর গুড় খেয়েছি! আশে-পাশের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা ও শিশুরা নিজ নিজ ঘড়া নিয়ে আসত এবং এখান থেকে আখের রস ভরে নিয়ে যেত। সেই কলু যেমন ছিল তেমনিই আছে, কিন্তু সেই ঘানি আর নেই, সেখানে এখন পাটের সুতো তৈরির কল হয়েছে, তার সামনে হয়েছে একটা তামাক-সিগারেটের দোকান। চারিদিকে এত ছলনাময় দৃশ্য দেখে আমি অত্যন্ত দুঃখ পেলাম। তখন সামনে এক সুসজ্জিত সুন্দর যুবককে দেখে আমি বললাম, "বাবা আমি বিদেশী মুসাফির। রাত্রে থাকবার মত একটু জায়গা করে দেবে ?" যুবকটি আমার আপাদমস্তক ভাল ভাবে লক্ষ্য করে বলল—"আগে যাও, এখানে জায়গা নেই।"

আমি একটু এগিয়ে গেলাম। সেখান থেকেও নির্দেশ পেলাম,—'আগে যাও।' এই ভাবে পঞ্চমবার প্রার্থনা জানাবার পর এক সাহেব আমার হাতে একমুঠো ছোলা দিল। ছোলাগুলো আমার হাত থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল; চোখ দু'টো জলে ভরে গেল। হায়, এই কি আমার প্রিয় দেশ ? অন্য কোন দেশ ? অতিথি আপ্যায়নের জন্য জগৎজোড়া খ্যাতি মান আমার স্বদেশ এ নয়। কখনই নয়।

আমি এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে নির্জন স্থানে বসে বিগত দিনের কথা স্মরণ করতে লাগলাম। তখন হঠাৎ আমার খেয়াল হল, যখন আমি বিদেশ যাত্রা করি তখন এই গাঁয়েই একটা ধর্মশালা তৈরী হচ্ছিল। আমি ওদিক পানেই চললাম, সে রাতটা কোন ভাবে ওখানেই কেটে যাবে। কিন্তু হায়, ধর্মশালা অর্ধনির্মিত অবস্থায় যেমন ছিল তেমনিই পড়ে আছে, সেখানে গরীব মুসাফিরের কোন আশ্রয় নেই। ওখানে এখন মদ, জুয়ো, আর সমস্ত কু-কর্মের আড্ডা। এ অবস্থা দেখে আমার

বুক থেকে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, আমি জোরে চিৎকার করে উঠলাম—"না, না, হাজার বার না, এ আমার মাতৃভূমি, আমার স্বদেশ, আমার প্রিয় ভারতভূমি নয়। এ অন্য কোন দেশ। এ ইওরোপ, আমেরিকা, কিন্তু ভারত কখনই নয়।

রাত গভীর হয়েছে। শেয়াল-কুকুর চিৎকার শুরু করেছে। আমি ভগ্ন হৃদয়ে সেই নালার ধারে এসে বসলাম, আর ভাবতে লাগলাম এখন কি করা যায়? আমি কি আবার আমার ছেলেদের কাছে ফিরে যাবো? আমার মৃতদেহ আমেরিকার মাটিতেই বিলীন হয়ে যাবে? এখন তো স্বদেশ বলে আমার আর কিছু রইল না। আগে আমি মাতৃভূমি থেকে অনেক দূরে ছিলাম কিন্তু প্রিয় জন্মভূমির কথাই আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। এখন আমি মাতৃভূমি হীন, মাতৃভূমি বলে আমার নিজস্ব কিছু নেই। এইসব চিন্তা করতে করতে বসে বসেই অনেকক্ষণ কেটে গেল। জেগে জেগেই রাত শেষ হ'ল, ঘড়িতে তিনটে বাজল; হঠাৎ কি এক গানের সুর যেন ভেসে এল। হৃদয় নেচে উঠলো, এতো মাতৃভূমির বন্দনা, স্বদেশ-রাগ। ঝট্ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম পনেরো-কুড়ি জন স্ত্রীলোক শীর্ণকায়া বৃদ্ধা, সাদা থান পরে, ঘটি হাতে প্রাতঃস্নানে চলেছেন, সেই সঙ্গে গান গাইছেন—

'প্রভু, মেরে অওগুণ চিত্ ন ধরো।'

সেই ব্যাকুল করা গান শুনে আমার মনের যা অবস্থা হ'ল তা বর্ণনা করতে পারবো না। আমি আমেরিকার চঞ্চল থেকে চঞ্চলতর, সদা-হাস্যময়ী সুন্দরীদের 'রাগ-আলাপ' শুনেছি, তাদের কাছ থেকে প্রেম-ভালোবাসার এমন অনেক কথা বহুবার শুনেছি যা মাতাল করা গানের চেয়ে অনেক মিষ্টি। শিশুদের আধো আধো কথা শুনে অনেক আনন্দ পেয়েছি। আমি সুরেলা পাখীর মধুর কলরব অনেক শুনেছি। কিন্তু আজ এই গান শুনে যে আনন্দ, যে মজা, যে বিস্ময় লাভ করলাম—তা সারা জীবনে কখন কোথাও পাইনি। আমি নিজেই গুণগুণ করতে শুরু করে দিয়েছি—"প্রভু, মেরে অওগুণ চিত্ ন ধরো।"

তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ অনেক লোকের শব্দে চমক ভাঙলো। দেখি কিছু লোক হাতে পিতলের কমণ্ডলু নিয়ে শিব শিব, হর হর, গঙ্গা-গঙ্গা, নারায়ণ-নারায়ণ বলতে বলতে এগিয়ে চলেছে। আমার মন আবার আনন্দে নেচে উঠলো। এই তো আমার মাতৃভূমির স্বর। আমিও এদের সাথে ভিড়ে গেলাম আর হাঁটতে হাঁটতে এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয় মাইল পাহাড়ী রাস্তা পার হয়ে—সেই নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম যার নাম পর্যন্ত পবিত্র, যার জলে স্নান করা, দেহত্যাগ করা হিন্দুরা সবচেয়ে পুণ্য বলে মনে করে। সে আমাদের গঙ্গা—আমাদের গ্রাম থেকে ছয়-সাত মাইল দূর দিয়ে বয়ে চলেছে। একটা সময় ছিল যখন ঘোড়ায় চড়ে রোজ সকালে মা-গঙ্গাকে দর্শন করতে আসতাম। তাঁকে দর্শন করবার একটা গোপন কামনা সর্বদাই আমার ছিল। এখানে আমি হাজার হাজার লোককে এই কনকনে ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে দেখলাম। কিছু লোক বালির ওপর বসে গায়ত্রী জপ করছে। কিছু লোক হোম-যজ্ঞ করছে। কিছু লোক কপালে তিলক আঁকছে। কিছু লোক বেদমন্ত্র উচ্চারণ করছে। আমার হৃদয় আবার আনন্দে নেচে উঠল.—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো আমার দেশ, এই তো আমার প্রিয় জন্মভূমি, এই তো আমার ভারত। এই দেশকেই তো দেখতে এই দেশের মাটিতেই তো আমি বিলীন হয়ে যেতে চেয়েছি।

খুশীতে আমি পাগল হয়ে উঠলাম। আমি পুরনো কোট-প্যাণ্ট খুলে ছুঁড়ে ফেললাম, তারপর দৌড়ে গিয়ে মা-গঙ্গার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ঠিক যেন সারাদিন অন্যলোকের কাছে কাটানোর পর একটি অবুঝ-উদাস শিশু সন্ধ্যায় মায়ের কোলে ফিরে এল। এই তো আমি এখন আমার মাতৃভূমিকে দেখছি—এরা সকলেই আমার ভাই, সামনে এই তো আমার মা-গঙ্গা রয়েছেন।

গঙ্গার ঠিক পাশেই আমি একটা ছোট্ট ঘর করে নিয়েছি। রাম নাম জপ করা ছাড়া এখন আর আমার কোন কাজ নেই। রোজ সকাল-

সঙ্গে গঙ্গা-স্নান করি। মৃত্যুর পর আমার নশ্বর দেহ এই গঙ্গার জলে মিশে থাক—এই আমার শেষ ইচ্ছে।

আমার আদরের ছেলেরা, আমার স্ত্রী বারবার আমাকে ফিরে যেতে লিখছে, কিন্তু আমার প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে আমি আর ফিরে যেতে পারবো না। আমার মৃতদেহ আমি মা-গঙ্গাকে দিয়ে যাব। এখন আর পৃথিবীর কোন মোহ, কোন ইচ্ছা, কোন আকাঙ্ক্ষাই আমাকে প্রিয় মাতৃভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না, আমার মৃত্যু—আমার জন্মভূমিতেই হোক।

সাংসারিক প্রেম ও দেশ প্রেম

লণ্ডন শহরের এক পুরনো ভাঙ্গা-চোরা হোটেল, যেখানে সন্ধ্যা-বেলাই রাতের অন্ধকার নামে, যেখানে আধুনিক ফ্যাসানওয়ালা লোকেই সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়, মদ্যপান ও নানা জঘন্য কাজ চোখের সামনেই ঘটে থাকে, সেই হোটেলে বদলোকদের আড্ডায় ইতালীর বিখ্যাত দেশপ্রেমিক মৈজিনী চুপ করে বসে আছেন। তাঁর সুন্দর চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চোখে মুখে গভীর চিন্তার ছাপ, ঠোঁট শুক্‌নো, সম্ভবতঃ মাসখানেক দাড়ি কামান নি। জামা-কাপড় ময়লা-কুঁচকানো। যে ব্যক্তি মৈজিনীকে প্রথম থেকে জানেন না তিনি তাঁর বর্তমান অবস্থা দেখলে নিশ্চিত এই ধারণা করবেন যে, তিনি সেই সব অভাগাদের মধ্যে পড়েন যারা নিজেদের বাসনার গোলাম হয়ে জঘন্য থেকে জঘন্যতম কুকর্মে লিপ্ত আছেন।

মৈজিনী নিজের চিন্তায় ডুবে আছেন। হায়রে অভাগা জাতি, হায়রে ইতালী! তোর ভাগ্য কি কখনো ফিরবে না! তোর শত শত সুযোগ্য পুত্রের রক্তে কি পরিবর্তন আসবে না! তোর দেশ থেকে

নির্বাসিত হাজার হাজার দেশপ্রেমীর দীর্ঘশ্বাসের কি কোন প্রভাব নেই। তুই কি চিরকাল অন্যায়, অত্যাচারের গোলাম হয়ে কাটাবি? সম্ভবতঃ তোর কপালে এখনও অনেক অপমান, অনেক দুর্গতি লেখা আছে। স্বাধীনতা, হায়রে স্বাধীনতা। তোর জন্য আমাদের কত বন্ধু, কত প্রাণের দোস্ত আত্মোৎসর্গ করেছে। কত জোয়ান, বাড়ন্ত যুবকের মা-বউরা আজ তাদের কবরের পাশে বসে নিঃশব্দে অশ্রু বিসর্জন করছেন, আর নিজেদের এত দুঃখ-কষ্ট বিপদের কারণ হিসাবে মৈজিনীকে অভিশাপ দিয়ে চলেছেন। সেই সব বাঘের মত বীর ছেলেরা, যারা শত্রুর নিকটে পিছু হট্‌তে জানত না, তাদের এত আত্মোৎসর্গ কি যথেষ্ট হয়নি? স্বাধীনতা, তুই এত মূল্যবান? তাই যদি হয় তবে আমিও কেন বেঁচে আছি? আমার মাতৃভূমি, প্রিয় স্বদেশ, অত্যাচারী, শয়তানের পায়ের তলায় পিষে মরবে, আমার প্রিয় ভাই, প্রাণের সাথীরা অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট হবে—এই সব দেখতেই কি বেঁচে রয়েছি! না এইসব দেখবার জন্য আমি বেঁচে থাকতে পারব না।

মৈজিনী এত গভীর চিন্তায় ডুবে ছিলেন যে তার বন্ধু রফেতি, যিনি তার সাথে স্বদেশ থেকে নির্বাসিত, কখন ঘরে প্রবেশ করেছেন টেরই পাননি। রফেতী তাহার বন্ধুর চেয়ে বয়সে দু-চার বছরের ছোট হবেন। তাঁর আচার ব্যবহারে সজ্জনতার ছাপ সুস্পষ্ট। তিনি মৈজিনীর কাঁধে হাত রেখে একপাশে ঠেলে বললেন, "জোজেফ্, এই নাও কিছু খেয়ে নাও।"

মৈজিনী চমকে উঠে দেখলেন বিস্কুট, বললেন, "এটা কোথেকে নিয়ে এলে? পয়সা পেলে কোথায়?"

রফেতী—"আগে খাওতো, তারপর প্রশ্ন ক'রো। কাল সন্ধ্যে থেকে তুমি কিছুই খাওনি।"

মৈজিনী—"আগে বলো, কোথেকে পেলে। পকেটে সিগ্রেটের প্যাকেটও দেখতে পাচ্ছি। এমন অবস্থা ফিরল কিভাবে?"

রফেত্তী—"জেনে কি করবে? মা যে নতুন কোটখানা পাঠিয়েছিলেন সেটা বন্ধক রেখে এলাম।"

মৈজিনী একটু ঠাণ্ডা শ্বাস নিলেন, চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল টপ্‌ টপ্‌ করে। কান্না ভেজা স্বরে বললেন, "এ তুমি কি করলে, বড়দিন আসছে, সেদিন কি করবে? ইতালীর একজন লাখপতি ব্যবসায়ীর একমাত্র পুত্র কি একটা ছেঁড়া-ফাটা পুরনো কোট পরে বড়দিন কাটাবে? অ্যাঁ?"

রফেত্তী—"কেন তার মধ্যে আর কিছু আসবে না? তাই দিয়ে আমরা দুজন নতুন একজোড়া বানাবো, আর স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে সেদিন আনন্দ করব।"

মৈজিনী—"আর কিছু আমদানী হবার তো কোন লক্ষণ দেখছি না। মাসিক পত্রিকার যে লেখাটা পাঠিয়েছিলাম সেটা ফেরত এসেছে। বাড়ি থেকে যা কিছু পেয়েছিলাম তাও কবে শেষ হয়ে গেছে। এখন আর কি উপায় আছে?"

রফেত্তী—"এখনও বড়দিনের এক সপ্তাহ বাকি। এখন থেকে তার জন্য চিন্তা করতে হবে না। আর কোট যদি নাই পরি তাতে কি হয়েছে? আমার অসুখের সময় তুমি যে ডাক্তারের ফী দিতে তোমার মেগডলীনের আংটিটা বেচে দিলে? আমি শিগ্‌গির তাঁকে জানাচ্ছি, দেখনা তোমার কি অবস্থা হয়!"

দুই

বড়দিন। লণ্ডনের চারিদিকে খুশীর আমেজ। ছোট-বড়, আমীর, গরীব সকলেই নিজের নিজের বাড়িতে আনন্দে মেতেছে। সবচেয়ে ভালো পোশাক পরে গীর্জার দিকে চলেছে। কাউকেই উদাস—দুঃখী মনে হচ্ছে না। এই সময় মৈজিনী আর রফেত্তী সেই অন্ধকারে হোটেল ঘরে মাথা ঝুঁকিয়ে চুপ করে বসে আছেন। মৈজিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন আর রফেত্তী মধ্যে মধ্যে দরজার কাছে উঠে গিয়ে মদ্যপায়ী মাতাল-

গুলোকে দেখছেন—অন্য দিনের চেয়ে একটু আলাদা ভাবে থেকে নিজেদের দারিদ্র্য অভাব ভুলে থাকবার কি বিচিত্র প্রয়াস। হায়!

যার এক ডাকে হাজার হাজার লোক নিজেদের রক্ত নদী বইয়ে দিতে প্রস্তুত, আজ এমনিই অবস্থা যে সেই লোকের খাবারের কোন সংস্থান নেই। এমন কি আজ সকাল থেকে একটা সিগ্রেটও তিনি খান্‌নি। তামাক ছিল তাঁর কাছে দুনিয়ার এমন এক বস্তু যার থেকে তিনি কখনো হাত গুটিয়ে নিতেন না। কিন্তু আজ সে ভাগ্যও নেই। কিন্তু এখনও তিনি নিজের জন্য চিন্তা করছেন না। চিন্তা হচ্ছে রফেতীর জন্য; সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, জোয়ান রফেতীর চিন্তা তাঁকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। তিনি ভাবছেন, তাঁর কি অধিকার আছে যে এমন জোয়ান বীর, যাকে সমস্ত দুনিয়া স্বাগত জানাচ্ছে, তাকে নিজের এই প্রচণ্ড দুঃখ কষ্টে সাথী করে রেখে দেবেন।

এমন সময় একজন ডাকপিওন প্রশ্ন করল—"জোজেফ মৈজিনী কে আছেন। চিঠি নিয়ে যাবেন।"

রফেতী চিঠি নিয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, "জোজেফ, এ তো মেগডলীনের চিঠি।"

মৈজিনী চট্ করে চিঠিটা নিয়ে নিলেন, উদ্বেগ ভরে খুলতে লাগলেন। চিঠি খুলতেই একগুচ্ছ চুল মাটিতে পড়ল—মেগডলীনের তরফ থেকে বড়দিনের উপহার। মৈজিনী সে গুচ্ছটি তুলে নিয়ে চুমু খেলেন, তারপর সযত্নে জামার বুকপকেটে রেখে দিলেন। চিঠি পড়লেন—

মাই ডিয়ার জোজেফ,

এই ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ কোরো। ভগবান তোমাকে একশ' বড়দিন দেখবার সৌভাগ্য দিন। এই স্মৃতিটুকু সর্বদাই নিজের কাছে রেখো, আর মেগডলীনকে ভুলো না। আমি আর কি লিখব। আমার হৃদয় ভেঙে পড়ছে। হায় জোজেফ, আমার প্রিয়তম, আমার স্বামী, আমার প্রভু জোজেফ আমাকে আর কতদিন ব্যাকুল করে রাখবে।

এখনও শেষ হ'ল না। চোখ জলে ভরে যাচ্ছে। আমিও তোমার সঙ্গে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করব, না খেয়ে মরব, সে সব সহ্য হবে, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে বাঁচতে পারব না। তোমাকে শপথ করে, নিজের ধর্মকে শপথ করে, স্বদেশকে শপথ করে বলছি তুমি এখানে ফিরে এসো, আঁখি দু'টি অধীর হয়ে উঠেছে, কবে তোমাকে দেখব। বড়দিন এসে গেল আমার জন্য চিন্তা করো না, যতদিন বেঁচে থাকব তোমারই থাকব!

তোমার—
মেগডলীন।

তিন

মেগডলীনের বাড়ি সুইজারল্যাণ্ডে। সে এক বিখ্যাত ব্যবসায়ীর অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যা। মানসিক সৌন্দর্যেও তার জুড়ি মেলা ভার। কত জমিদার, আমীর তার জন্য পাগল, কিন্তু সে কাউকেই ধর্তব্যের মধ্যে মনে করে না। ইতালী থেকে পালিয়ে মৈজিনী প্রথমে সুইজারল্যাণ্ডে আশ্রয় নেন্। মেগডলীন তখন পরিপূর্ণ যুবতী। মৈজিনীর সাহস আর আত্মোৎসর্গের কথা সে আগেই শুনেছিল। কখনো কখনো মায়ের সাথে সে মৈজিনীর কাছে যেত। ধীরে ধীরে তাদের মেলামেশা এত গভীর হল, মৈজিনীর স্বভাব সৌন্দর্য তার হৃদয়ে এত গভীর প্রভাব বিস্তার করল যে মৈজিনীর প্রতি তার প্রেম গাঢ় রূপ নিল। একদিন সে নিজেই সমস্ত লজ্জা-শরমের বালাই চুলোয় দিয়ে মৈজিনীর পায়ের ওপর মাথা রেখে বলল,—"আমায় আপনাকে সেবা করবার অধিকার দিন।"

মৈজিনীর দেহেও তখন পরিপূর্ণ যৌবন। দেশের চিন্তাও তাঁর হৃদয়াবেশকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। যৌবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর হৃদয়ে কঠিন দাবি জানাতে লাগল, কিন্তু তিনি সঙ্কল্প করেছেন যে, "দেশের জন্য, জাতির জন্য আমার দেহ-মন উৎসর্গ করব।" এই সঙ্কল্পে

তিনি ছিলেন অটল। এমন একজন অপূর্ব সুন্দরীর মিষ্টি আবদারে প্রতিজ্ঞাচ্যুত না হবার মত সামর্থ্য, সাহস একমাত্র মৈজিনীরই ছিল।

মেগডলীন ছলছল চোখে উঠে পড়ল, কিন্তু নিরাশ হ'ল না। এই অসফলতায় তার হৃদয়ে প্রেমের আগুন দ্বিগুণ তেজে প্রজ্জ্বলিত হল। আর মৈজিনী আজ কয়েক বছর হল সুইজারল্যাণ্ড ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞাপূর্ণকারিনী মেগডলীন এখনও মৈজিনীকে ভোলেনি। দিন দিন তার প্রেম আরো গভীর আরও সাচ্চা হয়ে উঠছে।

মৈজিনী চিঠি পড়া শেষ করলেন। একটা গভীর শ্বাস ফেলে রুফেত্তীকে বললেন, "শুনলে তো, মেগডলীন কি বলেছে?"

রুফেত্তী—"বেচারীর প্রাণ নিয়ে তুমি খেলা করছো।"

মৈজিনী আবার চিন্তায় ডুবে গেলেন—"মেগডলীন, তুমি নব্যযুবতী, সুন্দরী, ভগবান তোমাকে অশেষ সম্পদ দিয়েছেন। তুমি কেন এক গরীব, দুঃখী, কাঙাল, ফক্কড়, বিদেশী ভবঘুরের জন্য নিজের জীবন ধূলোয় মিশিয়ে দিচ্ছ। আমার মত লম্পট দুঃখী কি করে তোমাকে সুখে রাখবে? জগতে এমন অনেক হাসিখুশী, সম্ভ্রান্ত যুবক আছেন, যাদের কেউ তোমাকে সুখে রাখতে পারবেন, যারা তোমাকে পূজো করবেন। কেন তুমি তাদের মধ্যে থেকে কাউকে নিজের গোলাম করে নিচ্ছ না। আমি তোমার প্রেম, সত্যবাদিতা, সৌন্দর্য এবং নিঃস্বার্থ প্রেমকে সম্মান করি। কিন্তু আমার মত একজনের কাছে, যার জীবন দেশ ও জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত, তুমি একজন সহানুভূতি সম্পন্না আদরের বোন ছাড়া বেশী কিছু হ'তে পারো না। আমার মধ্যে এমন কি বিশেষত্ব আছে, এমন কি গুণ আছে যে তোমার মত একজন দেবী আমার জন্য এত কষ্ট সহ্য করবে। হায়রে মৈজিনী, দুর্ভাগা মৈজিনী তুই কারুরই হতে পারলি না। যার জন্য তুই নিজেকে উৎসর্গ করলি সেই তোকে আজ ঘৃণা করে। যে তোর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন সে মনে করে তুই স্বপ্ন দেখছিস্।"

এই সব চিন্তা করতে করতে অধৈর্য হয়ে শেষ পর্যন্ত মৈজিনী কলম-দোয়াত বের করে মেগডলীনকে চিঠি লিখতে শুরু করলেন।

চার

"ভালোবাসার মেগডলীন,

ঐ অমূল্য উপহারটি নিয়ে তোমার পত্র এসে পৌঁছেচে। আমার মত একজন শক্তিহীন অসহায় লোককে যে তুমি এমন উপহার প্রদানের যোগ্য মনে করেছ এ জন্য আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি চিরকাল এর কদর করব। এক নিঃস্বার্থ, অমর প্রেমের স্মৃতি হিসাবে সারাজীবন থাকবে। আর যখন এই জীবন আর থাকবে না, তখন আমার শেষ ইচ্ছা হিসাবে এই উপহার কবরে আমার পাশেই থাকবে। আমি নিজেই সেই শক্তির কথা আন্দাজ করতে পারছি না যে জগতে চারিদিকে যেখানেই আমার মত বজ্জাত অহঙ্কারী পড়ে আছে—সেখানেই এমন একজন সুন্দরী স্ত্রীলোক নিশ্চয়ই আছেন যিনি খারাপ অপেক্ষা আমার শুভ প্রচেষ্টাগুলোর প্রতি সত্যকারের নিষ্ঠাবতী, সুতরাং তুমি নিশ্চিত যে এই কঠিন পরীক্ষায় আমি সাফল্যমণ্ডিত হব।

কিন্তু প্রিয় ভগিনী, আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না। আমার দুঃখের কথা চিন্তা করে তুমি দুঃখ পেয়ো না। আমি বেশ আরামেই আছি। তোমার প্রেমের মত অক্ষয়নিধি লাভ করে যদি সামান্য শারীরিক কষ্টে কাঁদতে বসি তবে আমার মত অভাগা আর কে আছে?

শুনলাম তোমার সুখ-শান্তি দিন দিন আরো কমে যাচ্ছে। আমার কি অধিকার আছে যে তোমাকে দেখবো। যদি স্বাধীন হতাম, যদি যোগ্যতা থাকতো তবে নিশ্চয়ই তোমাকে উপহার পাঠাতাম। কিন্তু এই মরা, উদাস হৃদয় তোমার যোগ্য নয়। মেগডলীন, ঈশ্বরের শপথ, নিজের প্রতি নজর রাখো, আমি বোধহয় অন্য কিছুতে এরচেয়ে বেশী কষ্ট

পাবো না—আমার স্নেহের মেগডলীন কষ্টে আছে, এবং আমার জন্যই তার এই দশা, শুনলে ব্যথা পাব। তোমার চেহারার দশা যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে! মেগডলীন, দেখো, নারাজ হ'য়ো না। খোদার কসম যে, আমি তোমার যোগ্য নই। আজ বড়দিন, তোমাকে কি উপহার পাঠাই! খোদা তোমায় চিরকাল নিজের অসীম স্নেহচ্ছায়ায় রাখুন। মাকে প্রণাম জানালাম। তোমায় দেখবার ইচ্ছা আছে। দেখি কবে তা পূরণ হয়।

তোমার—

জোজেফ।

পাঁচ

এই সব ঘটনার পর অনেকদিন কেটে গেছে। জোজেফ মৈজিনী আবার ইতালী ফিরে এসেছেন এবং রোমের প্রথমবার জনতার রাজ্যের পত্তন করলেন।

রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যে তিনজন নির্বাচিত হয়েছেন তাদের মধ্যে মৈজিনীও একজন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রান্সের অত্যাচারে এবং পিড্‌মণ্টের বাদশাহের দাঙ্গাবাজীতে এই জনতার রাজ্য শেষ হয়ে গেল। এর কর্মচারী ও মন্ত্রীরা প্রাণ নিয়ে পালাল। নিজের বিশ্বস্ত বন্ধুদের প্রতারণা আর চক্রান্তের ফাঁদে পড়ে মৈজিনী; ক্লান্ত ব্যর্থ মৈজিনী রোমের অলিতে-গলিতে বৃথাই ঘুরে বেড়ালেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল রোমে একদিন তিনি জনতার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। তাঁর স্বপ্ন পূর্ণ হয়েও আবার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

একদিন দুপুরবেলা রদ্দুরে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত, হতাশ মৈজিনী এক গাছতলায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় সামনে এক মহিলাকে আসতে দেখলেন—শীর্ণ চেহারা, সাদা পোশাক—বয়স তিরিশের বেশী। মৈজিনী চমকে উঠে বললেন, "মেগডলীন, তুমি! বলতে বলতে

তাঁর চোখ জলে ভিজে গেল। মেগডলীন কেঁদে ফেলল,—"জোজেফ" আর কিছু সে বলতে পারলো না।

দুজনে নিঃশব্দে কয়েক মিনিট কাঁদলেন। শেষে মৈজিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "মেগা, তুমি এখানে কবে এসেছো?"

মেগডলীন—"মাসখানেক হল আমি এখানে এসেছি, কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা করবার কোন সুযোগ পাইনি। দেখলাম তুমি নিজের কাজের মধ্যে ডুবে আছ—আর ভাবলাম আমার মত কোন সহানুভূতি-শীলা নারীর প্রয়োজন তোমার ফুরিয়ে গেছে—তাই তোমার সঙ্গে দেখা করা জরুরী মনে করিনি। (একটু থেমে) কেন জোজেফ, এর কারণ কি যে সব লোকেই তোমার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করছে? তারা কি অন্ধ? ভগবান কি ওদের চোখ দেননি?"

জোজেফ—"মেগা, বোধহয় ওদের কথাই ঠিক। আপাততঃ আমার আর সেই গুণ নেই যে জ্বালাময়ী ভাষায় সকলকে ডেকে বলব—তোমরা যে সরলতা, পবিত্রতার কথা বলবে তা আমার মধ্যেও আছে, বুঝতে পারছি দিন দিন আমি অক্ষম হয়ে পড়ছি।"

মেগডলীন—"যেদিন তুমি যোগ্য হবে সেইদিনই আমি তোমার পূজা করব। শুভেচ্ছা তাকেই জানান চলে যে সবকিছুর চেয়ে নিজেকে তুচ্ছ মনে করে। জোজেফ, ভগবানের জন্য আমাকে তোমার কাছ থেকে এই ভাবে দূরে সরিয়ে রেখো না। আমি তোমারই হয়ে গিয়েছি। আমার বিশ্বাস আমাদের যে ইচ্ছা ছিল সে অনুসারে তুমি প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছ। এই বিশ্বাস আমার মনে গেঁথে গেছে, যদিও তা কিছুটা কমজোরী হয়ে পড়েছিল তাহলেও তোমার এইসব কথাবার্তায় তা আবার পাকা হয়ে গেল। নিঃসন্দেহে তুমি ইশ্বরের দূত। আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে এ দুনিয়ার একজন, বিশেষতঃ যাদের আমি সম্মানীয় মনে করতাম তারা এতই অন্ধ, এতই কৃতঘ্ন। রুফেতী, রসারীনো, পলাইনো, বর্নাবাস সকলেই তোমার বন্ধু ছিলেন। তুমি তাদের সকলকেই বন্ধু মনে করতে, কিন্তু তারা সকলেই তোমার দুশমন। তোমার

সম্পর্কে তারা আমার কাছে এমন অনেক কথা বলেছে, যা মরে গেলেও আমি বিশ্বাস করতে পারব না। ওরা সকলে মিথ্যে বক্‌ছে, আমার প্রাণের জোজেফ তেমনিই আছে যেমনটি আমি মনে করি বরং তার চেয়েও ভালো। এটাও তোমার একটা গুণ নয় কি তুমি নিজের শত্রুদের বন্ধু বলে ভাব ?"

জোজেফ আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। মেগডলীনের শীর্ণ হাতে চুমু খেয়ে বললেন—"আমার ভালোবাসার মেগা, আমার বন্ধুরাই ঠিক, আমিই দোষী। (কেঁদে ফেললেন) যা কিছু তাঁরা বলেছেন সব আমার ইচ্ছা ও মর্জি অনুসারেই বলেছেন। আমি তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, কিন্তু স্নেহের বোন, এ শুধুমাত্র এইজন্য যে তুমি আমার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে চলে গিয়ে নিজের বাকি জীবনটা খুশী আর আনন্দে কাটাও। আমি লজ্জিত। আমি তোমাকে এতটুকুও বুঝতে পারিনি। তোমার প্রেমের গভীরতার কাছে অপরিচিতই থেকে গেলাম কেননা, আমি যা চেয়েছিলাম তার উল্টো ফল হল। মেগা আমাকে ক্ষমা কোরো।"

মেগডলীন—"হায় জোজেফ, তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাইছ ! জগতের সমস্ত মানুষের চেয়ে তুমি অনেক সুন্দর, অনেক খাঁটি, অনেক বেশী যোগ্য। কিন্তু হাঁ। জোজেফ, দুর্ভাগ্য আমার, তুমি আমাকে এতটুকুও বুঝতে পারনি। এটিই তোমার ত্রুটি। তোমার হৃদয় পাথরের মত এমন কঠিন হ'ল কি করে তাই ভেবে আমি তাজ্জব বনে যাই।"

জোজেফ—"মেগা, রক্ষেতীকে যখন এই সমস্ত শিখিয়ে, বুঝিয়ে তোমার কাছে পাঠাই তখন আমার মনের কি অবস্থা হয়েছিল তা, একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। আমি, যে কিনা দুনিয়াতে 'যশ'কেই সবচেয়ে মূল্যবান মনে করি, আমি, যে কিনা শত্রুকে কখনো ছেড়ে দেয় না, সেই আমি নিজের মুখেই আমাকে 'খারাপ' বলতে শেখালাম। কিন্তু এ শুধু এই জন্য যে তুমি নিজের শরীরের প্রতি যত্নবান হও, আমাকে ভুলে যাও।"

মৈজিনী আবার ইংলণ্ডে চলে গেলেন। সেখানে আলসের মত দিন কাটাতে লাগলেন। ১৮৭০ সালে তাঁর কাছে খবর এল যে সিসিলির বিদ্রোহীরা তৎপর হয়েছে এবং সেখানে যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য একজন ক্ষমতাবান যুবকের প্রয়োজন। ব্যস, তিনি তৎক্ষণাৎ সিসিলি ছুটলেন, কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে শাহী সৈন্যরা বিদ্রোহীদের দমন করেছে। মৈজিনী জাহাজ থেকে নামতেই তাঁকে গ্রেফ্তার করে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। তখন তিনি বেশ বুড়ো হয়ে পড়েছেন। শাহী হাকিমেরা ভয় পেলেন যে মৈজিনী সম্ভবতঃ জেলখানার কষ্ট ভোগ করতে পারবেন না, আর যদি তিনি মারা যান তো দেশের জনগণ ভাববে যে বাদশাহ তাঁকে হত্যা করেছেন। তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল। হতাশা আর ভগ্নহৃদয় নিয়ে মৈজিনী আবার সুইজারল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। জীবনে তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সন্দেহ নেই যে ইতালীর একতাবদ্ধ হবার সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে, কিন্তু অস্ট্রিয়া বা নেপোলিয়নের শাসনকালে দেশের অবস্থা যেমন ভাল ছিল তার সময়ে সেরকম ছিল না। তফাত হল এই যে প্রথমে তিনি বিদেশী সামন্তদের কাছে নিপীড়িত হয়েছিলেন, কিন্তু এখন তিনি স্বদেশের জমিদারদের কাছেই অত্যাচারিত। নিরন্তর এই অসফলতার ফলে মৈজিনীর মনে এই ধারণা এল যে তাঁর দেশের লোকেরা এখনও পুরোপুরি রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করেনি, যার সাহায্যে তিনি একটি প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পত্তন করতে পারেন। সুইজারল্যাণ্ড থেকে একটি জবরদস্ত জাতীয় পত্রিকা বার করার উদ্দেশ্যেই তিনি সেখানে চললেন, কারণ ইতালীতে তিনি এরকম কোন কাজের অনুমতি পাবেন না। রাতদিন তিনি নামবদল করতে লাগলেন। নিজের জন্মভূমি জেনেভায় এলেন। সেখানে তিনি মায়ের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য দিলেন। শেষে সুইজারল্যাণ্ড পৌঁছলেন। সারা বছর ধরে নিজের বিশ্বস্ত সহচরদের সহায়তায় তিনি পত্রিকা বের করতে লাগলেন। কিন্তু একনাগাড়ে

চিন্তা আর পরিশ্রমের ফলে তিনি দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। ১৮৭০ সালে আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে যখন তিনি ইংলণ্ড যাচ্ছিলেন তখন আল্পস পর্বতের পাদদেশে এক গ্রামে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তাঁর জীবনাবসান ঘটল। এক অপূর্ণ বাসনা বুকে বহন করে স্বর্গে চলে গেলেন। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর মুখে ইতালীর নামই শোনা গেছে। সেখানে তাঁর অনেক সমর্থক ও সহানুভূতিশীল ভক্ত ছিলেন। তাঁরা তাঁর মৃতদেহ নিয়ে খুব বড় শোকযাত্রা বের করলেন। অনেক লোক তাতে যোগ দিলেন। একটা প্রস্রবনের ধারে সুন্দর স্থানে জাতির উদ্দেশ্যে প্রাণবিসর্জনকারীকে সমাধিস্থ করা হল।

আজ তিন দিন হল, মৈজিনীকে কবর দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, সূর্যের শেষ রক্তিম আভা কবরের ওপর এসে পড়েছে। যেন করুণ ভাবে সূর্যদেব তাকিয়ে আছেন। এমন সময় সধবার বেশ পরিহিতা এক সুন্দরী প্রৌঢ়া টলতে টলতে এগিয়ে এলো। মেগডলীন। সারা দেহ মন শোকে ভেঙ্গে পড়েছে, মনে হচ্ছে যেন দেহে কোন প্রাণ নেই। কবরের মাথার কাছে বসে বুকের মধ্যে রাখা ফুলগুলো কবরের ওপর ছড়িয়ে দিল, হাঁটুগেড়ে বসে প্রার্থনা জানাল। অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। বরফ পড়তে লাগল। মেগডলীন আস্তে আস্তে উঠে মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ শ্রদ্ধাজানাল, তারপর কাছের একটা গ্রামে রাত কাটিয়ে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হল।

মেগডলীন নিজেই এখন এ বাড়ির মালিক। অনেক দিন হল তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। সেখানে মৈজিনীর নামে একখানি আশ্রম খুলল, আর নিজেও সেই আশ্রমে খ্রীশ্চান পরিচারিকার পোশাকে জীবন কাটাতে লাগল। 'মৈজিনী' নামটি তার কাছে এক মনোহারী, পুণ্যবান নামের চেয়ে একটুকু কম ছিল না। সহানুভূতি আর প্রেমের বন্যায় তার ও মৈজিনীর ঘর একাকার হয়ে গিয়েছিল। মৈজিনীর হাতের লেখাই তার কাছে বাইবেল মৈজিনীর নামই তার ঈশ্বর। আশপাশের অনাথ শিশু আর গরীব স্ত্রীলোকদের কাছে 'মৈজিনী'

নাম ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ। মেগডলীন আরও তিন বছর বেঁচেছিল। মৃত্যুকালে সে নিজের সমস্ত সম্পত্তি ঐ আশ্রমে দান করেছিল। তার প্রেম মামুলী কোন প্রেম ছিল না। তার প্রেম ছিল নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র, তার প্রেম আমাদের সেই প্রেমের কথাই মনে করিয়ে দেয়, বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে, অলিতে গলিতে কৃষ্ণের প্রতি গোপিনীরা যে প্রেম দেখিয়ে গেছে। হৃদয়ের মিলন হলেও তাঁরা ছিলেন পৃথক, যাদের হৃদয়ে প্রেম ছাড়া অন্য কিছুর স্থান ছিল না।

মৈজিনীর আশ্রম আজও আছে এবং গরীব, সাধুসন্তরা আজও মৈজিনীর পবিত্র নাম নিয়ে সেখানে সুখে কালাতিপাত করছে।

॥ দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য রত্ন ॥

দিলফিগার, একটা কুর্তাপরে একটা গাছের নীচে বসে চোখের জলের রক্ত-গঙ্গা বইয়ে দিচ্ছে। সে সৌন্দর্যের দেবী মল্লদেশের দিলফরেবের প্রকৃত প্রেমিক। তাকে সে জান দিয়ে ভালোবাসে।

সে সেই সব প্রেমিকদের দলে পড়ে না, যারা সুগন্ধীতেল, আতর, জেল্লাদার পোশাকে বাবু সেজে প্রেমিকার কাছে হাজির হয়। বরং সেই সব সহজ সরল লোকেদের দলে পড়ে যারা পাহাড়ে জঙ্গলে ব্যর্থপ্রেমিকের মত মাথা খুঁড়ে বেড়ায় আর নালিশ জানাতে থাকে। দিলফরেব তাকে বলে দিয়েছে যে, "তুমি যদি আমার প্রকৃত প্রেমিক হও, তবে যাও বিশ্বের সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ আহরণ করে আমার দরবারে নিয়ে এসো। তবেই আমি তোমাকে আমার গোলাম হিসাবে স্বীকৃতি দেবো। যদি তেমন কোন বস্তুর সন্ধান তুমি না পাও, তবে খবরদার, এপথ মাড়াবে না, একদম শূলে চড়িয়ে দেবো।"

দিলফিগারকে সে তার মনোভাব ব্যক্ত করার, অভিযোগ

জানানোর বা প্রেমিক'র সৌন্দর্য দর্শন করার জন্যও এতটুকুসময় দিল না। দিলফরের যেইমাত্র হুকুম করলো অমনি তার দারোয়ান গরীব দিলফিগারকে ধাক্কাদিয়ে বার করে দিল। আর আজ তিন দিন হয়ে গেল, বেদনাহত দিলফিগার ওই ভয়ানক ফাঁকা মাঠে, ওই কাঁটা গাছের নীচে বসে বসে শুধু ভাবছে—কি করবো। জগতের অমূল্যতম সম্পদ কি আমি পাবো? অসম্ভব। আর সেটা কি? কারু*'র কোষাগারে?

আবে হয়াত? খুসরোর তাজ? জামেজম? সিংহাসন? পরবেজের সম্পত্তি? না, কখনোই এই সব জিনিস নয়। জগতে নিশ্চয়ই এর চেয়ে মূল্যবান, এরচেয়ে মহত্বপূর্ণ জিনিস মজুত আছে। কিন্তু সেটা কি? কোথায়? কি করে তা পাওয়া যাবে? হে খোদা, এই সমস্যার সমাধান কি?

দিলফিগারের মাথা ঘুরতে লাগলো। বুদ্ধিতে কিছুই আসছে না। মুনীর শামী তো একজন সুচতুর সাহায্যকারী পেয়েছিলেন। ঐ রকম আমাকেও দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য ধনের নাম বাতলে দিন না। হয়তো সে বস্তু আমি হাতে পাবো না, তবুও বুঝতে তো পারবো সেই অমূল্য বস্তু কত দামী? আমি মুক্তোর খোঁজে যেতে পারি। আমি সমুদ্রের গান, পাথরের হৃদয়, মৃত্যুর শব্দ, বা তার চেয়েও অলৌকিক কোন কিছু পাবার জন্য কোমর কষে লাগতে পারি, কিন্তু দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু! সে আমার কল্পনা শক্তির অনেক উর্ধ্বে।

আকাশ ভরা তারা ফুটেছে। দিলফিগার খোদার নাম স্মরণ করে উঠে দাঁড়াল এবং এক দিকে চলল। ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত, শুষ্ক মুখে, ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন, বছর খানেক ধরে সে নির্জন ও জনাকীর্ণ সবরকম জায়গাতেই বৃথা পরিশ্রম করে ফিরল। কাঁটা ফুটে পায়ের তলা ফালা ফালা হয়ে গেল। শরীর হাড্ডীসার হয়ে উঠল। কিন্তু সেই

* কারু—হজরত মুসার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কারু—বিপুল সম্পত্তির অধিকারী, অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন।

বস্তু, যা দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য, তা পাওয়া গেল না, তার কোন হদিশও মিলল না।

একদিন পথ ভুলে সে এক মাঠে এসে পৌঁছাল। সেখানে হাজার হাজার লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানে একজন দাড়ীওলা কাজী কয়েকজন অফিসার গোছের লোকের সঙ্গে কিছু শলা পরামর্শ করছিলেন। ঐ জমায়েত থেকে কিছু দূরে একটা শূল প্রস্তুত রয়েছে। শারীরিক দুর্বলতার জন্য আর এখানে কি হচ্ছে সেই কৌতূহলে দিলফিগার দাঁড়িয়ে গেল। সে দেখতে পেল যে হাত পায়ে শিকল বাঁধা এক কয়েদীকে কয়েকজন খোলা তলোয়ার-ধারী ধরে নিয়ে আসছে শূলের কাছাকাছি গিয়ে সিপাইরা দাঁড়িয়ে গেল। কয়েদীর হাত পায়ের বাঁধন খুলে দেওয়া হল। তার পোশাক শত শত নিরাপরাধের রক্তে রঙীন। তার মুখে সভ্যতার কোন চিহ্ন নেই, তার হৃদয় দয়াপ্রার্থী নয়। তাকে সবাই কালা চোর বলে ডাকছিল। সিপাইরা তাকে শূলে চড়িয়ে, তার গলায় ফাঁসির দড়ি লটকে দিল। জহ্লাদ তার পায়ের তলার তক্তা সরিয়ে নিতে যাবে, ঠিক সেইসময় ওই অভাগা চোর চিৎকার করে বলে উঠল— "খোদার দিবিব, আমাকে একবার ফাঁসি কাঠ থেকে নামিয়ে দাও, আমি জীবনের শেষ ইচ্ছেটুকু পূরণ করতে চাই।" একথা শুনে চারিদিক অদ্ভুত এক স্তব্ধতায় ভরে গেল। জনগণ বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে রইল। একজন মৃত্যুপথযাত্রী আসামীর অন্তিম বাসনা অপূর্ণ রাখা, কাজী উচিত মনে করলেন না। ঐ অভাগা কালা চোরকে ফাঁসি কাঠ থেকে নামিয়ে আনা হইল।

ঐ ভীড়ের মধ্যে খুব সুন্দর সহজ সরল একটি বালক আপন মনে একটা লাঠিকে মনে মনে ঘোড়া বানিয়ে দৌড়ে দৌড়ে খেলছিল। সে তার খেলার খেয়ালে এমনই মগ্ন ছিল যে, সেই সময় সে সত্যি সত্যি নিজেকে এক আরবী ঘোড়ার সওয়ারী মনে করছিল। সত্যি-কারের খুশীতে উজ্জ্বল তার তখনকার চেহারা প্রস্ফুটিত পদ্মের মত

মনে হচ্ছিল,—মনে হচ্ছিল চাঁদ যেন দিনের বেলায় এক বালকের বেশে ধরণীতে অবতীর্ণ হয়েছে—এদৃশ্য যে একবার দেখেছে—সে আমৃত্যু তা মনে রাখবে। অন্যায় আর পাপের রাজ্য থেকে তার হৃদয় এখন অনেক দূরে—সেখানে পবিত্রতা দিনরাত খেলা করছে।

হাজার হাজার চোখ এখন সেই ফাঁসি-কাঠ-থেকে-নেমে-আসা কালা চোরের দিকে। সে ওই বালকটির কাছে এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগল। সেই সময় তার সেই জগতের কথা মনে পড়ল, যখন সে নিজেই এমন সহজ সরল সদানন্দ ছিল, যখন দুনিয়ার সমস্ত পাপ আর নোংরা কাজ কর্ম থেকে মুক্ত ছিল। মা কোলে বসিয়ে খাওয়াতেন। বাবা জীবন যাপনের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করতেন। হায়রে! বিগত দিনের কথা স্মরণ করতে করতে সেই কালা চোরের চোখ থেকে—যে চোখে সে খুন-করা লাশগুলোকে ছট্‌ফট্‌ করতে দেখেও একবারও চোখ বন্ধ করে নি, সেই চোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রু টপ্‌ করে মাটিতে পড়ল। দিলফিগার চট্‌ করে সেই অমূল্য মুক্তো বিন্দু হাতে তুলে নিয়ে মনে মনে বলল—"নিঃসন্দেহে এটাই জগতের সবচেয়ে অমূল্য বস্তু—যার কাছে সিংহাসন, জামেজম, আবে হয়াত কিংবা পরওয়েজ সব তুচ্ছ।"

নিজের সাফল্যে সুনিশ্চিত দিলফিগার তার প্রেমিকা দিলফরেবের শহর মীনোস্‌ওয়াদের উদ্দেশ্যে রওনা হল। কিন্তু যতই সে গন্তব্য স্থলের নিকটবর্তী হতে লাগল, ততই তার উদ্যম নষ্ট হয়ে যেতে লাগল —এই ভেবে যে, যদি এই জিনিস যাকে সে জগতের সবচেয়ে বহুমূল্য বস্তু হিসাবে নিয়ে চলেছে তা যদি দিলফরেবের কাছে কদর না পায়, তবে তো তার ফাঁসি হয়ে যাবে। এজীবন এখানেই খতম! কিন্তু যা হবার তা তো হবেই আপাততঃ ভাগ্য পরীক্ষা করা যাক্। অবশেষে পাহাড়-নদী পেরিয়ে সে মীনোস্‌ওয়াদ শহরে এসে পৌছল। দিলফরেবের প্রাসাদে গিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সে দিলফরেবের অনুগ্রহ প্রার্থনা করে তার চরণ চুম্বনের ইচ্ছা প্রকাশ করল। দিল-

ফরেব তৎক্ষণাৎ তাকে ডেকে পাঠালো। সোনার পর্দার আড়াল থেকে তাকে দুনিয়ার অমূল্যতম বস্তুটি পেশ করবার আদেশ দিল। দিলফিগার আশা-নিরাশার এক অদ্ভুত মনোস্থিতিতে সেই অশ্রুবিন্দু পেশ করে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করল। দিলফরেব মন দিয়ে সমগ্র কাহিনীটা শুনে সেই মুক্তোবিন্দু হাতে নিয়ে মনো-যোগ সহকারে বেশ কিছুক্ষণ দেখে বলল, "দিলফিগার, তুমি দুনিয়ার একটি অমূল্য বস্তু এনেছো এটা ঠিক। তোমার হিম্মত আর বিচার শক্তির প্রশংসা করি। কিন্তু এটা দুনিয়ার সবচেয়ে বহুমূল্য বস্তু নয়। সুতরাং তুমি ফিরে যাও, আবার চেষ্টা করো। সম্ভবতঃ আমার গোলামী করাই তোমার ভাগ্যে লেখা আছে। প্রথমে আমি যে কথা বলেছিলাম যে, আমি তোমাকে ফাঁসিতে লট্‌কাবো, কিন্তু আমি আমার প্রেমিকের মধ্যে যে গুণগুলো প্রত্যাশা করি, তা তুমি কখনো না কখনো চরিতার্থ করতে পারবে এই বিশ্বাস করে তোমাকে ক্ষমা করছি।"

প্রেমিকার এই অনুকম্পা দেখে বিফল ব্যর্থ দিলফিগার সাহসের সঙ্গে বলল, "আমার হৃদয়-রাণী, আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে তোমার প্রাসাদের সেবক হতে পারবো। কিন্তু খোদাই জানেন সে দিন কবে আসবে। তুমি কি তোমার জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ এই প্রেমিকের প্রতি দয়া অনুভব করবে না, কিংবা একবার ওই মোহিত রূপের দর্শন দিয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত দিলফিগারকে আবার পুনরুজ্জীবিত করার শক্তি যোগাবে না? তোমার এক পলক প্রেম-দৃষ্টিতে নেশাগ্রস্ত হয়ে আমি তাই করতে পারি যা আজ পর্যন্ত কেউ কখনো করতে পারেনি।"

দিলফরেব প্রেমিকের মুখে লোভীর মত এই রকম কথাবার্তা শুনে ভীষণ ক্রুদ্ধ হ'ল। হুকুম দিল—"এক্ষুনি এই পাগলটাকে দরবার থেকে বের করে দাও।" দারোয়ান সঙ্গে সঙ্গে গরীব দিলফিগারকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল।

প্রেমিকার এই নিষ্ঠুর কঠোরতায় ব্যথিত দিলফিগার অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। তারপর ভাবতে লাগল এখন কি করবে। অনেক শহরে আর জঙ্গলে ঘুরে তবেই অশ্রুবিন্দু সে পেয়েছিল। তবে এমন কি বস্তু আছে যা এই উজ্জ্বল মোতির চেয়েও মূল্যবান। হে হজরত খিজ্র, তুমি সিকন্দরকে আবেহয়াত কূপের রাস্তা দেখিয়েছিলে। তুমি কি আমাকে একটু সাহায্য করবে না? সিকন্দর ছিলেন সারা দুনিয়ার মালিক। আর আমি এক গরীব মুসাফির। তুমি কত ডুবন্ত লোককে তীরে পৌঁছে দিয়েছ, আর এই গরীবের বেড়াটুকু পার করে দাও। হে আলী মুকাম জিব্রাইল, তুমি অন্তত এই অধম, দুঃখী প্রেমিকের ওপর সদয় হও। তুমি ভগবানের সভাসদ। তুমি কি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে না? দুঃখের কথা এই যে দিলফিগার অনেক অনুনয় বিনয় করল, কিন্তু তার হাত ধরবার জন্য একজনও কেউ এগিয়ে এল না। অবশেষে পাগলের মত সে দিশাহীন বাঘের মত কোন একটা দিকে ছুটে চলল।

দিলফিগার পূব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত অনেক জঙ্গল, অনেক জনপদ পেরিয়ে গেল, কখনো বরফঢাকা পাহাড় কখনো ভয়ঙ্কর কোন ঘাটে ঘুরতে লাগল, কিন্তু যে জিনিসের সন্ধান সে করে বেড়াচ্ছে তার কোন হদিশ পেল না। তার শরীর যেন মাংস বিহীন এক হাড়ের খাঁচা হয়ে উঠল।

একদিন সন্ধ্যা বেলায় কোন এক নদীর তীরে সে বেঘোরে পড়েছিল। হঠাৎ চমকে উঠে দেখল যে সামনে চন্দন কাঠ দিয়ে এক চিতা সাজানো রয়েছে। তার ওপর ষোল শৃঙ্গারে বিভূষিতা এক সধবা যুবতী তার মৃত স্বামীর মাথা নিজের কোলের ওপর রেখে বসে আছে। অনেক লোক গোল হয়ে ঘিরে আছে আর ফুল ছুঁড়ছে। একসময় চিতায় আগুন দেওয়া হ'ল। সেই সময় এক অপরূপ পবিত্রতায় সতীর দেহ ভরে গেল। ধীরে ধীরে সবভূক আগুনের শিখা তাকে ছেয়ে ফেলল—সেই ফুলের মত সুন্দর দেহখানি ছাই

হয়ে গেল। প্রেমিকা তার প্রেমিকের জন্ত নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিল। এই পবিত্র, সত্য, অমর প্রেমের শেষ লীলা টুকু সকলের দৃষ্টির সম্মুখে অনুষ্ঠিত হল। যখন সব লোক যে যার ঘরে ফিরে গেছে, তখন দিলফিগার চুপি চুপি উঠল, সে এই একমুঠো পবিত্র ছাই দুনিয়ার অমূল্যতম বস্তু হিসাবে তুলে নিল। সাফল্যের নেশায় মত্ত হয়ে সে ফিরে চলল। এবার কিন্তু যতই গন্তব্যস্থলের দিকে এগোতে লাগল, ততই সাহস উদ্যম বাড়তে লাগল। কেউ যেন তার অন্তর থেকে বলছে, এবার জয় হবেই। অবশেষে সে মীনোস্ওয়াদ শহরে এসে পৌছল। দিলফিগার দিলফরেবের প্রাসাদে গিয়ে তার আগমন বার্তা জানাল। দিলফরেব তার প্রেমিককে দরবারে ডেকে পাঠাল এবং দুনিয়ার অমূল্যতম বস্তুর জন্য নিজের হাত খানি পর্দার আড়াল থেকে বাড়িয়ে দিল। দিলফিগার সাহস করে সেই অপূর্ব সুন্দর হাতে চুম্বন করে মুঠোয় ভরা ছাইটুকু তার হাতে দিল এবং সব ঘটনা সুন্দর ভাবে বর্ণনা করল। তারপর প্রেমিকার অধর নিঃসৃত রায় শোনার জন্য অধীর ভাবে অপেক্ষা করতে লাগল। দিলফরেব সেই একমুঠো ছাই নিয়ে অনেকক্ষণ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বলল—"হে প্রাণ-উৎসর্গীকৃত দিলফিগার, এই ছাইটুকু নিঃসন্দেহে এমন মূল্যবান বস্তু যার লোহাকে সোনা করার মত ক্ষমতা আছে। আমি অন্তর থেকে তোমার প্রশংসা করছি, কারণ এমন এক অমূল্য বস্তু তুমি আমাকে এনে দিয়েছো। কিন্তু দুনিয়াতে এর চেয়েও মূল্যবান বস্তু আছে। যাও, তার সন্ধান করে নিয়ে এসো। আমি আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করি যে তুমি সাফল্য লাভ করো। এই বলে সে সোনার পর্দার আড়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। এবং প্রেমিককে নিজের অনন্ত রূপলাবণ্যের ছটায় ঝলসে দিয়ে আবার পর্দার আড়ালে অন্তর্হিত হল। যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ চমকানির পর আবার বর্ষণ শুরু হল। এবার আর তার খেয়াল ছিল না যে দারোয়ান মোলায়েম ভাবে তার হাত ধরে বাইরের রাস্তা দেখিয়ে

দিয়েছিল না কি তৃতীয় বারের মত এই প্রেম-পূজারী দারোয়ানের ধাক্কায় অথৈ সমুদ্রে এসে পড়ল।

দিলফিগারের সব সাহস শেষ। তার এই বিশ্বাস হয়ে গেল যে, আমি জগতের সবচেয়ে অকর্মণ্য ব্যর্থ, মরবার জন্যই আমার জন্ম। আর অনুনয় বিনয় করার জন্য যাতে একটা হাড়ও অবশেষ না থাকে সেই জন্য পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে গভীর খাদে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার পরিকল্পনা করল। এছাড়া অন্য কোন রাস্তা নেই। সে উন্মাদের মত উঠে দাঁড়াল, টলতে টলতে এক পাহাড়ের চূড়ায় হাজির। অন্য কোন সময় হ'লে এত উঁচু পাহাড়ে ওঠার মত সাহসই তার হ'ত না। কিন্তু এখন এই বিশাল পাহাড়টা তার কাছে ছোট একটা টিলার চেয়ে বড় মনে হল না। এখান থেকে সে নীচে লাফিয়ে পড়তে যাবে এমন সময় দেখল সবুজ কাপড় পরা, এক হাতে লাঠি, গলায় জপের মালা এক অতি বৃদ্ধ তার নাম ধরে ডাকছে,—"দিলফিগার, ওরে মূর্খ দিলফিগার কাপুরুষের মত একি করছিস্। তুই প্রেম করতে চাস, আর এটা জানিস না যে, কঠোর সঙ্কল্পই প্রেম মার্গের প্রথম ধাপ? মরদের মত কাজ কর, সাহস হারাসনি। পূর্বদিকে হিন্দুস্থান নামে একটা দেশ আছে—সেখানে যা তোর বাসনা পূর্ণ হবে।"

এই বলে হজরত খিজ্র অন্তর্হিত হলেন। দিলফিগার মনে মনে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাল। তার পর নূতন উদ্যমে, নূতন আশার আলোকে উৎফুল্ল হৃদয়ে পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে হিন্দুস্থানের দিকে চলতে লাগল।

কাঁটা ভরা জঙ্গল, মরুভূমি, গভীর খাদ, অলঙ্ঘ্য পর্বত পার হয়ে দিলফিগার হিন্দুস্থানের সীমান্তে এসে পৌঁছল। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে তার এতদিনের সমস্ত পরিশ্রমের ক্লান্তি যেন ধুয়ে দিয়ে গেল। নদীর ধারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। সন্ধ্যা নাগাদ সে এক বিস্তৃত প্রান্তরে এসে হাজির হল—সেখানে অসংখ্য আধমরা, মরা লাশ

এদিক ওদিক বিনা কফিনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। কাক, চিল আর জংলীজানোয়ারও মরে পড়ে আছে। সমস্ত ময়দান রক্তে লাল হয়ে গেছে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে দিলফিগারের শরীর ভয়ে কেঁপে উঠল। হায় ভগবান, কোন মহাপ্রলয়ে এত গুলো প্রাণ কোঁকাতে কোঁকাতে, কাতরাতে কাতরাতে এই ভাবে নিঃশেষ হয়ে গেছে! শকুনগুলো হাড়ের ওপর ঠোকরাচ্ছে রক্তমাংস মুখে নিয়ে শেয়াল পালাচ্ছে,—এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দিলফিগার কোনদিনও দেখেনি। সে বুঝতে পারল এটা যুদ্ধক্ষেত্র, এই মৃতদেহ গুলো বীর যোদ্ধাদের। এমন সময় কোথায় যেন গোঙানীর আওয়াজ শোনা গেল। সে দিকে তাকিয়ে দিলফিগার দেখতে পেল একজন লম্বা চওড়া সৈনিক—প্রচুর রক্তপাতে যার বিশাল চেহারাটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। মাটিতে মাথা ঝুঁকিয়ে কোনক্রমে পড়ে আছে সে। বুক থেকে রক্তের ফোয়ারা ছুটছে; কিন্তু হাত থেকে তলোয়ার আলগা হয়নি। এক টুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়া নিয়ে দিলফিগার তার ক্ষতস্থান চাপা দিল যাতে রক্ত বন্ধ হয়। সৈনিককে প্রশ্ন করল, "হে জওয়ান, তুমি কে?" একথা শুনে সৈনিক চোখ খুলে তাকাল, বীরের মত উত্তর দিল, "তুই জানিস না আমি কে? এই তলোয়ারের খেলা কি তুই আজ দেখিস্ নি? আমি হলাম আমার মায়ের ছেলে, আর ভারতের যোগ্য সন্তান।" এইকথা বলতে বলতে তার রক্ত গরম হয়ে উঠল। ক্রোধে সেই শীর্ণ চেহারা লাল হয়ে উঠল। সেই উজ্জ্বল তলোয়ারের কেরামতি দেখাতে আবার সে ঝলসে উঠতে চাইল। দিলফিগার বুঝতে পারলো যে যোদ্ধা হয়তো তাকে শত্রুপক্ষের ভেবেছে। তাই সে নরমগলায় বলল—"হে জওয়ান, আমি তোমার শত্রু নই। মাতৃভূমি ছেড়ে আমি এখানে এসেছি, একজন গরীব মুসাফির মাত্র। ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছি। দয়া করে আমাকে তোমার সব কথা বল।"

একথা শুনে আহত সৈনিক মিষ্টি স্বরে বলল, "তুমি ত মুসাফির অতিথি, তবে আমার এই রক্তের ওপরেই বসো। এই দু' আঙুল

জমি ছাড়া আমি এখন নিঃস্ব, কিন্তু আমাকে মেরে ফেলার আগে কেউ এইটুকু জমি ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আফ্‌শোস রয়ে গেল যে তুমি এমন এক সময়ে এলে যখন আমার অতিথি সংকার করার এতটুকুও ক্ষমতা নেই। আমার বাপ-দাদার দেশ আমার হাত থেকে বেরিয়ে গেল। এখন আমি মাতৃভূমিহীন! কিন্তু (আবার রেগে উঠে) আমরা হামলাকারী দুশ্‌মনদের জানিয়ে দিয়েছি যে জন্মভূমি রক্ষা করার জন্য রাজপুতরা জান দিতে জানে। আশেপাশে এই যে লাশগুলো তুমি দেখছ এগুলো এই তলোয়ারে নিহত শয়তানগুলোর লাশ। (মৃদু হেসে) হইনা কেন স্বদেশহারা তবু শত্রুর জমিতে মরতে পারছি তো। (বুকের ক্ষতস্থানের ওপর থেকে ন্যাকড়াটা তুলে ফেলে) এটা কি তুমি দিয়েছো? রক্ত পড়তে দাও, রক্ত বন্ধ করে লাভ কি? আমি কি স্বদেশে শত্রুর গোলামী করার জন্য বেঁচে থাকবো? না, এমন ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল। এর চেয়ে সুন্দর মৃত্যু সম্ভব নয়।"

সৈনিকের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে এল। শরীর এলিয়ে পড়ল। এত রক্ত নিঃসৃত হয়েছে যে রক্ত পড়া আপনা আপনিই বন্ধ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে একফোঁটা দুফোঁটা গাঢ় রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছিল। শেষকালে সমস্ত শরীর-টা-ই নিস্তেজ হয়ে গেল। কথা তো আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—চোখ দুটো এখন বন্ধ হয়ে গেল। দিলফিগার বুঝতে পারল যে শেষ সময় উপস্থিত। মৃত্যুপথযাত্রী সৈনিক 'জয়, ভারতমাতার জয়' বলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। শেষবারের মত একবিন্দু রক্ত বুকের ক্ষতস্থান থেকে টপ করে পড়ল। একজন সত্যকারের দেশপ্রেমিক তার দেশভক্তির চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেল। এই ঘটনা দিলফিগারের হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করল, "দুনিয়াতে এই রক্তবিন্দুর চেয়ে মূল্যবান বস্তু নিঃসন্দেহে আর কিছু হতে পারে না।" সে তৎক্ষণাৎ সেই রক্ত বিন্দু হাতে নিয়ে সেই সাহসী রাজপুতের বীরত্বে প্রশংসা করতে করতে স্বদেশ অভিমুখে

রওনা দিল। অবশেষে অনেকদিন ধরে অনেক পরিশ্রমের পর সে রূপের-রাণী মল্লদেশের দিলফরেবের প্রাসাদে হাজির হয়ে তার আগমন বার্তা জানিয়ে বলল যে, 'দিলফিগার সফল হয়ে ফিরে এসেছে, দরবারে হাজির হোতে চায়।' দিলফরেব তক্ষুনি তাকে নিয়ে যাবার হুকুম দিল। রীতি অনুসারে নিজে সোনার পর্দার আড়ালে বসে দিলফরেব প্রশ্ন করল, "দিলফিগার, অনেক দিন বাদে ফিরে এসেছো যে! জগতের সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ কোথায়?"

দিলফিগার তার প্রেয়সীর মেহদী রঞ্জিত হাতে চুম্বন করে সেই রক্ত বিন্দু তার হাতে দিল এবং সুন্দরভাবে সমস্ত ঘটনা শোনালো। হঠাৎ একসময়ে সোনার পর্দা সরে গেল। দিলফিগার তার ভেতরের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল। দিলফরেব অত্যন্ত জাঁকজমক পূর্ণ পোশাকে সোনার মসনদে বসে আছে। রূপ-লাবণ্যের এই স্বর্গীয় মহিমা দর্শনে বিস্মিত দিলফিগার স্থির চিত্রের মত দাঁড়িয়ে রইল। দিলফরেব মসনদ ছেড়ে উঠল, একপা একপা করে এগিয়ে এসে দিলফিগারকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে ফেলল। গায়করা খুশীতে গান শুরু করে দিল। বাজনদাররা মহানন্দে বাজাতে শুরু করল। সভাসদরা দিলফিগারের দিকে তাদের নজরানা এগিয়ে দিল, আর অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে এই চন্দ্রমুখকে মসনদে বসিয়ে দিল। মনোরম গান শেষ হতে দিলফরেব দাঁড়িয়ে উঠে হাত জোড় করে দিলফিগারকে বলল—হে আমার হৃদয় দেবতা, প্রেমাস্পদ দিলফিগার। খোদার কৃপায় আজ আমি আমার আকাঙ্ক্ষিত স্বামী হিসাবে তোমাকে পেয়েছি। আজ থেকে তুমি আমার মালিক আর আমি তোমার অধম সেবিকা।"

এই বলে সে একটি রত্নখচিত মঞ্জুষা চেয়ে পাঠাল—তার থেকে একটা লকেট্ বার করল যাতে সোনালী অক্ষরে খোদিত রয়েছে—"মাতৃভূমির জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণের শেষ রক্ত বিন্দু দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ।"

শেখ মখমুর

সেটা জম্মুনির্শার ইতিহাসে এক অন্ধকারময় যুগ। শাহ কিশ্‌ওয়র প্লাবনের মত ধেয়ে এসে সারা দেশটা তার খার করে দিলেন। রক্তে ভেসে গেল চারিদিক, স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হ'ল। শাহ বামুরাদ প্রাণপণ লড়াই করলেন, অনেক চাতুর্যের পরিচয় রাখলেন, তাঁর তিনলক্ষ সুসজ্জিত সেনাকে যুদ্ধে নামালেন। কিন্তু শত্রুপক্ষের পাথর-কেটে-ফেলবার-মত ক্ষমতাশালী তলোয়ারের কাছে তাঁর সৈন্যরা অযোগ্য প্রমাণিত হল! সারা দেশ শাহ কিশওয়রের দখলে চলে এল আর শাহ বামুরাদ তাঁর সমস্ত কিছু স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে একলা এক বনে এসে বাস করতে লাগলেন।

পাহাড়ী জঙ্গল। আশেপাশে হিংস্র জন্তু জানোয়ারের বাস দূরে দূরে আরো অনেক পাহাড় রয়েছে। এই নির্জন জায়গায় শাহ বামুরাদ প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে লাগলেন। জগতে এখন তাঁর বন্ধু বলে কেউ নেই। সারাদিন তিনি বস্তী থেকে দূরে কোন পাহাড়ের চূড়ায় চুপচাপ বসে থাকতেন। লোকে ভাবতো ইনি বোধহয় কোন ব্রহ্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী, সাধনায় মগ্ন। এই জঙ্গলেই শাহ বামুরাদের জীবনের এক যুগ কেটে গেল। তাঁর শরীর থেকে এখন যৌবন বিদায় নিয়ে প্রৌঢ়ত্বকে আহ্বান করছে।

এই সময় একদিন শাহ বামুরাদ বস্তীর সর্দারের কাছে গিয়ে বললেন, "আমি বিয়ে করতে চাই।" তাঁর মুখে এমন কথা শুনে সর্দার অবাক হয়ে গেল, কিন্তু তাঁর প্রতি সর্দারের কেমন যেন আস্থা-বিশ্বাস ছিল। সে তাঁর কুমারী মেয়ের সাথে শাহ বামুরাদের বিয়ে দিয়ে দিল। তিন বছর বাদে তাঁদের কোল আলো করে এক পুত্র সন্তান এল। শাহজী খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে আনন্দ

বিস্মিত পত্নীকে গর্বের সঙ্গে বললেন "ভগবানের কৃপায়, জয়ন্তনির্শা মুলুকের উত্তরাধিকারী জন্মগ্রহণ করেছে।"

শিশুটি বড় হতে লাগল। বুদ্ধি ও বিচার শক্তিতে, শক্তি ও সাহসে সে তার দ্বিগুণ বয়সের ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগল। সকাল বেলায় গরীব রিন্দা ছেলেকে খাইয়ে দাইয়ে, সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে নিজের কাজে চলে যেত, আর শাহজী ছেলের আঙুল ধরে বেড়াতে বেড়াতে বস্তী থেকে দূরে পাহাড়ে নিয়ে যেতেন। সেখানে কখনো তাকে পড়াতেন, কখনো অস্ত্র চালনা শেখাতেন, কখনো বা বাদশাহী আদব কায়দা বোঝাতেন। বয়স অল্প হলে কি হবে, এই সব কথাবার্তা সে এমন মন দিয়ে শুনতো, এমন আগ্রহ ভরে প্রশ্ন করতো, যে মনে হতো সে যেন তার বংশের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে। তার মেজাজও ছিল বাদশাহী ধরনের। গ্রামের অনেক ছেলেই তার হুকুম তামিল করতো। ছেলের জন্য মায়ের গর্ব হ'ত, বাবার মনে আনন্দ আর ধরতো না। গ্রামের লোক জানতো যে সে হ'ল তার বাবার মন-প্রাণ-ধন-মান সবকিছু।

দেখতে দেখতে বালক মসুদের সাত বছর হল—কিন্তু চেহারা কি! যেন কোন যুবক শাহজাদা। একবার তাকালে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করতো না। একদিন সন্ধ্যা বেলায় শাহজী একাই বেড়াতে বেরিয়ে ছিলেন। যখন ঘরে ফিরলেন তখন তাঁর মাথায় এক রত্নখচিত রাজমুকুট শোভা পাচ্ছে। তাঁকে এই পোশাকে দেখে রিন্দা হতভম্ব, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলো না। তিনি তখন মসুদকে ডাকলেন। তাঁকে স্নান করিয়ে, পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিয়ে এক পাথরের বেদীতে বসিয়ে দরদ ভরা কণ্ঠে বললেন "মসুদ, আজ আমি তোমার কাছে ছুটি চাইছি। তোমার সম্পদ তোমায় দিয়ে গেলাম। এটা জয়ন্তনির্শা মুলুকের রাজমুকুট। একদিন ছিল, যখন এই মুকুট তোমায় এই দুঃখী বাপের মাথায় শোভা পেত। তোমার মঙ্গল কামনায় এটা তোমায় সমর্পণ করলাম। রিন্দা, প্রিয়তমা! তোমার এই দুর্ভাগা স্বামী একদিন

এই দেশের বাদশাহ ছিল। তখন তুমি এর রাণী হতে। এই সম্পদ তোমার কাছ থেকে আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু এখন তোমাদের কাছ থেকে আমার চলে যাবার ডাক এসেছে, এখন আর লুকিয়ে রেখে কি করবো। মসুদ, তুমি এখনো ছোট আছো, কিন্তু তুমি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ। আমি বিশ্বাস করি যে, তোমার এই বুড়ো বাপের শেষ ইচ্ছার কথা তোমার স্মরণ থাকবে, এবং তা পূরণের জন্য তুমি চেষ্টা করবে। এই দেশ তোমার, এই মুকুট তোমার, এই প্রজারা তোমার। এদের সকলকে তুমি নিজের দলে আনবার জন্য আমৃত্যু চেষ্টা করবে। যদি তোমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তবে আমার মত তুমিও তোমার ছেলেকে এই মুকুট দিয়ে তার সম্মান রক্ষার উপদেশ দেবে। তোমাকে আর কিছু বলার নেই, খোদা তোমাদের দুজনকে সুখে শান্তিতে রাখুন —তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।"

এই কথা বলতে বলতে শাহজীর চোখ বন্ধ হয়ে এলো। রিন্দা দৌড়ে গিয়ে তার পায়ের ওপর মাথা রাখল। মসুদ কাঁদতে লাগল। পরের দিন সকালে গ্রামের লোক জড়ো হয়ে তাকে এক পাহাড়ী গুহায় সমাধিস্থ করে এল।

দুই

শাহ কিশওয়র কুশা অর্ধ শত বছর ধরে ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে রাজত্ব করে গেলেন, কিন্তু 'কিশওয়র কুশা' দ্বিতীয়, সিংহাসনে বসেই তার বাবার বিশ্বস্ত, বুদ্ধিমান মন্ত্রীকে বরখাস্ত করে নিজের মর্জিমাফিক লোক নিযুক্ত করলেন। রাজকার্য করা দিনের পর দিন মুস্কিল হতে লাগল। সর্দাররা, সুযোগ পেয়ে প্রজাদের ওপর অন্যায় অত্যাচার শুরু করল। এই সময় একজন পুরানো সৈনিক সুযোগ বুঝে বিদ্রোহের পতাকা উঁচিয়ে ধরল। আশপাশের লোকেরা সেই পতাকা তলে জমায়েত হ'তে লাগল এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই

একটা বড়সড় সৈন্য বাহিনী তৈরী হয়ে গেল। মসুদও একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে সেই দলে যোগ দিল।

মসুদের এখন নব যৌবন। বুকে পুরুষের মত তেজ আর বাহুদুটিতে বাঘের মত বল। এমন লম্বা চওড়া যুবক খুব কমই চোখে পড়ে। তার খুব ইচ্ছে বাঘ শিকার করবে। সকাল থেকে সন্ধ্যো—বাঘ শিকার ছাড়া আর অন্য কোন ধান্ধা নেই। কোন দিন পাহাড়ী জঙ্গলের পথে আসতে আসতে যদি কোন স্বাধীনতার গান শুরু করতো, পথচলতি নারী-পুরুষ সকলেই মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকতো। কত হৃদয় না তার পূজো করছে, কত নয়নই না তাকে একবার দেখার জন্য ছটফট করছে, কত প্রাণই না তার প্রেমের জন্য ব্যাকুল। কিন্তু মসুদের ওপর কারুর কোন জাদুই খাটে না। তবে হ্যাঁ, ভালো বাসে একজনকে সে বটে, সে হ'ল তার পিতৃদত্ত উজ্জল তলোয়ার খানাকে। তাকে সে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসে। বেচারা নিজে বিনা পোশাকে থাকতে পারে কিন্তু তলোয়ারের জন্য প্রায়ই চমকদার খাপ তৈরি করছে। এক মুহূর্তের জন্যও তাকে সে চোখের আড়াল করে না। বীর যোদ্ধার কাছে তার তলোয়ার দুনিয়ার সকল বস্তুর চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। এই তলোয়ার আজ পর্যন্ত কতই না পরীক্ষা দিয়েছে। এক বায়ে মসুদ কত জংলী নেকড়ে মেরেছে। কত দস্যুডাকাতকে নিহত করেছে, আর তার পুরো বিশ্বাস রয়েছে যে এই তলোয়ার একদিন কিশওয়ারকুশা দ্বিতীয়ের মাথার ওপর ঝলসে উঠবে, ওই শয়তানের রক্তে জীবন ধন্য করবে।

একদিন বাঘের পেছনে তাড়া করতে করতে সে অনেক দূরে চলে এসেছে। কড়া রোদ্দুর। খিদে আর তেষ্টায় সে তখন ক্লান্ত। কিন্তু সেখানে না দেখা যাচ্ছে কোন মেওয়া গাছ না কোন নদী যে সে একটু খিদে তেষ্টা মেটাবে। যখন সে ক্লান্ত হয়রান হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তখন দেখতে পেল বর্শা হাতে এক অপরূপ সুন্দরী যুবতী বিজলীর মত তেজদার ঘোড়ায় চড়ে এদিকে আসছে। তার কপালে ঘামের

বিন্দু রোদ্দুরে মুক্তোর মত চিক্‌চিক্ করছে, মেঘের মত এক রাশ চুল কাঁধের ওপর বিছিয়ে আছে। চার চোখের মিলন হ'তেই মসুদের বুক খানা দুমড়ে মুচড়ে উঠল যেন। এমন রূপ এর আগে কখনো তার চোখে পড়েনি। এই যুবতী জঙ্গলের মালিকা শের আফগান নামে পরিচিতা।

মসুদকে দেখে মালিকা ঘোড়ার রাশ টেনে গম্ভীর গলায় বলল, "যুবক, তুমি কেহে? আমার এলাকায় তুমি এসেছো শিকার করতে? বলো দেখি তোমার এই অপরাধের কি সাজা দেওয়া যায়?"

একথা শুনে মসুদের চোখ লাল হয়ে উঠল—তলোয়ারটাকে শক্ত করে ধরে বলল, "এর সঠিক উত্তর দিতাম, যদি এটা আপনার মুখ থেকে না বেরিয়ে কোন বলবান পুরুষের মুখ থেকে বেরোত।"

একথায় মালিকার ক্রোধের আগুন দ্বিগুণ প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। তিনি ঘোড়ার পিঠে চাবুকের আঘাত করে বর্শা উঁচিয়ে মসুদের কাছে পৌঁছলেন আর বারবার বর্শার আঘাত করতে লাগলেন। মালিকা শের আফগান বর্শা চালনায় অদ্বিতীয়া ছিলেন। মসুদ ক্লান্ত হয়ে গেল। ঘোড়ার থেকে নীচে পড়ে গেল। তখনো পর্যন্ত সে মালিকার দিকে একবারও অস্ত্র উঁচিয়ে ধরেনি।

তখন মালিকা ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে মসুদের ক্ষতস্থানে নিজের রুমাল ছিঁড়ে বেঁধে দিল। এমন সাহসী বীর যোদ্ধা এর আগে কখনো তাঁর চোখে পড়ে নি। যত্ন সহকারে তাকে তাঁবুর ভেতর নিয়ে গেলেন এবং পুরো দু সপ্তাহ তার পরিচর্যা করলেন। ততদিনে আঘাত শুকিয়ে মসুদের সুন্দর চেহারা আবার চাঁদের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মালিকা এখন তার কাছে আসা ছেড়ে দিয়েছেন।

একদিন মালিকা শের আফগান মসুদকে তার দরবারে ডেকে বললেন, "ওহে গর্বিত নওজোয়ান। খোদার অসীম দয়া যে তুমি

আমার বর্শার আঘাত থেকে সেরে উঠেছো, এখন আমার এলাকা ছেড়ে চলে যাও, তোমার দোষ ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু মনে রাখবে, শিকারের ধাক্কায় কখনো আমার এলাকায় আসবার চেষ্টা করোনা। আপাততঃ রীতির তাগিদে তোমার তলোয়ার বাজেয়াপ্ত করে রাখছি, কিন্তু অহঙ্কারের নেশায় বুঁদ হয়ে কখনো এখানে আসবার চেষ্টা করবে না।"

মসুদ খাপ থেকে খোলা তলোয়ার খানা টেনে নিয়ে বলল, "যতক্ষণ আমার জীবন আছে ততক্ষণ কেউ এই তলোয়ার ছিনিয়ে নিতে পারবে না।" একথা শুনে দৈত্যের মত লম্বা চওড়া, হৈকল (এক প্রকার গয়না) পরা এক পালোয়ান এগিয়ে এসে মসুদের হাত খানা ধরে কুস্তীর এক প্যাঁচ দিল। মসুদ সামলে নিয়ে এমন তলোয়ার চালালো যে পালোয়ানের দেহ থেকে মুণ্ডু খানা আলাদা হয়ে গেল। ব্যাপার দেখে রাণীর চোখ দিয়ে আগুন ঝরতে লাগল। প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি বললেন, "খবরদার এলোকটা যেন এখান থেকে বেঁচে না ফেরে।" সিপাইরা চরিদিকে গোল হয়ে ঘিরে ধরলো, মসুদের উপর বৃষ্টির মত বর্শা আর তলোয়ারের কোপ পড়তে লাগলো।

আঘাতে আঘাতে মসুদের দেহ রক্তাক্ত হয়ে গেল। ফোয়ারার মত রক্ত বেরোতে লাগল। রক্ত পিপাসু তলোয়ার ক্রমাগত তার ওপর পড়ছে—রক্তপান করে তেষ্টা মেটাতে চাইছে। মসুদের আঘাতে কত তলোয়ার হাত থেকে ছিটকে পড়ল, কত সিপাই মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল, কত সিপাই সোজা পরলোকে পৌঁছে গেল। কিন্তু মসুদের হাতে সেই উজ্জ্বল তলোয়ার আগের মত জ্বলজ্বল করতে লাগল। শেষে এই কাণ্ডের নায়িকা মালিকা স্বয়ং তাঁর তলোয়ার চুম্বন করে প্রশংসা করতে বাধ্য হলেন।—"মসুদ! সত্যিই তুমি বাহাদুর। বাঘ শিকারের ধাক্কায় এই ভাবে সময় নষ্ট করো না। শিকার ছাড়াও জগতে আর একটা জায়গা আছে যেখানে তুমি এই তলোয়ারের বাহাদুরী দেখাবার অনেক সুযোগ পাবে। যাও দেশের

সেবা করো ; বাঘ শিকারের মত ছোট অজ আমাদের মত স্ত্রীলোক-দের জন্ত ছেড়ে দাও।"

মখদুমের মন নরম হলো। ভালোবাসার কথা জিভের ডগায় এনেও ফেরত পাঠিয়ে দিল। আর প্রায় তিন সপ্তাহ বাদে অভাগিনী মায়ের কাছে ফিরে এল।

তিন

সেই বিদ্রোহী সর্দারের দল দিন দিন বাড়তে লাগল। প্রথমে তো গোপনে শাহী কোষাগার গুলো লুন্ঠিত হ'তে লাগল। ধীরে ধীরে এক বিশাল সৈন্যদল তৈরী হয়ে গেল। পরীক্ষা করবার উৎসাহে সর্দার নমকখোর প্রথমবারের মত শাহী সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, এবং প্রথম বারেই চব্বিশটা কেল্লা তার দখলে এল। শাহী সৈন্যদল লড়াইতে একটুকুও ঘাটতি দেয়নি,। কিন্তু সর্দারের সৈন্যদের শক্তি, সেই উৎসাহ উদ্দীপনা আর সাহসের কাছে কিশওয়র-কুশা দ্বিতীয় এর সৈন্যরা লুপ্ত হয়ে গেল। যুদ্ধের কলা-কৌশল, অস্ত্র-শস্ত্রের তীক্ষ্ণতা, চেহারার চমকদারে দুপক্ষই ছিল সমান। বাদশাহী সৈন্যরা লম্বা-চওড়া-বিশাল। তাদের সাজ সজ্জা, অস্ত্রের বাহার দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে। তাদের দেখে কোন পাগলও এমন কথা বলতে পারে না যে, এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর কাছে মড়ার মত রোগা সরদারী সৈন্যরা কিছুমাত্র সুবিধা করতে পারবে। কিন্তু যেই মাত্র 'মারো মারো' করতে করতে এক প্রচণ্ড উৎসাহ সর্দারী সৈন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল অমনি তারা মহাবিক্রমে এগিয়ে গেল আর তখন বাদশাহী সৈন্যরা পালাবার পথ পায় না। মুহূর্তের মধ্যে বাদশাহী সৈন্য যেন ধুলোয় মিশে গেল। সর্দার নমকখোর বাদশাহী কেল্লার মজবুত মসনদে জাঁকজমকে পূর্ণভাবে আসীন হলেন, এবং সৈনিকদের বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ একটা বড় থালায় সোনার পদক এনে রাখলেন—তখন

যে সৈনিককে প্রথম পদক প্রদান করা হল, তার নাম জোয়ান মসুদ।

মসুদের জন্য তার সৈন্যদল গর্বিত। যুদ্ধক্ষেত্রে সবার আগে তার তলোয়ারই চমকে উঠতো আর শত্রুপক্ষের পিছুধাওয়া করতে হলে সেই প্রথম এগিয়ে যেত। আকাশের লাল তারার মত সে শত্রু সৈন্যর মাঝে বেমালুম ঘুরে বেড়াত। তার তলোয়ারের আঘাত নির্ভুল ছিল আর তার তীরের নিশানা যেন মৃত্যুদূত।

কিন্তু বীরত্বের উপযুক্ত স্বীকৃতি মসুদ পাচ্ছিল না। সৈন্যবাহিনার একজন অফিসার যখন দেখলো মসুদের তলোয়ারের কাছে তার নিজের অস্ত্র চালনা অত্যন্ত নিষ্প্রভ—তখন সে মসুদকে ঈর্ষা করতে শুরু করলো। মসুদের ক্ষতি করার চেষ্টা করতে লাগলো এবং একদিন সেই সুযোগও এসে গেল।

প্রথমবারে পরাজিত 'কিশওয়র কুশা দ্বিতীয়' সর্দার-সৈন্যবাহিনীকে পদদলিত করার জন্য একটা জবরদস্ত ফৌজ তৈরি করলেন এবং আগের যুদ্ধের ইসকন্দিয়ার মীরশুজাকে সিপাহ্‌সলার নিযুক্ত করলেন এই খবর পেয়ে সর্দার বিচলিত হলেন। মীরশুজার মুখোমুখী হওয়া মানে নিশ্চিত পরাজয়। শেষ পর্যন্ত তিনি এই আদেশ দিলেন যে আমরা সবাই কেল্লার মধ্যে ঢুকে বসে থাকবো। এই সময় মসুদ উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলো—

"না, আমরা কেল্লার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকবো না। আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে থেকেই শত্রুর মুখো-মুখি, তাদের মোকাবিলা করবো। আমাদের বুকের পাঁজরা এত দুর্বল নয় যে, তীর তলোয়ারের আঘাত সহ্য করতে পারবো না। কেল্লায় বন্দী হয়ে থাকার অর্থ এই দাঁড়ায় যে আমরা লড়তে জানি না। আপনারা, যাঁরা শাহবামুরাদকে স্মরণ করে যুদ্ধ করতে নেমেছেন, ভুলে গেছেন যে তিনি তাঁর তিনলক্ষ সৈন্যের রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিয়েছিলেন। না, আমরা কখনোই কেল্লার ভেতর লুকিয়ে থাকবো না। শত্রুর মোকাবিলায় আমরা তালঠুকে দাঁড়াবো, আর

খোদার কৃপা থাকলে আমাদের তলোয়ার শত্রুর গলা পর্যন্ত পৌঁছাবে, আমাদের বর্শা তাদের বুকে স্থান পাবে।"

শত শত চোখ তখন মস্‌দের বিশাল চেহারায় নিবদ্ধ। সর্দার যেন বুকে বল ফিরে পেলেন। সিপাইরা নূতনভাবে উৎসাহিত হ'ল। সর্দার নমকখোর তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, "মস্‌দ, তোমার সাহস ও বীর্যের প্রশংসা করি। তুমি আমার সৈন্যবাহিনীর গৌরব। তোমার মতামত পুরুষের মতামত। আমরা তাহলে কেল্লায় আবদ্ধ থাকছি না। আমরা দুশ্‌মনের মোকাবিলা করবো, আর আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি রক্তনির্ঝার জন্য দরকার হলে রক্তধারা বইয়ে দেবো। তুমি আমাদের অগ্রবর্তী মশাল আর আজ থেকে আমরা তোমার উজ্জ্বল আলোর পথ ধরে এগবো।"

মস্‌দ সিপাইদের নিয়ে একটা বিশেষ দল তৈরি করলেন, তারা এত দৃঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে মীরগুজাকে আক্রমণ করলে যে তার সৈন্যরা থতমত খেয়ে গেল। সর্দার নমকখোর যখন দেখলেন যে শাহী সৈন্যদের পা কাঁপছে তখন তিনি বাকি সব সৈন্যদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তলোয়ারের কোপের ওপর কোপ পড়তে লাগলো, বর্শার আঘাতে আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হতে লাগলো চারিদিক। তিন ঘণ্টা লড়াই চলল, শাহী ফৌজের যে কয়েকজন বাকি ছিল তারা পালালো। আর যে সিপাইর তলোয়ার মীরগুজার ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দিল তার নাম—'মস্‌দ'।

যখন সর্দারী সৈন্যরা আর অফিসাররা শাহী ফৌজের অস্ত্রশস্ত্র লুটে নিতে ব্যস্ত, তখন রক্তমাখা মস্‌দ তার কয়েক জন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মস্করা করতে করতে কেল্লায় ফিরছে, কিন্তু তার খেয়াল নেই সে কোথায় আসছে, যখন চমক ভাঙলো তখন দেখলো যে একটা সুসজ্জিত ঘরে মখমলের গদীতে সে আসীন। ফুলের মিষ্টি গন্ধে আর সুন্দরীদের ভিড়ে চারিদিক মেতে উঠেছে। অবাক হয়ে মস্‌দ যখন এধার ওধার তাকাচ্ছে তখন দেখতে পেল অপ্সরার মত এক সুন্দরী যুবতী

ফুলের মালা হাতে এদিকে এগিয়ে আসছে। তার কাছে এসে চোখ তুলে তাকিয়ে তার হাতে চুম্বন করল। মস্দুদ তাকে চিনতে পারল; মালিকা শের আফগান।

মালিকা ফুলের মালা খানি মস্দুদের গলায় পরিয়ে দিলেন। হীরে জহরত নজর দিলেন তারপর স্বর্ণ-রত্ন-খচিত মসনদে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে বসালেন। বাজনাদারেরা নবীন অতিথির সম্মানে বীণায় রাগালাপ শুরু করলো।

এধারে তো নাচে গানে মশগুল, ওদিকে তখন ঈর্ষা আর দ্বন্দ্বের নতুন নতুন কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হচ্ছে। সর্দারের কাছে অভিযোগ করা হ'ল যে মস্দুদ শিগগির শত্রু সৈন্যের সাথে মিলিত হবে। আজ সে সর্দারী-ফৌজের সবচেয়ে সংগঠিত দল নিয়ে যুদ্ধ করেছে বটে, কাল সে সেই সব সৈন্যদের মেরে ফেলে সর্দারী ফৌজকে নিঃশেষ করে দেবে। প্রমাণ স্বরূপ কিছু জাল হস্তাক্ষর দেখানো হ'ল আর নালিশ করা হ'ল এমন কথার কেরামতিতে যে সর্দার সহজেই এ অভিযোগ সত্য বলে মেনে ছিলেন। মস্দুদ যখন মালিকা শের আফগানের মহল ছেড়ে সর্দারের কাছে গেল বিজয় অভিনন্দন জানাতে তখন শিরোপা বা বাহাদুরীর পদক পাবার পরিবর্তে কটুকথার বাণে বিদ্ধ হ'তে হল। হুকুম দেওয়া হ'ল—"তলোয়ার কোমর থেকে খুলে রাখো।"

মস্দুদ স্তম্ভিত হয়ে গেল, "এই তলোয়ার আমার পিতৃদত্ত। আর আমার একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন, প্রিয় শাহী। এই আমার বাহুবল, পরম বন্ধু। এর সঙ্গে কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে, আর আজ জয়লাভ করেছি বলে একে সরিয়ে রাখবো? যদি কখনো কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করতে পারতো, আমার চেয়ে ভালো কেরামতি যদি কেউ দেখাতে পারতো, আমার বাহুতে তলোয়ার ধরবার সামর্থ্য যদি না থাকতো, তবে খোদার দিব্যি, আমি নিজেই এই তলোয়ার কোমর থেকে খুলে রাখতাম। কিন্তু ভগবানের কৃপায় আমি ঈএ সব দোষ থেকে মুক্ত। তবে কেন আমি একে আমার কাছ থেকে

দূরে সরিয়ে রাখবো? আমার অনিষ্টকারী কোন লোক সর্দারের কাছে নিশ্চয়ই আমার বিরুদ্ধে লাগিয়েছে, আর সেইজন্যই কি তলোয়ার ত্যাগ করতে হবে? না কখনোই এমন হ'তে পারে না।"

কিন্তু চিন্তা করে সে দেখলো যে, তার ঔদ্ধত্যে সর্দার আরো ক্রুদ্ধ হ'তে পারেন, এবং এমন কি তার তলোয়ারখানা জোর করে ছিনিয়ে নিতেও পারেন। তখন আমার সৈন্যরাও নিজেদের সংযত রাখতে পারবেনা, ফলে নিজেদের মধ্যে রক্ত নদী বয়ে যাবে, ভাই-ভাই-এর মাথা কাটবে। ভগবান না করুন আমার জন্য এমন ভয়ঙ্কর মারদাঙ্গা হোক্। এই ভেবে সে নিঃশব্দে তলোয়ার খানা সর্দার নমকখোরের পায়ের নীচে রেখে নতশিরে শূন্য খাপ কোমরে ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল।

পুরো সৈন্যদলটিই মধ্মদের জন্য গর্ব বোধ করতো, ত'র আদেশে জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল। যখনই সে তলোয়ার বের করলো, হাজার সৈনিক নিজ নিজ তলোয়ারে হাত রাখলো আর অগ্নি দৃষ্টিতে চেয়ে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইলো। মধ্মদের একটা ইশারার অপেক্ষা করছিল তারা—লাশের পর লাশ পড়ে যেত। কিন্তু বাহাদুরীতেও মধ্মদ ছিল অদ্বিতীয়, ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতায় তার তুলনা ছিল না। সে এত অপমান আর বদনাম হজম করলো, তলোয়ার দিয়ে দিতে স্বীকৃত হলো, বিদ্রোহের অভিযোগ মাথা পেতে নিলো, নিজের বন্ধুদের কাছে মাথা নীচু করতেও লজ্জিত হলো না, কিন্তু তার জন্য সৈন্য বাহিনীতে অশান্তি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হোক্ তা কিছুতেই হ'তে দিলো না যে বীর অসংখ্য যুদ্ধের পরীক্ষায় নিজের বাহাদুরী প্রমাণ করেছে আজ তার কি দুর্দশা। আজ আর অপরের মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দেবার জন্য তার হাত উঠলো না, মন নেচে উঠলো না, সে নিশ্চুপ রইলো। তার দেহে যেন এত টুকুও শক্তি এলো না। সে করুণ দৃষ্টিতে সঙ্গীদের দিকে চেয়ে ভগ্ন হৃদয়ে সেখান থেকে চলে এলো এবং একটা গুহায় লুকিয়ে বসে

রইলো। যখন সূর্য ডুবে গেল তখন সে মনস্থির করে ফেললো যে, "এই বদনামের বোঝা অবশ্যই দূর করবো, ঈর্ষিতদের লজ্জার কূপে নিক্ষেপ করবো।"

মস্‌দ ফকিরের ছদ্মবেশ ধারণ করলো—মাথায় লোহার টুপির বদলে লম্বা জটা, দেহে বর্মের পরিবর্তে গেরুয়া বস্ত্র, আর হাতে তলোয়ারের বদলে ভিক্ষা পাত্র। যুদ্ধের পরিবর্তে ফকিরের উচ্চালাপ। সে নিজের নাম রাখলো—"শেখ মখমুর।"

এই সাধু কিন্তু অন্যান্যদের মত ধুনী জ্বালিয়ে গাছতলায় ছাই ভস্ম মেখে বসে থাকলো না, তাদের মত আত্মপ্রচারও করতে শুরু করলো না। সে শত্রু সেনা শিবিরে গিয়ে সিপাইদের কথাবার্তা শুনতো। তাদের কার্যকলাপের ওপর দৃষ্টি রাখতো, কখনো কেল্লার পাঁচিল দরজা ইত্যাদি নিরীক্ষণ করতো। সর্দার নমকখোরের বাঁচবার একটুকু আশা নেই এই রকম অবস্থায় তিনি তিনবার পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। আর সব সম্ভব হ'ল একমাত্র শেখ মখমুরের কেরামতিতে। মিনকাদের কেল্লা নিশ্ছিদ্র, পাঁচহাজার সশস্ত্র সৈনিক সর্বদা প্রস্তুত। ত্রিশখানা কামান আর দু'হাজার তীরন্দাজ শুধুমাত্র হুকুমের অপেক্ষায়। কিন্তু সর্দার নমকখোর যখন মাত্র দু'হাজার সৈন্য নিয়ে মিনকাদের কেল্লা চড়াও হ'ল তখন তার পাঁচহাজার রক্ষী কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে। কামান থেকে গোলা ছুটছে না, তীর গুলো হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে। আর এ সবই সম্ভব হল শেখমখমুরের কেরামতিতে। সে তখন সেখানেই ছিল। সর্দার দৌড়ে এসে তার পায়ের ধুলো মাথায় নিলেন।

চার

কিশওয়র কুশা দ্বিতীয়ের রাজ দরবার। শরাব পানের প্রতিযোগিতা চলছে। বিভিন্ন সর্দার, আমীর ও রসিক ব্যক্তিরা নিজ

নিজ মান মর্যাদা অনুসারে নির্দিষ্ট স্থানে বসে আছে। আচমকা দূত এসে খবর দিলো যে মীরজুজা পরাজিত ও নিহত। একথা শুনে কিশওয়র কুশা চিন্তান্বিত হলেন। সর্দারদের সম্বোধন করে বললেন, "আপনাদের মধ্যে এমন বীর কে আছেন যিনি এই বদমাইস সর্দারের কাটা মুণ্ড আমাকে পেশ করতে পারেন? বড্ডবেশী বেড়ে গেছে, শয়তানটা। আপনাদেরই বাপঠাকুর্দা তলোয়ারের জোরে এই জায়গা দখল করেছিলেন। আপনারা কি তাঁদের যোগ্য বংশধর নন?"

একথা শুনে সর্দারেরা সবাই চুপ। তাদের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠলো। বাদশাহের আমন্ত্রণে সাড়া দেবার মত সাহস কারো নেই। শেষপর্যন্ত শাহ কিশওয়র কুশার বুড়ো কাকা নিজে উঠে বললেন—"হে শাহী জওয়ানেরা, আমি নিজে দায়িত্ব নিচ্ছি। যদিও আমি বুড়ো হয়েছি, বাহুতে আর তলোয়ার ধরার মত শক্তি নেই, তবু আমার রক্ত এখনও গরম। আর সেই উৎসাহটুকু আছে যার সাহায্যে একদিন আমরা শাহবামুরাদের কাছ থেকে এই দেশ ছিনিয়ে নিয়ে ছিলাম। হয় আমি এই প্রচেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করবো, নতুবা এই অপবিত্র কুকুরের মত দেহখানা ধুলোয় মিশিয়ে দেবো। এই সাম্রাজ্যের এমন ভগ্নদশা আমি আর সহ্য করতে পারছি না।" এই বলে আমীর পুরত্তদবীর ওখান থেকে উঠলেন এবং মহোৎসাহে সৈন্যসজ্জার কাজে লেগে গেলেন। তিনি জানতেন এটাই তার জীবনের শেষ যুদ্ধ—এখানে পরাজিত হ'লে মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন গতি থাকবে না। ও'দিকে সর্দার নমকখোরও ধীরে ধীরে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। হঠাৎ তিনি খবর পেলেন যে আমীর পুরত্তদবীর বিশ হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছেন।

এই খবর পেয়ে সর্দার নমকখোরের বুক দুরু দুরু করে উঠলো। আমীর পুরত্তদবীর এই বৃদ্ধ বয়সেও একজন সিপাহসালার ছিলেন। তার নাম শুনে বড় বড় যোদ্ধাও পেছিয়ে আসতেন। সর্দার নমকখোর

জানতে পারলেন যে আমীর কোথায় যেন খোদার আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন। তার বিরুদ্ধে আমীরকে দেখে তার সমস্ত সাহস উবে গেল। এখানে পরাজিত হলে এতদিনের এত পরিশ্রম জলে যাবে। সবাই মিলে ঠিক করলেন যে ফিরে যাওয়াই মঙ্গল। সেই সময় শেখমখমূর বলল, "ওহে সর্দার নমকখোর, তুমি জয়ন্তনিশা মুক্ত করবার সংকল্প নিয়েছো! এই তোমার সাহস? তোমার সর্দার আর সিপাইরা তো কখনো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পেছপা হয়নি? তীর বর্ষণ তো তোমার কাছে জলের মত তুচ্ছ, বন্দুকের গুলি যেন ফুলের বাহার। এই চিন্তাধারা কি তোমার মন থেকে এত তাড়াতাড়ি মুছে গেল? এই যুদ্ধেও তুমি নিজ সাম্রাজ্য বাড়াবার আকাঙ্ক্ষা ছেড়ো না। তুমি সত্য ও ন্যায়ের পথেই অগ্রসর হোচ্ছ। তোমার উৎসাহ কি এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল? তোমার তলোয়ারের তৃষ্ণা কি এত তাড়াতাড়ি মিটে গেল? তুমি জানো যে সর্বদা ন্যায় ও সত্যেরই জয় হয়—তোমার এত প্রচেষ্টার পুরস্কার নিশ্চয়ই পাবে। কিন্তু এখনই কেন আশা ছেড়ে দিচ্ছো? তোমার ভয়টা কিসের—আমীর পুরন্দবীর খুব বড় বীর, কৌশলী যোদ্ধা এইতো। কিন্তু সে যদি বাঘ হয় তো তুমি হলে শিকারী, তার তলোয়ার যদি লোহার হয়, তবে তোমারটা ইস্পাতের, তার সিপাইরা যদি জনে জনে যুদ্ধ করে তবে তোমার সিপাইরা শুধু মাথা কাটাবার জন্য প্রস্তুত থাকবে। শক্ত হাতে তলোয়ার ধরো আর ভগবানের নাম স্মরণ করে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। তোমাদের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিই যেন বলে দেয়—যুদ্ধক্ষেত্র তোমাদের দখলে।"

এমন উদ্দীপনাময় বক্তৃতায় সর্দারের উৎসাহ স্ফীত হয়ে উঠল। তাঁর চোখ লাল হ'ল, তলোয়ারের রঙও যেন বদলে গেল। সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করলেন। তখন শেখ মখমূর তার ফকিরীবেশ ত্যাগ করল, ভিক্ষাপাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিল, সেই হাতে তুলে নিলো সেই তলোয়ার খানা যেটা একদিন তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

তারপর অন্যান্য সিপাই ও অফিসারদের পাশাপাশি তাদের উৎসাহ দিতে দিতে বাঘের মত এগিয়ে চলল।

তখন মধ্যরাত্রি, আমীরের সৈন্যরা কেল্লায় ফিরেছে; বেচারারা দম নেবারও সময় পেলো না, হঠাৎ শুনলো সর্দার নমকখোর সসৈন্যে এগিয়ে আসছেন। তাদের সমস্ত সাহস, তেজ শেষ। আমীর কিন্তু বাঘের মত গর্জন করতে করতে তাঁবুর বাইরে এলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সৈন্য সাজিয়ে ফেললেন—যেন হঠাৎ কোথা থেকে এক মালী এসে ছড়ানো ফুলগুলো দিয়ে একটা তোড়া বানিয়ে নিয়ে গেল।

উভয় পক্ষ কালোকালো পাহাড়ের মত মুখোমুখি। তোপ দেগে উঠলো, তার গম্ভীর আওয়াজে যুদ্ধ শুরু হ'ল। একটা পাহাড় যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল, আর অকস্মাৎ হ'ল সংঘর্ষ; এমন ভীষণ সংঘর্ষ যে মাটি উঠলো কেঁপে, প্রচণ্ড যুদ্ধ বেধে গেল। মখদুমের তলোয়ার তখন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে, যেদিকে চলেছে সেদিকেই জমে উঠছে লাশের পাহাড়, শত শত সৈনিক যেন সেই তলোয়ারের কাছে নিজেকে ভেট দিচ্ছে।

ভোরের আলো যখন ফুটলো তখন অজস্র রক্তধারা বয়ে চলেছে আলো আরো বাড়তে দেখা গেল যেন মড়ার হাট। যেদিকে চোখ যায় শুধু কাটা মাথা আর হাত পা'য়ের টুকরো গুলো যেন রক্তনদীতে সাঁতার কাটছে। আচমকা শেখ মখদুমের কামান থেকে প্রচণ্ড জোরে একটা গোলা ছুটে এল, যার আঘাতে আমীর পুরুতদবীর ইহলোক ত্যাগ করলেন। আমীরের মৃত্যু হতেই শাহী ফৌজ রণক্ষেত্র ছেড়ে পালালো। বিজয় পতাকা উড়িয়ে সর্দারী সৈন্যরা রাজধানীর দিকে এগিয়ে চলল।

বিজয়ী সৈন্যদল যখন শহরে প্রবেশ করলো, তখন স্বাধীনতা প্রেমী সমস্ত স্ত্রী পুরুষ তাদের অভিনন্দন জানাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। সারা শহর আনন্দে আত্মহারা। লোকেরা সিপাইদের আলিঙ্গন

করছে, গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছে, যেন খাঁচায় আবদ্ধ বুলবুল বহুকাল পরে মুক্তি পেয়ে ফুলে ফুলে চুমু খেয়ে যাচ্ছে। লোকে শেখ মখমুরের পায়ের ধূলো মাথায় নিচ্ছে, সর্দারের পায়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করছে।

এই সুযোগে মসূদ তার যোগীর বেশ ফেলে দিয়ে সিংহাসনের দাবী অনায়াসে জানাতে পারতো। কিন্তু যখন দেখলো জনগণের মুখে মালিকা শের আফগানের নামই বেশী শোনা যাচ্ছে তখন সে চুপ করে গেল। সে ভালো ভাবেই জানতো যে তখন যদি সে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দেয় তবে মালিকা সহজেই বাতিল হয়ে যাবেন। কিন্তু তখনও বিনা যুদ্ধে এর মীমাংসা হবার সম্ভাবনা অনিশ্চিত থেকে যাচ্ছে। এমন একজন উৎসাহী, তাজা যুবকের পক্ষে ইচ্ছে গুলো দমিয়ে রাখা সহজসাধ্য ছিল না। যখন সে ভাবতো যে এই এলাকার বাদশাহ হব আমি, তখন তার শিরায় শিরায় যেন শিহরণ বয়ে যেত। শাহ বামুরালের অন্তিম ইচ্ছার কথা কি কখনো ভুলতে পারে? সারাদিন সে বাদশাহ হবার ফন্দী আঁটতো আর রাত্রিবেলা বাদশাহীর স্বপ্ন দেখতো। তার এই বিশ্বাস ছিল যে, আমি বাদশাহ হবো, আমাকে বাদশাহ হতেই হবে। হায়রে, আজ বোধহয় সে স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেল। কিন্তু মসূদের চরিত্রের এক বড় গুণ ছিল স্ত্রী জাতির প্রতি মর্যাদা বোধ। সে একটু আফশোসও করলো না, একটা ঠাণ্ডা দীর্ঘশ্বাসও ছাড়লো না, বরং সেই প্রথম পুরুষ যে মালিকা শের আফগানের হাত চুম্বন করে মাথা নীচু করে তাঁকে সম্মান জানালো। যে সময় সে মালিকার হাত চুম্বন করছিল তখনই তার সারা জীবনের আকাঙ্ক্ষা অশ্রুবিন্দু হয়ে মালিকার মেহেন্দী আঁকা হাতের ওপর টপ্ করে পড়লো যেন মসূদ তার কামনার মুক্তো মালিকার হাতে সঁপে দিল। মালিকা হাত সরিয়ে নিয়ে ফকীর মখমুরের মুখের পানে প্রেমভরা দৃষ্টিতে তাকালেন। সাম্রাজ্যের সকল দরবারী নিজ নিজ ভেট্ প্রদান করার পর তোপধ্বনি শুরু হল। শহরের

চতুর্দিকে উৎসবের ধুম লেগে গেল, যেদিকে তাকানো যায় শুধু খুশীর আমেজ।

সাম্রাজ্য পত্তনের তৃতীয় দিনে মসুদ পূজা অর্চনায় ব্যস্ত। এমন সময় মালিকা শের আফগান একা একা তার কাছে এসে বললেন, "মসুদ, আমি একটা অকিঞ্চিৎ উপহার নিয়ে এসেছি তোমার জন্য, সেটা হ'ল আমার হৃদয়। তুমি কি আমার কাছ থেকে এটা নেবে না?" মসুদ অবাক হয়ে গেল। কিন্তু মালিকার প্রেমভরা চোখে চোখ রেখে সে আর নিজের ইচ্ছেকে দমিয়ে রাখতে পারলো না, তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললো, "একদিন তো তোমার বর্শার আঘাতে আমি আহত হয়ে ছিলাম, আমার ভাগ্য যে তুমি মলম নিয়ে এসেছো।"

জন্নতনিশাঁ এখন স্বাধীন, খুশীতে ভরপুর। একবছরও হয়নি মালিক শের আফগান গদিতে বসেছে, কিন্তু এর মধ্যেই দেশের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। আর তা সম্ভব হয়েছে তাঁর প্রিয়তম মসুদের জন্যই, যে এখনো ফকীর মখমূরের ছদ্মবেশে রয়েছে।

পাঁচ

রাত্রিবেলা শাহীদরবার সুসজ্জিত, বিভিন্ন আমীর ওমরাহরা নিজ নিজ পদাধিকার অনুযায়ী বসে আছে, চাকর খানসামা প্রস্তুত। এমন সময় একজন খিদমতগার এসে জানালো,—হে জগৎ সংসারের রাণী, এক গরীব স্ত্রীলোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আপনার সাক্ষাৎ-প্রার্থী।" মালিকা তাঁকে ভেতরে আনতে হুকুম করলেন। খিদ-মতগার বাইরে চলে গেল, কিছুক্ষণ বাদে এক বুড়ি লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ভেতরে এল, পুঁটলি থেকে একটা মণিমুক্তা খচিত মুকুট বার করে বললো—তোমরা এটা নিয়ে নাও, এখন এটা আমার আর কোন কাজে লাগবে না; আমার স্বামী মরবার সময় বলে গিয়েছিলেন যে, মসুদকে দিয়ে বলবে যে সেই এর মালিক। কিন্তু এই খুখুরী

বুড়ি আমি কোথায় মসুদকে খুঁজে পাবো। কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেলাম, সারা দুনিয়া খুঁজে ফিরলাম তবু তার দেখা পেলাম না। এ-জীবনে আর শ্রদ্ধা নেই, বেঁচে থেকে কি করবো। এই মুকুটটা আমার কাছে ছিল, যে হোক কেউ নিয়ে নাও।"

সারা সভা নিস্তব্ধ, সভাসদ্‌রা যেন পাথরের মূর্তি, যেন কোন এক জাদুকরের ইশারায় সবার দমবন্ধ হয়ে গেছে। আচমকা মসুদ উঠে দাঁড়ালো, তারপর বুড়ি রিন্দার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়লো। রিন্দা তার কলজের হারানো টুকরো খুঁজে পেয়ে বুকে টেনে নিলো, সেই রত্নখচিত মুকুটখানা তার মাথায় পরিয়ে দিয়ে বলল, "মশাইরা, এই আমার আদরের মসুদ, শাহ বামুরাদের পুত্র, তোমরা হলে এর প্রজা, মুকুট এর, এই দেশ এর, এই সমস্ত সৃষ্টিই এর। আজ থেকে মসুদ এই সাম্রাজ্যের বাদশাহ, মাতৃভূমির সেবক।"

শেষ বিচারের রায়ে সকলে খুশী হ'ল, দরবারী এসে মসুদের হাত ধরে নিয়ে গেল সিংহাসনের কাছে এবং মালিকা শের আক-গানের পাশে বসিয়ে দিল। ভেট দেওয়া হল, গায়ক খুশীর গান গেয়ে উঠলো, বাজনাদাররা আনন্দে বাজাতে শুরু করলো। কিন্তু আনন্দ উচ্ছ্বাস স্তিমিত হতে লোক রিন্দার দিকে তাকিয়ে দেখলো তার ইহজীবন শেষ হয়েছে। ইচ্ছার পূর্ণ হ'তেই বিদায় নিয়েছে পৃথিবী থেকে। ইচ্ছেগুলো যেন আত্মা হয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল এক দিন সেই নশ্বর দেহটাকে।

———

শোকের পুরস্কার

আজ তিন দিন কেটে গেল। সন্ধ্যার সময় আমি ইউনিভার্সিটি থেকে মহানন্দে ফিরে আসছি। আমার অগণিত বন্ধুবান্ধব আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। খুশীতে আমার হৃদয় নেচে উঠেছিল। এ-জীবনে আমার বড় সাধ ছিল যে এম. এ. পাশ করি। পাশ ত' করলাম, এমন কি আশাতীত ভাল ফল হ'ল। অনেক নম্বর পেয়েছি। ভাইস-চ্যান্সেলর নিজে এসে আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন, বললেন, "ভগবান তোমাকে আরো বড় হবার শক্তি দিন।" আমার আনন্দের কোন সীমা রইল না। আমি সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক, টাকা পয়সা উপার্জন করবার কোন ইচ্ছে নেই, বাবা মা অনেক সম্পত্তি রেখে গেছেন। দুনিয়াতে আনন্দ পাবার মত যা-কিছু দরকার সবই আমি পেয়েছি। সর্বোপরি আমার এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী মন ছিল যা খ্যাতি লাভ করার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল।

ঘরে ফিরলাম। বন্ধুরা এখনও আমার পেছন ছাড়েনি—ওরা ভোজ চায়। বন্ধুদের খাতির তোয়াজ করতে করতেই বারোটা বেজে গেল। তখন শরীরটাকে কোনক্রমে টেনে নিয়ে গেলাম আমার প্রতিবেশিনী মিস্ লীলাবতীর বাড়িতে. সে আমার সঙ্গেই বি এ. পাস করেছে। অপূর্ব সুন্দরী। আহা, যে ভদ্রলোকের সঙ্গে লীলার বিয়ে হবে তিনি কতই না ভাগ্যবান! কি মধুর কণ্ঠস্বর! কত হাসিখুশী। আমি কখনো কখনো ওর বাড়িতে প্রফেসারের কাছ থেকে দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু বুঝতে যেতাম। কিন্তু যেদিন প্রফেসার বাড়ি না থাকতেন সেইদিন আমার কাছে শুভ মনে হ'ত। মিস্ লীলা আমার সঙ্গে অত্যন্ত আবেগ পূর্ণ ভাষায় কথা বলতো। আমার মনে হ'ত যদি আমি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করি তবে হয়তো আমাকে স্বামী হিসাবে

গ্রহণ করতে সে আপত্তি করবে না। আমার সঙ্গে তার রুচির অমিল ছিল না, আমার মতো সেও শেলি, বায়রন আর কীটস্ এর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হ'ত। যখনই কেবল মাত্র আমরা দু'জন গল্প করতাম তখন প্রায়শই প্রেম এবং প্রেমের দর্শন নিয়ে কথাবার্তা হতো। তার সেই ভাবগম্ভীর কথাবার্তা শুনতে শুনতে আমার হৃদয়েও প্রেমের জোয়ার বয়ে যেত। কিন্তু হায়, আমি আমার মালিক ছিলাম না। উচ্চবংশীয় কোন এক মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যদিও আমি আমার স্ত্রীর রূপ সৌন্দর্য এখনও দেখিনি তবু আমার বিশ্বাস যে মিস লীলার সঙ্গে কথাবার্তায় যে তৃপ্তি আমি পাই তার সঙ্গে তা হয়তো পাব না। বছর দুয়েক আগে তার সাথে আমার বিবাহ হয়েছে, কিন্তু এখনো একটাও চিঠি দেয়নি। আমি দু'তিনটি চিঠি দিয়েছিলাম, তারও কোন উত্তর পাইনি। আমার সন্দেহ হচ্ছে হয়তো সে এইটুকু শিক্ষাও পায়নি।

তবে কি, এইরকম একটি মেয়ের সাথে আমাকে সারাটা জীবন কাটাতে হবে? আমার এতসব আকাশকুসুম কল্পনা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে? চিরকালের জন্য লীলার কাছ থেকে দূরে সরে যাব। না, এ অসম্ভব। আমি কুমুদিনীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না, নিজের বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করব, আমার যত বদনাম হোক, যত হয়রানি হোক্ আমি লীলাকে আপনার করে তুলব।

এইসব চিন্তা করতে করতে আমি ডাইরীতে অনেক কিছু লিখলাম আর টেবিলের ওপর তা খুলে রেখেই বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই, সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি নিরঞ্জন দাস মশাই আমার বিছানার পাশে চেয়ারে বসে আছেন। অত্যন্ত মন দিয়ে তিনি আমার ডাইরিখানা পড়ছেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে আমি সজোরে আলিঙ্গন করলাম। হায়রে, এমন সুন্দর চরিত্রবান যুবকটির সাথে আর কখনো সাক্ষাত হবে না। অকস্মাৎ মৃত্যু এসে তাঁকে আমাদের মাঝ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। নিরঞ্জন-

বাবু কুমুদিনীর সহোদর ভাই, আমার চেয়ে দু-চার বছরের বড় হবেন। সুন্দর স্বাস্থ্য, সর্বদাই হাসিখুশী, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, দিনকয়েক আগে এখানে ট্রান্সফার হয়ে এসেছেন। আমার সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি, তুমি আমার ডাইরি পড়লে ?"

নিরঞ্জন—হাঁ।

আমি—তাহলে কুমুদিনীকে কিছু বোলো না যেন।

নিরঞ্জন—বেশ, বলব না।

আমি—এখন কি ভাবছ ? আমার ডিপ্লোমা দেখেছ কি ?

নিরঞ্জন—বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে, বাবা খুব অসুস্থ, দু-তিন দিনের মধ্যে যেতে হবে।

আমি—শিগ্‌গির গিয়ে ওঁকে সুস্থ ক'রে তোল।

নিরঞ্জন—তুমিও চলো না ? জানি না তিনি কেমন আছেন।

আমি—না, আমাকে মাপ করে দাও।

এরপর নিরঞ্জন দাস চলে গেলেন। আমি দাঁড়ি কামিয়ে জামা-কাপড় বদলে, লীলাবতীর উদ্দেশ্যে চললাম। কিন্তু গিয়ে দেখি দরজায় তালা ঝুলছে। ভাবলাম দিন কয়েক ওর শরীর হয়তো ভাল যাচ্ছে না, তাই হাওয়া-বদল করতে নৈনিতাল গেছে। আর আমি এখানে রয়ে গেলাম। তবে কি লীলা আর আমাকে পছন্দ করছে না ? তবে কেন সে আমাকে কোন খবর দিলনা। লীলা, তবে কি তুমি অকৃতজ্ঞ, কিন্তু তোমার চরিত্রতো সেরকম নয়। তক্ষুনি স্থির করলাম যে, সেই-দিনই নৈনিতাল রওনা দেব। কিন্তু ঘরে ফিরেই লীলার চিঠি পেলাম, চিঠি খুলতে গিয়ে হাত যেন কেঁপে উঠল। লীলা লিখেছে—

"আমি অসুস্থ, বাঁচবার আর কোন আশা নেই। ডাক্তার বলেছেন আমার প্লেগ হয়েছে। যখন তুমি আসবে তার আগেই হয়তো আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে। শেষের এই দিন গুলোতে তোমাকে কাছে না পেয়ে আঘাত আরো বেড়েছে। আমার কথা মনে রেখো।

তোমার সঙ্গে দেখা করে এলাম না—এই আমার আফশোস রয়ে গেল। অভাগিনী লীলাকে ভুল বুঝো না, কসুর মাপ করে দিও।"
আমার হাত থেকে চিঠি ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। আমার চোখের সামনে সমস্ত দুনিয়া যেন অন্ধকার হয়ে গেল—এক গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। আর এক মিনিট সময় নষ্ট না করে আমি বিছানাপত্তর বেঁধে নৈনিতাল যাবার জন্য তৈরী হয়ে গেলাম। ঘর থেকে বেরোতেই প্রোফেসর বোসের সাথে দেখা, কলেজ থেকে ফিরছেন। সারাদেহে গভীর কোন শোকের ছাপ সুস্পষ্ট। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাম বের করে আমার সামনে ফেলে দিলেন। আমার বুকটা ধক্‌ধক্ করে উঠল। দু'চোখে আঁধার দেখলাম। টেলিগ্রাম আর কে তোলে; হায় হায় করে বসে পড়লাম। লীলা, তুমি এত তাড়াতাড়ি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে!

দুই

কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে এলাম। চৌকির ওপর বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে খুব কাঁদলাম। নৈনিতাল যাবার প্রয়োজন মিটে গেছে। দশ বারো দিন পাগলের মত এধার ওধার ঘুরে কাটালাম। বন্ধুরা কিছুদিনের জন্য কোথাও বেড়িয়ে আসতে উপদেশ দিল। আমারও সেটাই ভাল বোধ হ'ল। বেরিয়ে পড়লাম, মাস দুয়েক বিন্ধ্যাচল, পরেশনাথ, পাহাড়ে পাহাড়ে ভবঘুরের মত কাটালাম। নতুন নতুন জায়গা, নতুন নতুন দৃশ্য দেখতে দেখতে মনে প্রাণে কিছু সান্ত্বনা পেলাম। যখন আমি তাবুতে রয়েছি তখন একটা টেলিগ্রাম পেলাম যে আমাকে কলেজের সহকারী অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। নিজের আর এই শহরে ফিরে আসবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু প্রিন্সিপালের কথা অমান্য করতে পারলাম না। নাচার হয়ে ফিরে এলাম,

একেবারে কাজের মধ্যে ডুবে গেলাম। সেই প্রসন্নতা আর ফিরে এল না। বন্ধুবান্ধবদের হৈ-চৈ থেকে দূরে থাকতে লাগলাম, তাদের হাসি ঠাট্টা অসহ্যবোধ হ'তো।

একদিন সন্ধ্যায় আমি নিজের ঘরে অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে কল্পলোকে ভ্রমণ করছি, এমন সময় সামনের বাড়িতে গানের আওয়াজ শুনলাম। আহা, কি সুন্দর স্বর, তীরের মতো হৃদয়ে বিদ্ধ হচ্ছে, কি করুণ স্বর। তখনই আমি বুঝতে পারলাম গানের প্রভাব কতো গভীর লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠলো কি যেন ব্যথায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। দু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল। হায়রে, এই তো লীলার সবচেয়ে প্রিয় গান —"পিয়া মিলন হায় কঠিন বাওরী"

আর স্থির থাকতে পারলাম না। যেন পাগল হয়ে সামনের বাড়ির দরজার কড়া নাড়লাম। তখন আমার এই বোধশক্তি টুকু-ও ছিল না যে, এক অচেনা ভদ্রলোকের বাড়ির দরজায় দাঁড়ানো, তাঁর একান্ত মনঃসংযোগে বিঘ্নসৃষ্টি অসভ্যতা।

তিন

একবুড়ি দরজা খুলে দিল। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চট্ করে ভেতরে চলে গেল। আমিও তার পেছনে চললাম। চৌকাঠ পেরিয়ে একটা বড়ঘরে এসে পৌঁছলাম। মেঝেতে ধবধবে সাদা ফরাশ পাতা রয়েছে, তাকিয়াও আছে দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর ছবি টাঙানো। এক সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক বৈঠকী ঢঙে হারমোনিয়ম নিয়ে গান গাইছিল। শপথ নিয়ে বলতে পারি যে এমন সুন্দর, স্বাস্থ্যবান যুবক এর আগে আমি কখনো দেখিনি। চাল-চলনে মনে হচ্ছে শিখ সম্প্রদায়ের লোক আমাকে দেখে চমকে উঠে হারমোনিয়ম ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। লজ্জায় মাথা নীচু করে ফেলল, যেন একটু ঘাবড়ে গেছে। আমি বললাম, "ক্ষমা করবেন, আমি আপনার

অসুবিধা ঘটালাম। মনে হচ্ছে সঙ্গীত শিল্পে আপনি ওস্তাদ। আগে যে গানটি গাইছিলেন, তা সত্যি বড় ভাল লেগেছে।"

যুবকটি তার বড় বড় চোখ চেয়ে আমাকে কিছুক্ষণ দেখে মাথা নামিয়ে নিল, নীচু স্বরে বলল সে শিক্ষানবীশ্।

আমি বললাম—"আপনি এখানে কদ্দিন এসেছেন?"

যুবক—"তিনমাসের কাছাকাছি।"

আমি—"আপনার পুরো নাম?"

যুবক—"মেহর সিংহ।"

আমি বসে পড়লাম, তারপর তাকে অনেক অনুনয় আবেদন করে হাত ধরে বসিয়ে দিলাম। কথাবার্তায় বুঝলাম তার বাড়ি পাঞ্জাবে, এখানে সে পড়াশুনা করতে এসেছে। সম্ভবতঃ ডাক্তারই তাকে পরামর্শ দিয়েছিল যে পাঞ্জাবের আবহাওয়া তার পক্ষে অনুপযুক্ত। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমি কোন এক স্কুল ছাত্রের সঙ্গে আলাপ করছি। আসলে সামান্য পরিচয় হবার পর আমি সেই গানটি গাইবার জন্য আবেদন করলাম। মেহরসিং মাথা ঝুঁকিয়ে জানাল সে এখনও শিক্ষানবীশ।

আমি—"এ তো আপনার বিনয়।"

মেহর সিং—(লজ্জিত হয়ে) "ফরমাশ্ করুন, হারমোনিয়ম হাজির।"

এরপর আমি গান শুনবার জন্য অনেক আগ্রহ দেখাতেও মেহের সিং-এর লজ্জা আর কমে না। স্বভাবতই শিষ্টাচারকে আমি ঘৃণা করি। যদিও এই সময় আমার ক্রুদ্ধ হবার কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছিল না, তবুও যখন দেখলাম সে কোন অনুরোধই শুনছে না তখন কিছুটা রুক্ষ স্বরেই বললাম—"ছেড়ে দিন। আপনার অনেকই সময় নষ্ট করলাম বলে দুঃখিত। ক্ষমা করবেন।" এই বলে আমি উঠে পড়লাম। আমাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখে মেহর সিং-এর বোধহয় করুণা হল। আমার হাত ধরে বলল—"কিন্তু আপনি যে রাগ করে চলে যাচ্ছেন।"

আমি—"আপনার ওপর রাগ করবার কোন অধিকারই আমার নেই।"

মেহর সিং "আচ্ছা বসুন, আমি আপনার আদেশ পালন করব। কিন্তু এখনও আমি একদম আনাড়ি।"

আমি বসলাম। মেহর সিং হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে গান শুরু করল—"পিয়া মিলন হ্যায় কঠিন বাওরী।"

কি সুরেলা কণ্ঠ, কি মধুর স্বর, কি ব্যাকুল করা ভাব। তার সুর-মাধুর্যের ব্যাখ্যা করা আমার সাধ্যের বাইরে। দেখলাম, গাইতে গাইতে তার নিজেরই চোখ বেয়ে জল পড়ছে। কি যেন এক মোহ আমাকে ঘিরে ধরল। কি যেন মধুর কোমল বেদনায় বুকখানা ভেঙে পড়তে লাগল। চোখের সামনে এক সবুজ প্রান্তর ভেসে উঠল—আর আমার লীলা, আমার আদরের লীলা সেই মাঠে বসে অনুতাপভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। গভীর এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছু না বলেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। মেহর সিং আমার দিকে তাকাল। মুক্তোবিন্দুর মত তার চোখে জল টলটল করছে, বলল, "মাঝে মাঝে আসবেন।" আমি তাড়াতাড়ি উত্তর করলাম—"আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল।"

চার

ধীরে ধীরে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে যতক্ষণ পর্যন্ত না মেহর সিং-এর বাড়ি গিয়ে দু চারটে গান শুনছি ততক্ষণ মনে কোন শান্তি পাই না। সন্ধ্যা হলেই আমি গিয়ে হাজির হই। কিছুক্ষণ গান শুনবার পর তাকে পড়াতে বসতাম। এমন বুদ্ধিমান বুঝদার ছেলেকে পড়িয়ে আমি খুব তৃপ্তি পেতাম। মনে হ'ত যেন আমার এক একটা কথা ওর হৃদয়ে গেঁথে যাচ্ছে। যতক্ষণ আমি পড়াতাম ততক্ষণই সে প্রাণপণে কান খাড়া করে বসে থাকত। যখনই

তাকে দেখতাম, তখনই সে পড়াশুনায় ডুবে আছে। সারা বছর ধরে জ্ঞানের এই চর্চার ফলে সে ইংরেজীতে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করল। সাধারণ চিঠিপত্র লিখতে লাগল এবং দ্বিতীয় বছর চলতে চলতেই সমস্ত ছাত্রদের চেয়ে এগিয়ে গেল। যত শিক্ষক অধ্যাপক ছিলেন সকলেই তার জ্ঞানের গভীরতায় আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তার ব্যবহার এত সুন্দর ছিল যে কেউই তার নিন্দা করতে পারত না। স্কুলের সকল আশাভরসা হয়ে উঠল সে। সে শিখ হওয়া সত্বেও এবং সুন্দর চেহারার অধিকারী হলেও খেলাধুলোয় তার আগ্রহ ছিল না। আমি কখনো তাকে ক্রিকেট খেলতে দেখলাম না। সন্ধ্যা হলেই সে সোজা ঘরে ফিরত এবং লেখাপড়ায় ডুবে যেত।

তার সাথে আমার মেলামেশা এত গভীর হ'ল যে মনে হ'ল সে যেন শিষ্য থেকে আমার বন্ধু হয়ে গেছে। বয়সের তুলনায় তার জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা আশ্চর্য রকম ছিল। দেখে মনে হ'ত না যে ১৬-১৭ বছরের বেশী বয়স, কিন্তু যখনই কোন দুর্বোধ্য কবি কল্পনা, কোমল ভাব ইত্যাদি ব্যাখ্যা করতাম এক একটা কথায় তখনই সে সমস্ত কিছু বুঝে ফেলত। এক দিন জিজ্ঞাসা করলাম,—"মেহর সিং তুমি কি বিয়ে করেছো ?"

লজ্জা পেয়ে সে উত্তর দিল —"না।"

আমি—"কেমন মেয়ে তোমার পছন্দ।"

মেহর সিং - "আমি বিয়ে করব না।"

আমি—"কেন ?"

মেহর সিং—"আমার মত মূর্খ, গোঁয়ারকে কোন মেয়ে পছন্দ করবে ?"

আমি—"তোমার মত যোগ্য পাত্র খুব কমই আছে।"

মেহর সিং চকিতে আমার দিকে একবার চেয়ে বলল, "আপনি ঠাট্টা করছেন ?"

আমি—"না, না, ঠাট্টা নয়, আমি সত্যি বলছি। এত কম

সদগতি

প্রভাতের আলো না ফুটতেই চামার বস্তীর মেয়ে পুরুষ সকলেই আপন কাজে ব্যস্ত। ঘর-দুয়ার পরিষ্কার হয়ে গেলে মনিব বাড়ি যেতে হবে—তবে আহার্যের ব্যবস্থা হবে। দুখী চামার উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে, বউ ঝুরিয়া গোবর-মাটি দিয়ে ঘর নিকোতে শুরু করেছে। হাতের কাজ শেষ করে বউ বললে ওগো—এবেলা গিয়ে ঠাকুর-মশাইকে বলে এসো না, এর পরে গেলে কিন্তু আর তেনার দেখা পাবে না তা বলে রাখছি।

দুখী—যেতে তো হবেই, তা কোথায় বসতে দিবি বল্ দিকিন?

ঝুড়িয়া—পণ্ডিতগিন্নীর কাছ থেকে একটা খাটিয়া চেয়ে আনলে হয় না!

দুখী—তোর কথা শুনলে আমার গা জলে যায়, পণ্ডিতগিন্নী দেবে খাটিয়া! একটু আগুন চাইলেই পাওয়া যায় না, তায় আবার খাটিয়া। মাঝে মাঝে তুই এমন সব কথা কস! বলি গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলেও যেখানে এক গেলাস জল পাওয়া ভার, আর তুই কিনা ভাবছিস খাটিয়া চাইতে যাবি, যাও না যাও নাকি খাওয়া কপাল—না খেলে কি দুঃখ হয়! আরে বাপু এ কি আমাদের ঘুঁটে—কাঠ, খড়, ভুষি—যে যত খুশি তুলে নিবি, এ হল গিয়ে তোর ভদ্দর নোকের খাটিয়া। বাজে কথা রেখে নিজে চারপায়েটাকে ধুয়ে মুছে রাখ দিকিনি, গরমের দিন—এক্ষুনি শুকিয়ে যাবে।

ঝুড়িয়া—তোমার যেমন কথা, বাবা আমাদের কত নেয়ম-ধম্ম মেনে চলেন—আমাদের চৌকিতে বসতে যাবেন কেন শুনি?

দুখী চিন্তিত হয়ে বল্লে—হক কতাই বলিচিস। তা একটা ঠ্যাঙা নিয়ে আয় দিকিন কিছু মৌয়ার পাতা পেড়ে চটপট একটা চাটাই করে নি, ওতেই হয়ে যাবে খন। ডাবড় ডাবড় রাজ-রাজরা ওতে করে খাচ্ছে আর তোর পণ্ডিত তো কোন ছার।

ঝুড়িয়া—সেটা আমিই করবো খন, তুমি এখন যাও তো বাপু। ওদিকে আবার সিধের যোগাড় করতে হবে। মোদের থালায় দিলে তো দোষ নেই?

দুখী—ও কাজও করতে যাবিনি বলে রাখছি, সিধের সাথে সেটিও যাবে। পান থেকে চুণটি খসবার উপায় নেই, একবারে কুরুক্ষেত্তর বাধিয়ে দেবেন। সে রাগ থেকে গিন্নীমারও নিস্তার নেই, ছেলেপুলে-গুলোকে গরুর মত পেটাতে থাকে। এই তো সেদিন বাইরে থেকে মাথা গরম করে ঘরে গিয়েই সামনে যেটাকে পেয়েছে মেরে আধমরা করে তবে ছেড়েছেন। বেচারা ভাঙ্গা গাং নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ভাল চাস তো সিধেতে হাত ঠেকাবি না এই বলেদিলাম। ঝুরি গৌড়ের বিটিকে নিয়ে সাউজীর দোকান থেকে মাল কিনবি। একসের আটা, আধসের চাল, একপো ডাল, আধপো ঘী, নুন, হলুদ আর চার আনা পয়সা দিয়ে পাতার চাটাইয়ে সিধে সাজিয়ে নিয়ে যাবি। খবরদার তুই ছুবি না। গৌড়ের বিটিকে না পেলে ভুজিনের হাতে পায় ধরে নিয়ে যাবি। তুই ধরলে সব বরবাদ হয়ে যাবে, শাপ শাপান্তের একশেষ করবে।

অর্ঘ্য প্রদানের আংশিক ক্রিয়া সমাপ্ত করে গৃহকোণ থেকে লাঠি তুলে নিল। উঠানের এক পাশে পড়ে থাকা ঘাসের বোঝাটি মাথায় নিয়ে ঠাকুর মশাই-এর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হোল। খালি হাতে তো আর বাবাজী দর্শন করা যায় না। এ ছাড়া কিবা আছে তার। খালি হাতে দেখলে তো তিরস্কারের বন্যা প্রবাহিত হবে।

পণ্ডিত খাসীরাম ঈশ্বরের একনিষ্ঠ সেবক। শয্যা ত্যাগ করেই উপাসনা শুরু করেন।

স্নান সারতে প্রায় ৮।৯ টা বেজে যায়। এর পর চলে আসল

পূজার আয়োজন। নৈবেদ্যের গুরুভাগই ভক্তি। অর্ধঘণ্টা চন্দন পিষ্ট করে আয়নার সামনে বসে দেহকে চর্চিত করেন চন্দন তিলকে। কপাল থেকে মুণ্ডিত মস্তকের মধ্যভাগ পর্যন্ত রেখাদ্বয়ের মধ্যে সিন্দুরের লাল লাল সুদৃশ্য বিন্দু সুচারুরূপে শোভা পায়। একে একে বক্ষ, বাহু চন্দনের সুগোল মুদ্রিকায় সুশোভিত হয়। দেহচর্চা শেষ করে বিগ্রহকে সুনিপুণ হস্তে স্নান-আচ্ছাদিত করে চন্দন আদি সুগন্ধি দ্রব্যে, পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করে আসনে স্থাপন করেন। শঙ্খ-ঘণ্টার শব্দ, ধূপের গন্ধ চতুর্দিক আমোদিত করে। পূজা শেষ হতে ১০টা-১১টা বেজে যায়। ততক্ষণে দু চার জন যজমানের আগমন ঘটে। ভগবৎ ভক্তির ফল হাতে হাতেই মিলে যায়। ভক্তবৃন্দের প্রণামীতে বাবাজীর রোজগার বেশ ভালই।

আজ ঠাকুর ঘর থেকে নির্গত হয়েই দুখী চামারকে দেখে উৎসুক নয়নে তাকিয়ে রইলেন। পণ্ডিতজীকে দর্শন করে দুখী সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে হাতজোড় করে ভক্তি নম্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এই তেজস্বী মূর্তি দর্শন করে তার হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে গেল। বেঁটে খাটো গোলগাল মানুষটি, চকচকে টাক, পরিপুষ্ট গণ্ডদেশ, ব্রহ্মতেজ পূর্ণ দীপ্ত নেত্র, চন্দন তিলকে চর্চিত এক দিব্যমূর্তি তার সম্মুখে দণ্ডায়মান। দুখীকে দেখে তিনি শ্রীমুখে বললেন—আজ কি ব্যাপার দুখিয়া?

অবনত মস্তকে দুখী বলে—বিটির বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করিচি বাবাজী। এট্টা ভাল দিন ঠিক করে দিতি হবে। আপনার কখুন সময় হবে?

ঘাসী—আজতো আমার মরবার ফুরসৎ নেইরে। সন্ধ্যের আগে তো হবেই না।

দুখী সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া—এট্টু কেরপা করুন বাবা যাতে তাড়াতাড়ি হয়। সিধে ঠিক করে রেখে এইচি। এই ঘাস গুলোন কোথায় রাখব বাবা?

ঘাসী—গরুর সামনে দিয়ে দে। আর শোন্, সদরটা একটু সাফ

করে দিবি সেই সঙ্গে কাণ্ডারি ঘরটাকে গোবর-মাটি দিয়ে নিকিয়ে রাখবি। তখন আমি চারটি সেবা করে আসি। রাধা-মাধব, রাধা-মাধব। ওরে দুখে ওই কাঠটাকে চিরে রাখিস বাপ। মাঠে কয়েক বোঝা ভূষি পড়ে আছে তাও তুলে এনে ঠিক করে রেখে দিবি। ওরে সেবা কর সেবা কর। সেবাতেই জীবের মুক্তি। রাধামাধব, রাধামাধব তুমিই সত্য, সব মিথ্যে।

দুখী তৎক্ষণাৎ বাবজীর আদেশ রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে উঠল। আত্মভোগী বাবাজীর বেগার খাটতে গিয়ে দুখী অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লো। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। খিদে তৃষ্ণায় চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগল। ওদিকে পণ্ডিতজী নানাবিধ ব্যঞ্জন সহযোগে আত্মসেবায় মগ্ন। সকাল থেকে দুখী দাঁতে কুটো কাটেনি। বাড়ি যাবার এখন কোন উপায় নেই। প্রায় মাইল খানেক দূর হবে। খেতে গেলে বাবাজী রেগে অগ্নিশর্মা হবেন। ওই অবস্থায় সেই মোটা কাঠের গুঁড়ি চেরাই করতে কুড়ুল নিয়ে এগিয়ে এল। কয়েক ঘা লাগিয়ে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। ঘর্মাক্ত বুকের পাঁজরা হাপরেরমত ওঠা নামা করছে। চোখে-মুখে অন্ধকার দেখতে লাগল। এই অবস্থায় একটু জল পেলে ভাল হোত। প্রায় আধ ঘণ্টা পর একটু সুস্থ বোধ করে একটু শক্তি পাবার জন্য তামাকের সন্ধানে গেল। এখানে তো সবাই ব্রাহ্মণ। ছোটলোকদের মত তামাক খুব কম লোকেই সেবন করে। আচ্ছা দূরের ঐ ছোট কুটিরে শুনেছি এক ঘর গোঁড়ের বাস। গিয়েই দেখা যাক্—এই সকল নানা কথা চিন্তা করতে করতে দুখী এগিয়ে গেল। ওখানে কলকে আর তামাক দুইই পাওয়া গেল। কিন্তু আগুন না পাওয়ায় দুখী বললো—আগুনের চিন্তে বাদ দাও, ও আমি ঠিক বাবাজীর হেঁসেল থেকে যোগাড় করবো। রান্না-বান্না হচ্ছে দেখে এইচি।

পণ্ডিতের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে জোড় হাতে বললে—মাপ করেন ঠাকুরজী, এট্টু আগুন পেলি তামুক টানতাম।

পণ্ডিত তখন ভোজনে ব্যস্ত। বিরক্তি পূর্ণ দৃষ্টিতে গৃহিণীর প্রশ্ন—আগুন চাইছে, এটা আবার কে ?

পণ্ডিত—ওহো, ওটাতো দুখী চামার। কাঠের গুড়িটাতো ওই চিরছে। দিয়ে দাও না, চাইছে যখন।

গিন্নী ঝংকার দিয়ে বলে উঠল—পুথি-পত্তর পড়ে তোমার মাথাটা গেছে। ধম্ম-কম্ম, জাতজন্ম আর রইল না। মুচি, মেথর-মুদ্দোফরাস কেউ আর ঘরে ঢুকতে বাকী রইল না। মুখপোড়া মিন্‌সেকে চলে যেতে বলো, নয়তো এই চেলা কাঠে ওর মুখ থেঁতো করে দেবো এই বলে রাখছি। আগুন মাঁগা বার করে দেবো।

পণ্ডিতজী স্ত্রীকে বুঝিয়ে বললে—তা এসেছে তো কোন মহাভারতটা অশুদ্ধ হয়ে গেছে শুনি? তোমার কোন সম্পত্তিতে তো হাত দিয়ে ফেলেনি। মাটি শুদ্ধু। ওতে দোষ নেই। কাজটা আমাদেরই তো, নাকি ওর? একটু আগুন দিলে কি হতো? লোক লাগিয়ে কাটালে কম-সে-কম আনা চারেক নিয়ে নিত।

গৃহিণী গজরাতে গজরাতে বলে—তাবলে ঘরে ঢুকে পড়তে হবে?

অগত্যা পণ্ডিত হার স্বীকার করে বললো—আর কেন? ওর কপাল মন্দ, তাই তোমার পাল্লায় পড়েছে।

পণ্ডিতগিন্নী—ঠিক আছে, এবারকার মতন দিলুম, আর এসে দেখুক, ওর ওই মুখ আমি আগুনে না জ্বালিয়ে দি তো মিছেই আমি পণ্ডিতগিন্নী

বেচারা দুখীও পণ্ডিতগিন্নীর কথা শুনে অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করলো। এ ধরনের বিবেচনা রহিত কাজের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো। গিন্নীমা ঠিকই বলেছে। চামার যে চামারই। এই গেরামে জন্মে বুড়ো হতে চললুম, আক্কেল বলে আর কিছু কি থাকতে নেই? বামুনরা কত পবিত্তর-শুদ্ধু, সর্বলোকে পূজিত, আর আমি কিনা শুদ্দুরের অধম হয়ে......। ছি-ছি-ছি।

পণ্ডিতগিন্নী তামাক খাবার আগুন দিতে এলে দুখী নিজেকে ধন্য

মনে করলো। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে করজোড়ে বলে— মা ঠাকুরুণ বড় অপরাধ হয়ে গ্যাছে। মাফ করে দ্যান মা।

চামারের মূর্খতার জন্য মিথ্যে লাথি খাঁটা জুটল। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া আর কি—পণ্ডিত গিন্নীর হাতে ধরা এক চিমটের মুখে জলন্ত কাঠ। হাত পাঁচেক দূর থেকে দুখীকে উদ্দেশ্য করে ছুড়ে দিল। আগুনের কিছু ফুলকী এসে দুখীর মাথায় পড়ল। শীঘ্র একটু সরে এসে মাথা ঝেড়ে ফেলে মনে মনে বললো—পবিত্তর বামুনের ঘরদোর অপবিত্তর করার সাজা। ঠিক হয়েছে, এমনটি না হলে হুঁস হবে নি। ভ্যামান হাতে হাতে ফল দেখিয়ে দিল। এর লেগেই তো সবাই বামুনদের ভয় করে। সকলের টাকা মার গেলেও ভেনাদের টাকা ছুবার সাহস স্বয়ং শিবেরও নেই। বাবা। একি যে সে তেজ, একবারে ব্রহ্মতেজ। কোপে পড়লে হাত-পা পচে গলে পড়বে।

বা ভর বাইরে এসে তামাক টানতে লাগল। আধঘণ্টা বিশ্রাম করে এই শক্তি সঞ্চয় করে পুনরায় কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটার চেষ্টা করতে শুরু করলো।

দুখীর উপর আগুন পড়ে যাওয়ায় পণ্ডিত গিন্নীর মনে কিঞ্চিৎ দয়ার উদ্রেক হোল। পণ্ডিতের আহার সমাপ্ত হোলে বল্লে—হ্যাঁ গা, চামার বেটাকে তো কিছু খেতে দেওয়া দরকার, সেই সকাল থেকেই কাজ করে যাচ্ছে, বেচারার নিশ্চই খুব খিদে পেয়েছে।

গৃহিণীর এই প্রস্তাবের পরিণতি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে সুদূর প্রসারিত তা অবগত হয়ে বলে—রুটী আছে?

গৃহিণী—দু-চারটে বাচলেও বাচতে পারে। পণ্ডিত—দু-চারটে? ওতে কি হবে? ওতো সমুদ্রে বারি বিন্দু। কম-সে-কম একসের আটার রুটী না হোলে ওর পেটই ভরবে না।

গৃহিণী হাতদিয়ে কান চেপে—আরে বাপ্ রে বাপ! রাক্ষস না কি অ্যাঁ। একসের আটার রুটী! তবে ও খিদে নিয়ে থাকুক।

পণ্ডিত—শোন কিছু ভূষি আটায় মিলিয়ে খান কয়েক লিট্টি করে

দাও। ওতেই শালার পেট ফুলে উঠবে। ছোটলোক গুলোর পেট ভরে না ঐ রুটীতে. জোয়ারের লিট্টি চাই, বুঝলে। গৃহিণী—এখন রাখতো তোমার লিট্টি। আমি যাচ্ছি আর কি এই রোদে। তোমারও যেমন কত্তা।

ওদিকে দুখী তামাক টেনে হাতে পায়ে একটু শক্তি পেয়েছে। কুড়ুল-কাঠে আধঘণ্টা লড়াই হোল। অবসন্ন হয়ে দুখী বসে পড়লো।

এরমধ্যে সেই গোঁড় এসে হাজির হোল। বলে উঠল—কেন অনর্থক চেষ্টা করছো বুড়ো দাদু। যা হবার নয় সেই করছ তুমি। আরে বাবা তুমি ফেটে গেলেও এ কাট ফাটবার নয়। ছেড়ে দাও ওটাকে।

দুখী মাথার ঘাম মুছে বলে—আরে ভাই কপালের গেরো, এখনও একগাড়ি মতন ভূষি আনতে বাকী। গোঁড়—পেটে দানা-পানি পড়েছে কি? না শুধু খাটিয়েই নিচ্ছে। গিয়ে চাইতে পারলে না?

দুখী—কি বলছো ভাই? বামুনের রুটী কি আমাদের প্যাটে সইবে।

গোঁড়—না সইবার কি আছে শুনি? পেলে তো। খেয়ে-দেয়ে গোঁফে তা দিয়ে আরাম করছে, আর তুমি তার হুকুম তামিল করছো। কেন, তুমি কিছু বলতে পার নি? নরম মাটী পেলে বিড়াল খিমচোয় বেশী, একথা তুমি জান না? ওই বক-ধার্মিকদের ফন্দী-ফিকির জানতে আমার বাকী নেই। জমিদারের বেগার দিলেও খেতে পাওয়া যায়, হাকিমও কম-বেশী মজুরী দেয়। ইনি আবার সবার উপরে যান দেখছি, তায় আবার ধর্মাত্মা বনে বসে আছেন।

দুখী—একটু আস্তে আস্তে কও। কেউ শুনলে এক কাণ্ড বাধবে। দুখী আবার কুড়ুলে ঘা মারতে লাগল। দুখীর অবস্থা দেখে গোঁড়ের হৃদয় দয়ায় পূর্ণ হয়ে গেল। ওর হাত থেকে কুড়ুল নিয়ে প্রায় আধ ঘন্টা প্রাণপণে চেষ্টা করেও বিফল হয়ে কুড়ুল ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললো—এ তোমার কর্ম নয়—'মাথের থেকে নিজের রুকাগরা হবে।

দুখী মনে মনে চিন্তা করতে লাগল—কী কাটবে বাবা, এতগুলি ঘা দিলুম এট্টু চিড় খেল না। কদিন ধরে একে চিরবো তা জানি না। ওদিকে আমার হাজার কাজ পড়ে আছে। একলার ঘর, বুড়িয়াটা বা বোকা-হাবরা। না জানি কী কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছে। বাবাজীর আর কি? বলে দিলেই হোল। ওদিকে আবার একরাশ ভূষি তুলতে বাকী। ওটা করে বাবাকে বলবো—বাবা আজ কাঠ কাটতে পারলুম না শত চেষ্টাতেও। কাল এসে কেটে দেবো।

পণ্ডিতজীর বাড়ি থেকে জমি প্রায় দুই ফার্লং দূরে। ডালা ভরতি করে ভূষি আনলে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হবে কিন্তু মাথায় তুলে নেওয়াই সমস্যা। ভরা ঝুড়ি তুলতে সে একা সমর্থ নয়। অগত্যা কিছু কিছু করে তুলে আনাই মনস্থ করলো। ভূষি তুলে আনতে চারটে বেজে গেল। ততক্ষণে পণ্ডিতজী দিবানিদ্রা সেরে উঠেছেন। হাত মুখ ধৌত করে পান মুখে দিয়ে বাড়ির বাইরে এসেছেন। উদ্দেশ্য দুখীর কাজের খোঁজ খবর নেওয়া। দেখেন চামার বেটা ঝুড়ি মাথায় দিয়ে শুয়ে আছে। দেখেই পণ্ডিত অগ্নিশর্মা হয়ে উচ্চ স্বরে বল্লেন—এই বেটা দু খয়া, ব্যাপারটা কি—বলি ব্যাপারটা কি হ্যাঁ, এতক্ষুন ধরে কি করছিস্, হারামজাদা—ইয়াকি পেয়েছিস্, জুতিয়ে তোর মুখ ভেঙে দেবো—আরে রাম-রাম ছুলেইতো এই অবেলায় চান করতে হবে। ভূষি তুলতেই সন্ধ্যে কাবার। আবার চঙ করে শুয়ে আছে। ওঠ শালা, ওঠ, কুড়ুল হাতে নিয়ে কাঠ চিরে রাখ্। নচ্ছার কোথাকার। কাট যদি না কেটেছিস্ তবে তোর বেটীর বিয়ের দিন-ক্ষণ দেখাও ওরকম পড়ে থাকবে এই বলে রাখছি। তখন আমাকে দোষ দিতে পারবিনা—। ছোটলোক আর কাকে বলেছে। আমার সেবায় কোথায় মন-প্রাণ-ধন ঢেলে দিবি, তানয় ফাঁকি দিচ্ছ। দিচ্ছ দাও, কিন্তু এ ফাঁকি তাঁর হিসেবের খাতায় উঠে গেছে। হুঁ। রাধামাধব—রাধামাধব।

দুখীর চিন্তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। চোখের সামনে এতদিনের

আবছা পর্দাটা সহসা উঠে গেল। সবকিছু স্বচ্ছ দেখতে পাচ্ছে, এই পণ্ডিত বাবার হৃদয়! সমাজের পুণ্যাত্মার পট ভেঙে-চুরে চুরমার হয়ে গেল।

ও হাতে কুড়ুল তুলে নিল। খিদে-তৃষ্ণায় দেহ আর বইছে না। সকাল থেকে এ পর্যন্ত দাঁতে কুটোটি কাটে নি। দাঁড়ানোটাও তার কাছে পাহাড় অতিক্রম করার সামিল। দেহের শক্তি লোপ পেলেও মনে কৃত্রিম শক্তি সঞ্চয় করে উঠে দাঁড়িয়ে কাঠের গুঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল, মনে ভাবছে—ঠিকই তো, পণ্ডিতবাবা যদি শুভক্ষণ বিচার-বিবেচনা করে না বলে তবে তো পিথিমি রসাতলে যেতে বসবে। তবেই না সংসারে এত পতিপিত্তি। ঠিক কতাই তো, দিন-ক্ষণ বিচার করাটাই তো আসল কতা। একটু ভুলচুক হলেও সব ধ্বংস হয়ে ছার খার হয়ে যাবে।

পণ্ডিত গুড়ির নিকটে এসে দুখীকে উৎসাহ দেবার জন্য বলতে থাকেন—হ্যাঁ জোরে মার, আরো জোরে মার্। দেখে মনে হচ্ছে হাতে ব্যাধি লেগেছে, মার কসে! এক্ষুনি ফেটে যাবে।

দুখী এক আসুরিক ক্ষমতায় শক্তিমান হয়ে কুড়ুল চালাতে লাগল। সে নিজেই এই গুপ্তশক্তির রহস্য উৎঘাটন করতে অসমর্থ। খিদে—তৃষ্ণায় সেই অবসন্নতা কোথায় চলে গেছে। স্বীয় শক্তিতে সে নিজেই বিস্মিত। এক-একটি কোপ বজ্রতুল্য। প্রায় অর্ধঘণ্টা উন্মাদের ন্যায় হাত চালিয়ে গুঁড়ির মাঝ বরাবর চিরেছে—সহসা দুখীর হাত থেকে কুড়ুল ছিটকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দুখীও ঘুরে মাটিতে পড়ল। খিদে তৃষ্ণা ক্লান্তি একসঙ্গে শরীরকে জবাব দিয়েছে।

বাবাজী রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠল—আরও দু-চার ঘা দে। তবে তো চেলা কাট বেরুবে। এই বেটা চামার! কিন্তু দুখীর সাড়া নেই। ওকে আর হুকুম না দিয়ে পণ্ডিত অন্তঃপুরে চলে গেলেন। স্নান-ক্রিয়া সমাপন করে তিলক-চন্দন, পট্টবস্ত্র পরিধান করে বাইরে এসে চিৎকার করে বললেন—কিরে শুয়ে পড়ে থাকলেই কি চলবে? ওঠে চল,

তোর ঘরে যাব। সব ঠিক-ঠাক রেখেছিস্ তো? কিন্তু এত ডাক সত্ত্বেও দুখীর সাড়া নেই, উঠে বসলোও না। পণ্ডিতের মনে কিঞ্চিৎ শংকা দেখা দিল। ত্রস্ত পদে ওর পাশে গিয়ে দেখেন, দুখী মড়ার মত পড়ে আছে। অসাড়, অচেতন দেহে প্রাণ স্পন্দনের কোন চিহ্ন দেখতে পেল না। তবে কি দুখীর প্রাণ পাখি উড়ে গেছে? ব্যাকুল হয়ে গিন্নীর কাছে গিয়ে বলেন—ওগো কী হবে, আমি যে ভাবতে পারছি না, দুখী মরে পড়ে আছে। পণ্ডিতগিন্নী যারপরনাই বিস্মিত হয়ে বলে—এই তো কাট কাটছিল! কি সব্বনেশে কথা গা!

পণ্ডিত—সর্বনাশ বলে! কাঠ কাটতে কাটতে মরেছে বেটা—! কি উপায় হবে গো?

পণ্ডিতগিন্নী শান্ত কণ্ঠে বলে—ভাববার কি আছে? চামার পট্টিতে খবর দাও, এক্ষুনি মড়া তুলে নিয়ে যাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এ সংবাদ গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার কর্ণ গোচর হোল। এক ঘর ব্যতীত গ্রামের সকলেই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ঐ একঘরই গোঁড়। লোকের যাতায়াতের রাস্তা, পানীয় জলের কি উপায় হবে? চামারের মৃতদেহের পাশ দিয়ে কি পবিত্র ব্রাহ্মণেরা জল নিতে পারে? অবশেষে এক বৃদ্ধা পণ্ডিতকে বলেন—বলি তোমার আক্কেলটা কি রকম? উদয় অস্ত খেটে তোমার ভিটেতেই মোলো, ও মড়া তোমাকেই ফেলতে হবে। গাঁয়ের লোক কি জল পাবে না? যা করতে হয় তাড়াতাড়ি করো বাপু।

এদিকে সেই গোঁড় চামার বস্তীতে গিয়ে সব চামারদের পুলিশের ভীতি প্রদর্শন করে বলেছে—খবরদার, মড়া তুলতে কেউ যাবে না—এই বলে রাখছি, খামোকা পুলিশের পাল্লায় কেন পড়বে শুনি? জানতো বাঘে ছুলে আঠার ঘা। গরীবের জান কি এতই সস্তা? কি জন্য একজন নিরীহ চামার পণ্ডিতের খাম খেয়ালীপনার জন্য প্রাণ হারাল? তোমরা তার প্রতিবাদ করবে। নয়তো মনে রেখো আমাদের সকলকেই ঐ পণ্ডিতের খাম খেয়ালীর শিকার হতে হবে।

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই পণ্ডিতজী চামারদের লাশ তুলে আনতে হুকুম দিলে কেউই রাজি হোল না। প্রথমে ধমকে কাজ হাসিল করাতে চেয়ে বিফল হয়ে নানা ভাবে বুঝিয়ে শেষে মিনতি করেও চামারদের দিয়ে লাশ সরাতে পারলেন না। পুলিশের আতঙ্কে সকলেই চুপিসাড়ে চলে গেল। একজনও চামার সেখানে রইল না। অগত্যা বাড়ি ফিরে এসে মিথ্যে আস্ফালন করে হাত-পা শূন্যে ছুড়ে শাপ-শাপান্ত করতে লাগলেন। দুখীর স্ত্রী-কন্যা এসে কপাল চাপড়ে ক্রন্দন করতে লাগল। তাদের সঙ্গে কিছু চামারনীও এসে কেউ ক্রন্দনে রত হোল, কেউ আবার নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিতে লাগল। কিন্তু একটি চামারেরও দেখা পাওয়া গেল না।

অর্ধেকরাত পর্যন্ত চামার নারীরা উচ্চস্বরে ক্রন্দনের যে রোল তুলে ছিল মানুষ তো কোন ছার স্বয়ং দেবতার পক্ষেও ক্রন্দন সম্বরণ করা মুশকিল। কিন্তু বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ চামারের মৃতদেহ স্পর্শ করবে কীরূপে? শাস্ত্রে কি এরূপ কোন বিধি আছে?

পণ্ডিত গিন্নী রুক্ষ কণ্ঠে বলে—ই ডাইনীদের কি ঘর-দোর নেই, কেঁদে মরছে কি জন্য? চেঁচিয়ে গলা দিয়ে রক্ত উঠে মরুক না কেন অ্যাবাগীর বেটীরা।

পণ্ডিত—কাঁদতে দাও দুষ্টা-ডাইনীদের। জ্যান্তে তো কেউ একদিন খবর নেয় নি, মরতে দরদ সব উথলে উঠছে।

পণ্ডিত গিন্নি—গেরস্ত ঘরে চামার কাঁদছে এত এক মস্ত অলুক্ষুনে কন্তা।

পণ্ডিত—অশুভ, ঘোর অশুভ।

পণ্ডিত গিন্নী—মড়া-পচা গন্ধ বেরুচ্ছে।

পণ্ডিত—বেটা জাত চামার। বিচার-আচারের বালাই নেই। ধর্মা-ধর্মের জ্ঞান নেই। গন্ধ বেরুবে না।

পণ্ডিতগিন্নী—শুনেছি এদের কোন অখাদ্যেই অরুচি নেই, ঘেন্নার বালাই নেই, রাম বলো।

পণ্ডিত—যত্তসব নষ্ট-ভ্রষ্টের দল, পাপাচারী।

সেরাত তো কোন মতে কাটলো; কিন্তু পরেরদিন সকালেও কোন চামারের টিকি দেখা গেল না। চামার মেয়েরা কান্না-কাটি করে ফিরে গেছে। দুর্গন্ধও বেশ জোরালো হয়ে ছড়িয়েছে।

তখনও আঁধারের বেশ কাটেনি। পণ্ডিতজী দড়ি বার করে এক ফাঁস তৈরী করে মড়ার পায়ে কসিয়ে দিয়ে টানতে টানতে গ্রামের বাইরে টেনে নিয়ে রেখে এলেন। গৃহে ফিরে গঙ্গায় স্নান করে সর্বত্র গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করলেন। দুর্গা পাঠ করতে লাগলেন।

ওদিকে দুখীর মৃতদেহ ঘিরে শকুনের ভোজ শুরু হয়েছে, কাক, কুকুরও বাদ পড়েনি। সমস্ত জীবন ধরে ভক্তি, নিষ্ঠা, সেবার পুরস্কার লাভ করলো।